BanglaBook.org

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

বন্দর সুন্দরী

মৃতপ্রায় তমালিকা বন্দরের
গণিকালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক
প্রেম-কাহিনি, একদিকে ভালোবাসা,
অন্যদিকে ভয়ঙ্কর এক আখ্যান

বন্দর সুন্দরী

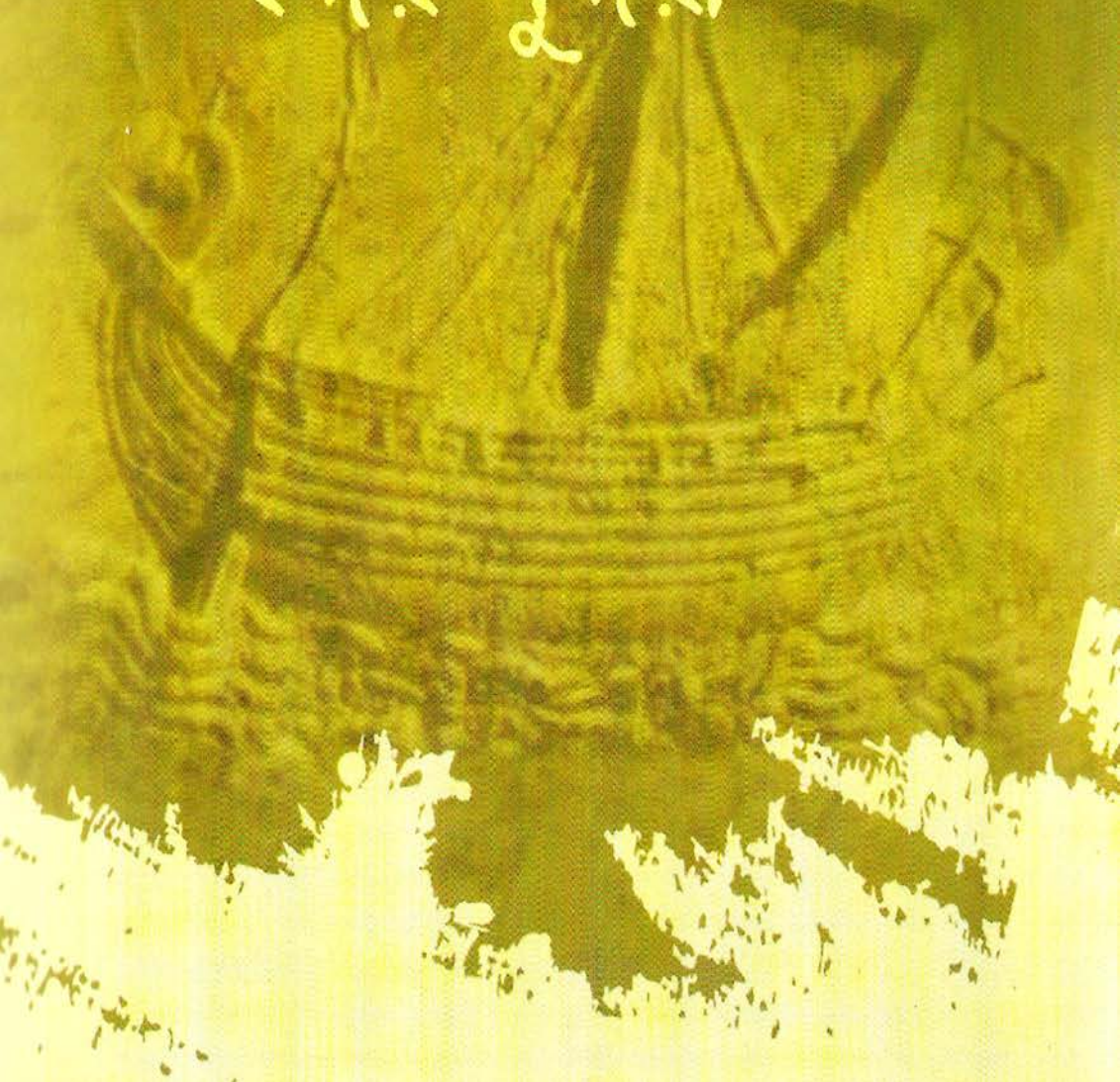

নাবিকদের নাকি বন্দরে বন্দরে স্ত্রী থাকে। স্ত্রী অর্থাৎ বন্দর-গণিকার দল। আর যে-বন্দরে গণিকালয় নেই, সে-বন্দর আসলে বন্দর-ই নয়!

তাম্রলিপ্ত বা তমালিকা বন্দর তখন বাংলার প্রধান বন্দরের কৌলীন্য হারিয়েছে। তবু সেখানে কিছু বিদেশি জাহাজ তখনও এসে নোঙর করে। বাণিজ্যের জন্য নয়, বন্দরস্থিত এক গণিকালয়ের টানে। সেটা পরিচালনা করে মৎস্যগন্ধা নামের এক বন্দর-গণিকা। পর্তুগিজ নাবিক এস্তাদিওর জাহাজ একদিন এসে ভিড়ল সেই বন্দরে। তারপর?...মৃতপ্রায় তমালিকা বন্দরের গণিকালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক প্রেম-কাহিনি, একদিকে ভালোবাসা, অন্যদিকে ভয়ঙ্কর এক আখ্যান।

ভাস্কো ডা গামার ভারত অভিযানের দুরন্ত সময়ের প্রেক্ষাপটে, তমালিকা বন্দরকে কেন্দ্র করে রচিত এই সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বন্দর সুন্দরী' শুধু নিছক উপন্যাস-ই নয়, উপন্যাসের মোড়কে বন্দর-গণিকাদের জীবনকাহিনির এক ঐতিহাসিক দলিল।

জন্ম ১৭ মে ১৯৭৩।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ।
ছোটদের সব প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাতেই লেখালেখি। বড়দের জন্যও লেখেন।
প্রথম প্রকাশিত গল্প 'হারানখুড়োর মাছ ধরা' কিশোর ভারতী পত্রিকায়।
প্রথম উপন্যাস 'কৃষ্ণলামার গুম্ফা' আনন্দমেলাতে প্রকাশিত হয়।
প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৫টি। জনপ্রিয় এফ.এম. রেডিয়ো চ্যানেলগুলিতে নাট্যরূপ পেয়েছে বহু গল্প।
শখ আড্ডা, সাহিত্যচর্চা ও ভ্রমণ।
পত্রভারতী থেকে এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাস **জীবন্ত উপবীত, খাজুরাহ সুন্দরী, রাক্ষুসে নেকড়ে, ফিরিঙ্গি ঠগি, চন্দ্রভাগার চাঁদ, কৃষ্ণলামার গুম্ফা, রুদ্রনাথের চুনির চোখ।**
বহু সম্মাননা ও পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু কিশোর আকাদেমি প্রদত্ত উপেন্দ্রকিশোর স্মৃতি পুরস্কার।

প্রচ্ছদ **রঞ্জন দত্ত**

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

বন্দর সুন্দরী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১৮

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ রঞ্জন দত্ত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশ
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

BONDOR SUNDORI
by Himadrikishore Dasgupta
Published by PATRA BHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/ Patra Bharati

Price ₹ 350.00

ISBN 978-81-8374-500-0

'টিম টিম করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা;
—তাম্রলিপ্ত সকরুণ স্মৃতি।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র

লেখকের অন্যান্য বই

খাজুরাহ সুন্দরী
চন্দ্রভাগার চাঁদ
ফিরিঙ্গি ঠগি
জীবন্ত উপবীত
রুদ্রনাথের চুনির চোখ
কৃষ্ণলামার গুম্ফা
রাক্ষুসে নেকড়ে

বৈশালী দাশগুপ্ত-কে

নিবেদন

যদিও 'বন্দর সুন্দরী' কোনও ইতিহাস বই নয়, ইতিহাস আধারিত কাহিনিমাত্র। তবুও এ কাহিনি রচনা করার সময় আমি চেষ্টা করেছি, উপন্যাসের পটভূমি যে সময়কালের সেই সময়ের মোটামুটি নির্ভরযোগ্য ছবি তুলে ধরতে এবং ওই সময়ের মূল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে পাঠকদের সামনে হাজির করতে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাজ্ঞ মননশীল পাঠকমাত্রই জানেন, এ ধরনের উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সবথেকে বড় হল তথ্য সংগ্রহের কাজ। নতুন নাবিক যেমন শুধুমাত্র সাহসে ভর করে অজানা দেশের সন্ধানে জাহাজ ভাসায়, তেমনই অপটু নাবিকের মতো আমিও সাহসে ভর করে নেমে পড়েছিলাম তথ্য সংগ্রহের কাজে।

যেহেতু এই উপন্যাস বন্দর গণিকাদের প্রাচীন ইতিহাসের সময়কালকে কেন্দ্র করে, তাই তাদের সম্পর্কেই তথ্য সংগ্রহে আকর্ষণ ছিল বেশি। কিন্তু সমস্যা হল বিভিন্ন ঐতিহাসিক রচনা অথবা প্রাচীন সাহিত্যে নগরনটী আম্রপালী বা বসন্তসেনাদের সন্ধান মিললেও বন্দর গণিকাদের সম্পর্কে তথ্য বড় অপ্রতুল। কোনও কোনও সময় শুধু বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও খুব সামান্য উল্লেখ করা হয়েছে তাদের কথা। গণিকাদের মধ্যেও ব্রাত্য থেকে গেছে বন্দর গণিকারা।

বন্দরগুলো সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তা অধিকাংশই বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ। যেমন চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন সাঙের রচনায় পাওয়া যায় 'তান মো লি' অর্থাৎ তাম্রলিপ্ত বন্দরের সংক্ষিপ্ত অথচ খুব সুন্দর বিবরণ। সেখানে লিপিবদ্ধ আছে তমালিকা বন্দরের ভৌগোলিক অবস্থান থেকে শুরু করে ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার বিন্যাস পর্যন্ত।

এই উপন্যাসের বড় অংশ পাঁচশ বছর আগের তমালিকা বন্দর কেন্দ্রিক। কিন্তু সমস্যা হল, তারও বহু শতাব্দী আগে হিউ-এন-সাঙের বিবরণে তমালিকা বন্দরের প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থাকলেও আমার উপন্যাসের সময়কালের তমালিকা বন্দরের ছবি তেমন পাওয়া যায় না। হয়তো পাওয়া যায়না তমালিকা বন্দর তখন প্রায় মৃত বন্দর বলেই। সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁয় তার কয়েক শতক আগেই বাংলার প্রধান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

তাছাড়া তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে পাঁচশো বছর আগে ভারতের বন্দর কর্তৃপক্ষ বা সাগরে পাড়ি দেওয়া বণিকরাও বেশ উদাসীন ছিলেন। ইউরোপীয় জাহাজগুলোতে তখন যাত্রাপথের বিবরণ ধরে রাখার জন্য, 'লগবুক' ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলেও ভারতীয় বাণিজ্যপোতে তখনও যে ব্যবস্থা চালু হয়নি। ইউরোপের অনেক বন্দরে সে সময় জাহাজ ছাড়ার আগে বিভিন্ন জায়গাতে লিখিত বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে জাহজ কবে ছাড়বে, কোথায় গন্তব্য এমনকী নাবিকদের নামের তালিকা পর্যন্ত জানিয়ে দেওয়া হত জনসাধারণকে। সে সময় ভারতীয় বণিকরা বন্দরবাসীকে জাহাজ ছাড়ার খবর জানাত শঙ্খধ্বনি করে বা বন্দরের কোনও অংশে আগুন জ্বালিয়ে। কোনও তথ্য বা 'রেকর্ড' থাকত না।

তথ্য সংগ্রহের কাজে যখন অনভিজ্ঞ নাবিকের মতো ডুবতে বসেছি, তখন কিছু প্রাজ্ঞ মানুষ শেষ পর্যন্ত আমার ছোট নৌকাটাকে শেষ পর্যন্ত তীরে ভিড়তে সাহায্য করলেন তাদের জ্ঞান ভাণ্ডার দিয়ে। এ ব্যাপারে প্রথমেই যে মানুষটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশনা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান, ইতিহাস গবেষক ও সুলেখক শ্রীনির্বেদ রায়। নানা তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সময় তাঁকে সাক্ষাতে বা দুরাভাষে বিরক্ত করেছি। আর তিনিও আমাকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন হাসিমুখে। আমার এই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁর লেখা বিভিন্ন বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।

লেখার প্রয়োজনে আমাকে নানা বইপত্র ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন ইতিহাস গবেষক-লেখক শ্রী প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, শিক্ষিকা শ্রীমতী শ্রাবণী গুপ্ত সরকার, বন্ধুবর শ্রী সুগত চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। তাঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী।

অগ্রজ কথাসাহিত্যিক শ্রীঅনীশ দেব, অগ্রজ কথাসাহিত্যিক ও পত্রভারতীর কর্ণধার শ্রীত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাকে উৎসাহিত করেছেন, সাহস যুগিয়েছেন এই সুবিশাল কাহিনি রচনার জন্য। তাঁদের ঋণও পরিশোধ করার নয়।

এতদসত্ত্বেও ত্রুটি যদি থেকে যায়, তবে তা লেখকের নিজস্ব অক্ষমতা।

'বন্দর সুন্দরী'-কে তুলে দিলাম পাঠক-পাঠিকাদের কাছে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৮

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পটভূমি

বন্দর সুন্দরী। এক নারী ও নাবিকের প্রেমকাহিনি। প্রাচীন তমালিকা বন্দরের বুকে 'নাবিকের বন্দরে বন্দরে স্ত্রী থাকে'—বন্দরের প্রাচীন প্রবাদ। 'স্ত্রী' অর্থে শয্যাসঙ্গিনী-গণিকা। বন্দর সুন্দরী। যারা ঘরছাড়া নাবিকদের রোদে-পোড়া, সমুদ্রের নোনা বাতাসে রুক্ষ দেহকে তৃপ্ত করে, কখনও বা হয়তো তাদের মনকেও। তেমনই এক বন্দর সুন্দরীকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসআশ্রিত এই উপন্যাস। সুদূর অতীত থেকেই ভারতের বন্দর সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতে গড়ে উঠেছিল নানা গণিকালয়। এমনকী সমুদ্রের বুকে ভ্রাম্যমান গণিকালয়ও ছিল। যেসব সূচক দিয়ে নাবিকরা বন্দরের গুরুত্ব পরিমাপ করত, তার মধ্যে অন্যতম হল বন্দরে গণিকালয় আছে কিনা।

যে বন্দরে গণিকালয় নেই সে-বন্দরকে বন্দরের পরিপূর্ণ মর্যাদা দিতে নারাজ ছিল বিদেশি বণিকরা। বিশেষত সেই সময়ে, যে-সময়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এক ভারতীয় বন্দর সুন্দরীর সঙ্গে এক পর্তুগিজ নাবিকের ভালোবাসার আখ্যান, যখন ইউরোপীয় বণিকদের সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে সুদূর এই ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সিংহদুয়ার।

কোথায় ছোট্ট এক দেশ পর্তুগালের লিবসন বন্দর, টেগাস নদীর মোহনা! যেখান থেকে 'নতুন পৃথিবী' ভারতবর্ষের উদ্দেশে পাড়ি জমাত পর্তুগিজ বণিকরা, আর কোথায় এই ভারতবর্ষের কালিকট, বাংলার সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও বা তাম্রলিপ্ত বা তমালিকা বন্দর! কিন্তু সমুদ্র তাদের গেঁথে দিয়েছিল এক সূত্রে।

এই দীর্ঘ উপন্যাসকে এক অর্থে ঐতিহাসিক 'থ্রিলার'ও বলা যেতে পারে। গড়ে উঠেছে দুঃসাহসী পর্তুগিজ নাবিক, অভিযাত্রী, পর্যটক, আবার কারও মতে, এক ছদ্মবেশী জলদস্যু ভাস্কো ডা গামার ভারত অভিযানকে কেন্দ্র করে। কালিকট বন্দরে ভাস্কোর দ্বিতীয় ভারত অভিযানের সময় এই কাহিনির সূচনাপর্ব। পরিসমাপ্তি ঘটেছে বাংলার তমালিকা বন্দরে, যখন ভাস্কো তৃতীয়বারের জন্য এদেশের মাটিতে পা রাখলেন গোয়াতে পর্তুগিজ উপনিবেশের ভাইসরয়ের দায়িত্ব নিতে। তবে ভাস্কো এই উপন্যাসের নায়ক নন। এ কাহিনির নায়ক এস্তাদিও নামের এক পর্তুগিজ নাবিক, নায়িকা বন্দরবেশ্যা মৎসগন্ধা। মৃতপ্রায় তমালিকা বন্দরের বন্দর সুন্দরী। তবে ভাস্কো অবশ্যই এই কাহিনির নিয়ন্ত্রক।

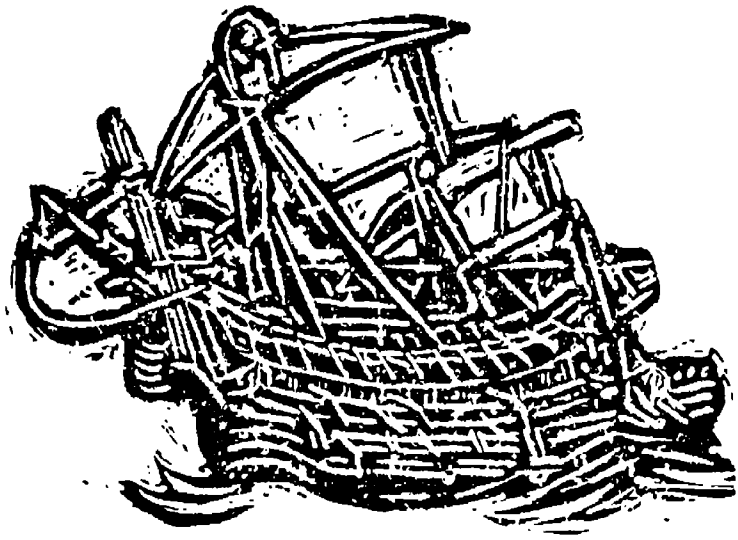

প্রথম পর্ব

১

সমুদ্রের নোনা বাতাস কি রক্তে খুনের নেশা ধরায়? প্রাচীন জাহাজি-মাল্লারা অবশ্য এ-কথাই বলে। সমুদ্র সেদিন শান্ত ছিল, রৌদ্রকরোজ্জ্বল নীল আকাশে ঝড়ের কোন পূর্বাভাস ছিল না। সত্যি কথা বলতে কী, এত শান্ত সমুদ্র বহুদিন দেখেনি অর্ধেক পৃথিবী পেরিয়ে আসা অ্যাডমিরালের বিশাল নৌবহরের লোকজন। জাহাজের খোলও ভর্তি ছিল সোনা-দারুচিনি আর চন্দনকাঠে। ছিল সম্রাট ম্যানুয়েলের আশীর্বাদ। নির্দিষ্ট ছিল গন্তব্যও। তবু কেন হঠাৎ তাঁর রক্তে জেগে উঠল খুনের নেশা? কেন মুহূর্তে অভিযাত্রী আর জলদস্যুর মধ্যে যে ব্যবধান তা মুছে গেল? তা কি ওই নোনা বাতাসের জন্যই? রাজহংসর মতো সাদা পালতোলা জাহাজটা চোখে পড়তেই অ্যাডমিরাল ভাস্কো নির্দেশ দিলেন, 'লুঠ করতে হবে মূরদের ওই জাহাজ। তারপর আগুন লাগিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে। নারী হোক বা শিশু, একটা প্রাণীও যেন জীবিত না থাকে।'—শেষের কথাটা বেশ জোর দিয়েই বললেন অ্যাডমিরাল।

১৫০২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ভোরে টেগাস নদীর মোহনা থেকে দ্বিতীয়বারের ভারত অভিযানের জন্য দুটি নৌবহর নিয়ে সমুদ্রে নেমেছিলেন ভাস্কো। আর তৃতীয় নৌবহরটি এস্টাভাও গামার নেতৃত্বে তাদের অনুসরণ

BanglaBook.org

করে তার মাস দুই বাদে। ক্যানারি দ্বীপমালা অতিক্রম করে সে-মাসের শেষেই ভাস্কো পৌঁছেছিলেন ভার্দে অন্তরীপে। তারপর পূর্ব আফ্রিকার অন্যতম বন্দর সোফালা ছুঁয়ে একে একে মোজাম্বিক ছুঁয়ে কিলওয়া দ্বীপ। তারপর ভাস্কো সোজা রওনা হলেন ভারতের দিকে। ভাস্কোর প্রথম যে-তটরেখা চোখে পড়েছিল তা 'ক্যাম্বে'। মক্কা থেকে যার দূরত্ব দশ মাইল। ভাস্কোর নৌবহর তাকে পিছনে ফেলে এসে ভিড়ল পরবর্তী বন্দর গোয়াতে। কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে অ্যাডমিরালের নৌবহর চলল এক ছোট্ট দ্বীপ অ্যাঙ্গেডিভার দিকে। সেখান থেকে সংগ্রহ করা গেল চন্দনকাঠ আর পানীয় জল। এখানে অবশ্য দুর্যোগ নেমে এসেছিল তাঁর নৌবহরে। স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়ে ক'দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল এক-তৃতীয়াংশ নাবিক। সমুদ্র অভিযানে এমন অবশ্য হতেই পারে। সপ্তাহ দুই বাদে এখানেই এসে ভাস্কোর নৌবহরের সঙ্গে মিলিত হল এস্টাভাও-এর তৃতীয় নৌবহর। তিনভাগে বিভক্ত করা হল সম্মিলিত নৌবহরকে। মূল নৌবহরটি ভাস্কোর নেতৃত্বে দশটি বড় জাহাজ নিয়ে। দ্বিতীয় নৌবহরটিতে জাহাজের সংখ্যা পাঁচ। যার নেতৃত্বে ভাস্কোর কাকা ভিনসেন্ট সোদ্রে। আর তৃতীয় দলে নবাগত এস্টাভাও গামার নেতৃত্বে আরও পাঁচটি জাহাজ। সম্মিলিতশক্তি নিয়ে অ্যাডমিরাল এবার এগোলেন কান্নানোরের দিকে।

আর সাদা পালতোলা 'মেরি' নামের হতভাগ্য জাহাজটা? পশ্চিমদিক থেকে সে ফিরে আসছিল কালিকটে। খোজা কাশিমের ভাইয়ের জাহাজ। মক্কা থেকে তারা ফিরে আসছিল কিছু 'পুণ্য' নিয়ে আর কিছু পণ্য নিয়ে। তীর্থযাত্রীদের এ-জাহাজে যাত্রীসংখ্যা ছিল তিনশো আশি জন। যার অধিকাংশই বৃদ্ধ, নারী ও শিশু। 'নিয়তি কে ন বধ্যতে।' ঘরে ফেরা হল না তাদের। মাঝসমুদ্রে তারা মুখোমুখি হয়ে গেল ভাস্কোর নৌবহরের। একলা হরিণশিশুকে যেমন চারপাশ থেকে হায়নার দল ঘিরে ধরে, তেমনই সাদা পালতোলা ছোট্ট জাহাজটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল ভাস্কোর জাহাজগুলো। খোলের গায়ের গর্তগুলোর আবরণ খসে গেল, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মেরির দিকে তাক করা সার সার কামানের মুখ।

লড়াইয়ের কোনও প্রশ্নই ছিল না। মেরি কোনও রণপোত নয়। শান্ত-নিরীহ-ধর্মপ্রাণ মানুষদের জাহাজ। সে-জাহাজে সংকেত-কামান অবশ্য একটা ছিল, তবে তা নৌ যুদ্ধের জন্য নয়। সমুদ্রঝড়ে জাহাজ ডুবে যাবার উপক্রম হলে অন্য জাহাজকে সংকেত পাঠাবার জন্যই বসানো হয়েছিল

BanglaBook.org

সে-কামান। 'মেরি' আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল এই বিশাল নৌবহরের কাছে। ভাস্কোর জাহাজে বেশ কয়েকজন কুখ্যাত খুনে ছিল। ভাস্কো তাদের চেয়ে এনেছিলেন সম্রাট ম্যানুয়েলের কারাগার থেকে। সম্রাট সেই খুনের দলকে মুক্তি দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, তারা ভাস্কোর অভিযানে অংশ নেবে এবং ভাস্কোর যাবতীয় নির্দেশ পালন করবে নির্দ্বিধায়। লোকগুলোও সম্মত হয়েছিল সম্রাটের শর্তে। অচেনা, অজানা কোনও দ্বীপ দেখতে পেলে সেখানে কোনও বিপদ আছে কিনা তা পরখ করার জন্য জাহাজ ভিড়াবার আগে এ-লোকগুলোকে সেখানে পাঠাত ভাস্কো। অথবা কোনও অপরিচিত জাহাজে এদেরই পাঠানো হয় তদন্ত করে আসার জন্য। কারণ, এ-লোকগুলো মারা গেলে সম্রাট বা ভাস্কোর কারোরই কিছু যায় আসবে না। ভাস্কো সে দলটাকেই 'মেরি'-তে পাঠালেন। সমর্থ হজযাত্রীরা দাঁড়িয়েছিল জাহাজের ডেকে। খুনে পর্তুগিজরা জাহাজে উঠেই তাদের প্রশ্ন করল 'সোনা কোথায় আছে বল? মেরির ক্যাপ্টেন বা নাখোদা উত্তর দিল, জিনিসপত্র কিছু আছে বটে, কিন্তু ওসব দামি জিনিস সোনা বা জহরত নেই।'

'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করে উঠল পর্তুগিজ। আর তারপরই সে তলোয়ার বিঁধিয়ে দিল দু-জনের বুকে। এরপর আরও একটা কাজ করল হিংস্র পর্তুগিজরা। মেরির প্রধান মাস্তুলের গায়ে সমুদ্রের সমান্তরাল যে দণ্ডগুলোতে পাল গোটানো থাকে তেমনই এক দণ্ডের দুপাশে পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল নিহত দুজনের দেহ। বাতাসে তাদের ঝুলন্ত দেহ থেকে রক্তের ছিটে এসে লাগতে লাগল ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা হতভম্ব, আতঙ্কিত হজযাত্রীদের শুভ্র বসনে।

এ-নৃশংসতা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না 'মেরি'র যাত্রীরা। অস্ত্র যা ছিল, পুরুষদের হাতে-কানে-গলায় যা অলঙ্কার ছিল তা তুলে দেওয়া হল পর্তুগিজদের হাতে। ভাস্কোর নাম ইতিপূর্বে শুনেছে মেরিতে থাকা কয়েকজন লোক। ইতিপূর্বে আর একবার এ দেশে এসেছিলেন এই ভাস্কো। ভারতের সমুদ্রবন্দরে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য-লেনদেনও করেছিলেন। সেই সূত্রে ভাস্কোর নামটা কেউ কেউ শুনেছে। তবে তারা ভাস্কোকে এতদিন সাগরপারের বণিক বলেই জানত। এ ভাস্কোকে তাদের জানা ছিল না!

হয়তো বা ভাস্কো নিজেই চিনতেন না এই ভাস্কোকে!

ভাস্কোর লোকগুলো এরপর তল্লাসি নিল মেরির। সোনা না পেলেও খোল

BanglaBook.org

ভর্তি প্রচুর জিনিস আছে জাহাজে। মেরি থেকে ফিরে লোকগুলো সেখবর দিল ভাস্কোকে। অ্যাডমিরাল নির্দেশ দিলেন, 'সব মাল লুটে নাও।'

ছোট ছোট নৌকা নামানো হল অ্যাডমিরালের জাহাজগুলো থেকে। মেরিতে গিয়ে মাল নামানোর কাজ শুরু করল তারা। সূর্য ডুবল এক সময়। তারপর রাত কেটে গিয়ে একসময় ভোরও হল। বিষণ্ণ এক ভোর। আবারও শুরু হল মাল নামানোর কাজ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের তাপে পচতে শুরু করল ঝুলন্ত মৃতদেহগুলো। বাসী মড়ার গন্ধে চারপাশের বাতাস ভারী হয়ে উঠল। আর সেই গন্ধেই মনে হয় কোথা থেকে উড়ে এল একদল চিল। ঝুলন্ত মৃতদেহদুটো নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে তারা ঠুকরে খেতে শুরু করল। ভাস্কোর নাবিকরা তা দেখে উৎফুল্ল ভাবে নিজেদের মধ্যে বাজি ধরতে লাগল, চিলের দল কোন মৃতদেহটা আগে শেষ করে তা নিয়ে। আর মেরির যাত্রীরা কেঁপে উঠতে লাগল, সে-দৃশ্য দেখে। এ দিনটাও কেটে গেল, এক সময়। সূর্য ডোবার আগেই চিলের দল শেষ করে দিল দেহদুটো। তবে তারা ফিরে গেল না। নানা জাহাজের মাস্তুলে বসে তারা প্রতীক্ষা করতে লাগল পরদিন ভোরের জন্য। যেন তারা বুঝতে পেরেছিল, আরও খাবার, আরও খাবার অপেক্ষা করে আছে তাদের জন্য।

তৃতীয় দিন সকাল বেলা কিছু সময়ের মধ্যেই যাবতীয় মাল তোলা হয়ে গেল ভাস্কোর নৌবহরে। একজন নাবিক অ্যাডমিরালকে জানাল 'খালি হয়ে গেছে মেরির খোল।'

ভাস্কো জানতে চাইলেন, 'আর কিছুই কি নেই?'

মেরিফেরত নাবিকরা বলল—ডেকের নীচে 'দাবোসা' অর্থাৎ যে কেবিনে নারীরা আছে তাদের দেহে কিছু অলঙ্কার থাকতে পারে'।

অ্যাডমিরাল বললেন 'সেগুলোও লুঠে নিতে হবে। একটা বড় দল নিয়ে শেষ একবার অনুসন্ধান চালাও মেরির আনাচে-কানাচে। হয়তো মূরগুলো তাদের সোনা জাহাজের কোনও গোপন জায়গাতে লুকিয়ে রেখে থাকতে পারে।'

এ কাজের দায়িত্ব বর্তাল ভিনসেন্ট সোদ্রের ওপর। তার নৌবহরের বেশ কয়েকটা জাহাজ মেরির গা ঘেঁষে দাঁড়াল। জাহাজগুলো থেকে কাঠের পাটাতন ফেলা হল মেরিতে। সোদ্রের নেতৃত্বে হিংস্র নেকড়েপালের মতো দুর্বার হার্মাদের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল মেরির ওপর। যেখানে যা আছে তছনছ করতে

BanglaBook.org

শুরু করল তারা। হার্মাদদের উল্লাস আর আতঙ্কিত রমণীদের ক্রন্দন ধ্বনিতে নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হল চারপাশে। হার্মাদদের একটা দল কুঠার দিয়ে সোনা লুকিয়ে রাখার সম্ভাব্য স্থান গুলো ভাঙতে লাগল। আর একদল সোজা ছুটল মেরির নারী ও শিশুরা যেখানে আছে সেদিকে।

সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে আয়েষা। কালিকটের সম্ভ্রান্ত মণিকার হারুণ যখন তাকে এক দূরে...বন্দর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিল তখন মেয়েটার বয়স মাত্র কয়েক মাস। তাকে কেউ ফেলে গেছিল নদীর ধারে। শিশুর জন্মপরিচয় জানা ছিল না হারুণের। সে যা কিছু হতে পারে, মুসলিম হতে পারে এমনকী বৌদ্ধও হতে পারে। ও-তল্লাটে বেশ কিছু বৌদ্ধও আছে। যাই হোক, হারুণ তাকে তুলে নিয়েছিল তার নৌকোয়। তারপর থেকে মেয়েটাকে পিতৃস্নেহে মানুষ করেছে হারুণ। আব্বু হজ করতে যাবে শুনে তার সঙ্গে যাবে বলে বায়না ধরেছিল আয়েষা। আব্বু কথা ফেলতে পারেনি একরত্তি মেয়ের। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল তাকে। গত দু-দিন ধরে জাহাজের দাবোসাতে বন্দি হয়ে আছে মেয়েটা। অন্য নারীদের কাছে বারবার সে জানতে চেয়েছে তার আব্বু কোথায় গেছে? কেউ তাকে জানায়নি যে জাহাজে ওঠার পরই হার্মাদের দল তার আব্বুর দেহটা ঝুলিয়ে দিয়েছে মেরির মাস্তুলে। বয়স্কা নারীরা কেউ-কেউ 'মুকাল্লা ফিল বাহর'—সমুদ্রর রক্ষাকর্তা—খোজা খিজিরের নাম জপছে আতঙ্কে। কেউ কেউ অবশ্য বুকে মুখ গুঁজে কাঁদছে। মক্কার উপকণ্ঠে যে মেলা হয় সেখান থেকে আয়েষার খেলার জন্য একটা বাঁদর জাতীয় প্রাণী কিনেছে আব্বু। একটা বড় কাঠের খাঁচার মধ্যে সেটা রাখা। সারাক্ষণ ধরে প্রাণীটা খাঁচার মধ্যে লাফালাফি করে, আয়েষার সঙ্গে খেলা করে, সে-প্রাণীটাও যেন যেন কোন অজানা আতঙ্কে জড়সড় হয়ে বসে আছে খাঁচার অন্ধকার কোনে।

খাঁচাটার সামনে বসে ব্যাপারটা কি ঘটছে তা বোঝার চেষ্টা করছিল আয়েষা। নানারকম চিৎকার ভেসে আসছে বাইরে থেকে। হার্মাদদের পৈশাচিক চিৎকার, মেরির লোকজনের আর্তনাদ, জিনিসপত্র ফেলার শব্দ! মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে জাহাজটা। জাহাজের ডেক থেকে যে ঢালু পাটাতনটা সোজা এসে নেমেছে আয়েষারা দাবোসার যেখানে আছে সেখানে, সেই পাটাতন দিয়ে হঠাৎ কী একটা গড়িয়ে এসে নামল নারীর দল যেখানে বসে ছিল তাদের সামনে। আর সেটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই নারীর দল প্রচণ্ড আতঙ্কে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে শুরু করল। একটা কাটা মুন্ডু। হতভাগ্য লোকটা খোলের

BanglaBook.org

বাইরে দাঁড়িয়ে শেষ একবার বাধা দেবার চেষ্টা করছিল, যাতে পর্তুগিজরা জেনেনাদের কাছে না পৌঁছোতে পারে সেজন্য। তার কাটা মাথাটা পাটাতন বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই ঢাল বেয়ে নেমে এল হার্মাদরা। মুহূর্তের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি হল। তারা যে শুধু নারীদের অলঙ্কার খুলে নিতে লাগল তাই নয়, কেউ কেউ আবার তাদের পোশাক ছিঁড়ে পাঁজাকোলা করে উঠিয়ে নিয়ে যেতে লাগল—দাবোসার কোণে—। সেখান থেকে ভেসে আসতে লাগল অসহায় নারীদের যন্ত্রণাকাতর গোঙানির শব্দ।

কাঠের খাঁচাটার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল আয়েষা। দানবের মতো চেহারার লাল দাড়িওলা একজন পর্তুগিজ তাকে দেখে এগিয়ে এল। এক ঝটকায় সেই হার্মাদ আয়েষার গলা থেকে ছিঁড়ে নিল তার আব্বুর দেওয়া সোনার লকেটটা। তবে সম্ভোগের পক্ষে এ মেয়েটা নেহাতই ছোট বলে মনে হল সেই হার্মাদের। কাছেই পলায়মান এক যুবতীকে দেখতে পেয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। কার পায়ের লাথি খেয়ে যেন সেই কাটা-মাথাটা ছিটকে পড়ল আয়েষার সামনে। এবার আর তার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। প্রচণ্ড আতঙ্কে আয়েষা প্রাণ বাঁচাবার জন্য কাঠের খাঁচার দরজাটা খুলে হামাগুড়ি দিয়ে তার ভিতর ঢুকে পড়ল। খাঁচার ভিতরে থাকা প্রাণীটাও তাকে দেখে জড়িয়ে ধরল। তারা দুজনেই কাঁপতে থাকল খাঁচার ভিতর বসে।

এক সময় কাজ শেষ হল হার্মাদদের। এবার তারা নিজেদের জাহাজে ফিরবে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎই যেন রুখে দাঁড়াল মূরেরা। জাহাজের অনেক পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি অনেক কিছুই এ-দুদিন ধরে সহ্য করছিল তারা। কিন্তু জাহাজের খোলে ঢুকে যেভাবে পর্তুগিজরা অত্যাচার চালাল, তাদের পাশবিক কামতৃষ্ণা চরিতার্থ করল, দ্বাদশ বর্ষীয় কন্যা থেকে আশি বছরের বৃদ্ধা কাউকেই মুক্তি দিল না—এ ব্যাপারটা আর সহ্য করতে পারল না মেরির জীবিত পুরুষরা। হাতের কাছে যে যা পেল তা দিয়ে হঠাৎ তারা আক্রমণ করে বসল হার্মাদদের। এ ঘটনাতে হতচকিত হয়ে গেল পর্তুগিজরা। হার্মাদদের দেহগুলো ছিটকে পড়তে লাগল জলে। সোদ্রে কোনও রকমে পাটাতন টপকে নিজের জাহাজে পৌঁছোলেন। তারপর সেখান থেকে মেরির ডেকে ছোড়া হতে লাগল তেলে-ভেজানো জ্বলন্ত কাপড়ের খণ্ড আর বন্দুকের গুলি। আরবরা সেই জ্বলন্ত কাপড় কাঠের টুকরোগুলো তুলে নিয়ে

BanglaBook.org

পাল্টা ছুঁড়ে দিতে লাগল পর্তুগিজদের জাহাজগুলোতে। ভাস্কো এর আগে কোনওদিন এমন মরণপণ প্রতিরোধ দেখেননি। তাঁর নিজের জাহাজগুলোতেই আগুন ধরে যাবার উপক্রম হল। আর নাবিকদের অনেকেই আর ফিরল না মেরি থেকে। অনেক কষ্টে পর্তুগিজরা তাদের জাহাজগুলোকে মেরির কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে এনে একপাশে সার বেঁধে দাঁড় করাল। মেরির ডেকে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মূরও জীবিত থাকল ততক্ষণ সে লড়ে গেল অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য।

বিকাল হয়ে গেছে। দিনের শেষ আলো এসে পড়েছে মেরির ক্ষতবিক্ষত দেহে। ডেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে অসংখ্য লাশ। মূরদের, হার্মাদদেরও। তবে তখনও কিছু মানুষ জীবিত ছিল সেই অভিশপ্ত জাহাজের বুকে। সেই ধর্ষিতা নারীর দল আর কিছু শিশু। বাঁচবার জন্য শেষ একটা চেষ্টা করল তারা। জাহাজের অন্ধকার খোল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে তারা এসে প্রথমে সার বেঁধে দাঁড়াল জাহাজের ডেকে। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে একজনও সমর্থ পুরুষ নেই, সবাই নারী এবং শিশু। চারপাশে ছড়ানো প্রিয়জনদের অসংখ্য মৃতদেহের মধ্যে দাঁড়িয়ে অস্তাচলগামী সূর্যের আলোতে ভাস্কোর জাহাজের উদ্দেশ্যে নতজানু হয়ে তারা একসঙ্গে জীবনভিক্ষা চাইল—'দোহাই তোমাদের, আমাদের যেখানে খুশি নিয়ে যাও, যা ইচ্ছা করো, শুধু প্রাণে মেরো না...।'

যে সব নারীর কোলে একদম ছোট শিশু ছিল তারা ভাস্কোর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শিশু গুলোকে দু-হাতে মাথার ওপর তুলে ধরল। ভাস্কোও নিশ্চিতভাবেই দেখতে পেলেন তাদের। কিন্তু সেই মুহূর্তে ভাস্কো যেন অভিযাত্রী ভাস্কো নয়, এখন তিনি পরিণত হয়েছেন জলচারী এটিলায়। হুন সম্রাট এটিলার ঘোড়া যেখানে এসে দাঁড়াত সেখানে তার নৃশংসতার আতঙ্কে নাকি পায়ের তলার ঘামও তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে হলদে হয়ে যেত। ঠিক তেমনই কি সেই মুহূর্তে ভাস্কোর জাহাজ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানকার জলতল আতঙ্কে নীচে নেমে গেছিল! ভাস্কোর মন থেকে যেন খসে পড়ল ইওরোপের সভ্যতার যাবতীয় আবরণ। পর্যটক ভাস্কো নয়, অ্যাডমিরাল ভাস্কো নয়, খ্রিস্ট্রের অনুগত ভাস্কো নয়, এ যেন পৃথিবীর ইতিহাসে এক নৃশংসতম মানুষ স্বয়ং এটিলা, চেঙ্গিজও যেন তাঁর সামনে ঠিক এই মুহূর্তে নতজানু হতেন তার বীভৎসতা দেখে।

পাশে দাঁড়ানো এক নাবিকের হাত থেকে বন্দুক নিলেন ভাস্কো। তারপর তা তাগ করলেন মেরির ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা এক রমণীর মাথার ওপর তুলে

BanglaBook.org

ধরা শিশুটাকে লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ অ্যাডমিরালের। হাতের বন্দুকের ধূমউদ্‌গিরণের সঙ্গে সঙ্গে সেই শিশু ছিটকে পড়ল সমুদ্রের জলে। সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মাও ঝাঁপ দিল জলে। তার আর্তচিৎকার হারিয়ে গেল হার্মাদদের উল্লাসে। এরপর একের পর এক বারুদ ঠাসা বন্দুক ভাস্কোর হাতে তুলে দিতে থাকল তাঁর সঙ্গীরা। ভাস্কোও একের পর এক লক্ষ্য ভেদ করে চললেন। এ যেন নিশানাবাজি খেলা দেখাচ্ছেন অ্যাডমিরাল। একটার পর একটা শিশু ছিটকে পড়ছে জলে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে জান্তব উল্লাসে মেতে উঠল পর্তুগিজরা। মেরির ডেকে দাঁড়ান-মায়েরা কিন্তু শেষ শিশুটাকে পর্যন্ত মাথার ওপর তুলে ধরে রেখেছিল। কারণ, যদি শেষ মুহূর্তে তাকে দেখে থেমে যান ভাস্কো, যদি সামান্য দয়া জেগে ওঠে ভাস্কোর মনে, যদি তিনি শেষ পর্যন্ত প্রাণ ভিক্ষা দেন তাদের। কিন্তু তেমন কিছু হল না। ভাস্কো এখন পরিণত হয়েছেন সমুদ্র-পিশাচে। শেষ শিশুটাকেও গুলিবিদ্ধ করার পর ভাস্কো নির্দেশ দিলেন, 'গোলা দাগো। আগুন লাগিয়ে ডুবিয়ে দাও মেরিকে। কাউকে বাঁচতে দেব না।'

গোলন্দাজরা আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। কামানের পিছনের ছিদ্রে জ্বলন্ত মশাল গুঁজে দিল তারা। মুহুর্মুহু আগুনের গোলা আছড়ে পড়তে লাগল মেরির ওপর। প্রথমে তার পালে আগুন জ্বলল, তারপর তা ছড়িয়ে পড়ল ডেকে, তারপর প্রাণভিক্ষা-চাওয়া সেই হতভাগ্য নারীদের গায়ে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে তারা ছোটাছুটি করতে লাগল ডেকে। কেউ কেউ আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঝাঁপ দিল সমুদ্রের বুকে। মুহূর্তের মধ্যে সমুদ্রর অতল জলরাশি গ্রাস করে নিল তাদের। মেরির লেলিহান অগ্নিশিখা আর বিদায়ী সূর্যের লাল আলো মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে লাগল। ভাস্কো আর তার সঙ্গীরা নিজেদের জাহাজ থেকে উপভোগ করতে লাগল সেই নারকীয় দৃশ্য।

মেরির সারা দেহে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। তার উত্তাপে টগবগ করে ফুঁটতে শুরু করেছে মেরির চারপাশের সমুদ্রের জল। এবার ডুববে জাহাজটা। অতবড় একটা জিনিস জলে ডুবলে যে জলোচ্ছ্বাস হয়ে তা থেকে বাঁচার জন্য পর্তুগিজরা তাদের জাহাজগুলো আরও কিছুটা তফাতে সরিয়ে আনল। সত্যিই এর কিছুক্ষণের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল। আকাশের দিকে ছিটকে উঠল মেরির দেহের জ্বলন্ত অংশগুলো। তারপরই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রর অতলে তলিয়ে গেল মেরি। সূর্যও প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ

BanglaBook.org

লুকালো সমুদ্রের গভীরে। ভাস্কোর নৌবহরগুলোতে একটার পর একটা বাতি জ্বলে উঠল। অন্য জাহাজগুলো থেকে ভাস্কোর অভিজাত সঙ্গীরা এসে উপস্থিত হল ভাস্কোর জাহাজে। অ্যাডমিরালের নির্দেশে লাল গালিচা পাতা-কক্ষে ঝাড়বাতির নীচে সুরাপাত্র নিয়ে বিজয় উৎসবে মেতে উঠল তারা। ডেকে রাখা মদের পিপেগুলোও খোলা হল সাধারণ নাবিকদের জন্য। মাঝরাত পর্যন্ত চলল নাবিকদের হইহুল্লোড় মাতলামি। ভাস্কো সিদ্ধান্ত নিলেন পরদিন তার নৌবহরের মুখ ফেরাবেন কান্নোনর বন্দরের উদ্দেশ্যে।

২

সুন্দর সকাল। সমুদ্রের জলে ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় খেলা করছে প্রভাতি সূর্যকিরণ। মাথার ওপর নীল আকাশের চাঁদোয়া, মনোরম বাতাসও বইছে। সে বাতাসে পাল খাটিয়ে ভেসে চলেছে ময়ূরপঙ্খি নাও 'মৃচ্ছকটিক'। নাও বা নৌকো না বলে ওকে জাহাজ বলাই ভালো। নানা রঙের পাল আর একাধিক মাস্তুলশোভিত এ-তরীকে সমুদ্র অভিযাত্রীরা অনেকেই চেনে ও জানে। অনেক দূর থেকেই দেখা যায় এই ময়ূরপঙ্খির সম্মুখভাগে বসানো সোনালি গিল্টি করা ময়ূরের অনেক উঁচু লম্বা গ্রীবাটাকে। তা দেখেই অন্য জাহাজের নাবিকরা এ-জাহাজকে চিনতে পারে। তাকে দেখে ডেকে দাঁড়িয়ে উল্লাস ধ্বনি করে ওঠে 'মৃচ্ছকটিক'! মৃচ্ছকটিক!' বলে। নেচে ওঠে ঘর ছাড়া নাবিকদের মনপ্রাণ। বিশেষত যে সব নাবিকরা দীর্ঘকাল ধরে সমুদ্রযাত্রা করে আসছে সেই সব ইংরেজ ওলন্দাজ পর্তুগিজ নাবিকদের এ জাহাজ দেখলে উল্লাসের সীমা থাকে না। ভাস্কোরও এদেশে আসার পথেও একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল মৃচ্ছকটিকের সঙ্গে। ফলশ্রুতি হিসাবে ভাস্কোর যাত্রা দু-দিনের জন্য থমকে গেছিল। না, ভাস্কোর রণপোত মৃচ্ছকটিককে আক্রমণ করেনি, কোনও জাহাজই তা করে না। কারণ এই ঘরছাড়া নাবিকদের দেহের তৃষ্ণা মেটায় এই মৃচ্ছকটিক। আরও এমন কাজে অবশ্য সমুদ্রের ঘুরে বেড়ায় আরবের 'জেবউন্নিসা', জেপাং দ্বীপের বোয়ে; শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের 'কুইন্সি'...কিন্তু জাহাজিরা বলে তাদের চোখে সেরা এই ময়ূরপঙ্খী জাহাজ 'মৃচ্ছকটিক।' কত ধরনের কত দেশের পণ্য আছে জাহাজে। ভারত, সিংহল, জেপাং...আরব থেকে শুরু করে আফ্রিকা এমনকী

BanglaBook.org

ইউরোপেরও। তাই যে-কোনও দেশের নাবিক তার পছন্দমতো পণ্য বেছে নিতে পাবে মৃচ্ছকটিক থেকে। হ্যাঁ, নারী তো পণ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। ভোগ্যপণ্য। নানা দেশের নানা জাতের নানা বয়সি প্রায় চারশোজন নারী আছে এ জাহাজে। সমুদ্রর বুকে ভাসমান গণিকালয় মৃচ্ছকটিক।

সমুদ্রর বুকে নারীদেহের এ-ব্যবসা মোটেই নতুন নয়। খ্রিস্ট জন্মের অনেক আগে থেকেই এ ব্যবসা চালু ছিল সমুদ্রপথে। এদেশে মৌর্যযুগে যখন বাণিজ্যতরী ভেসে যেত মশলা, রেশমবস্ত্র, হীরক খণ্ড নিয়ে মিশরে অথবা ভারতীয় বাঘ নিয়ে রোমের উদ্দেশ্যে ঠিক সেই সময় থেকেই শুরু হয় জলপথে ভ্রাম্যমান বেশ্যালয়ের এই ব্যবসা। বৈশালী নগরীতে বিশাল গণিকালয় ছিল। সেখান থেকে গণিকাদের সংগ্রহ করে গঙ্গাবক্ষ হয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়ত দেহব্যবসায়ী বণিকের দল। আজও চলে আসছে সে ব্যবসা। সমুদ্রপথেই এখন প্রধান বাণিজ্য হয়। সাগরপার থেকে আসা শুরু করেছে ইংরেজ-ওলোন্দাজ —পর্তুগিজ বণিকের দল। তাছাড়া ভারতীয়, আরবীয়, মিশরীয় বণিকের দল তো আছেই। বড় বড় বন্দরগুলোতে নাবিকদের মনোরঞ্জনের জন্য গণিকালয় আছে ঠিকই, কিন্তু যেসব জাহাজ দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে অথবা ইচ্ছা থাকলেও নানা কারণবশত বন্দরে ভিড়তে পারে না তাদের নাবিকদের কাছে মৃচ্ছকটিকের মতো ভ্রাম্যমান বেশ্যালয় এগিয়ে আসে বলেই ভরসা। এ ধরনের জাহাজগুলোকে দেখলেই এগিয়ে আসে নাবিকদের নিয়ে। এক বা দু-দিন মাঝসমুদ্রে নোঙর ফেলে মৃচ্ছকটিকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে জাহাজগুলো। তারপর দেহকে তৃপ্ত করে আবার রওনা হয় গন্তব্যে। নাবিকদের নিয়ে জাহাজ সওদাগরি জাহাজ হতে পারে, নতুন দেশের খোঁজে বেরোনো ইউরোপীয়দের জাহাজ হতে পারে, এমনকী জলদস্যুদের জাহাজও হতে পারে। ব্যবসায়ীর কাছে ক্রেতার কোনও জাতবিচার হয় না। সবারই মনোরঞ্জন করে মৃচ্ছকটিক। কখনও কখনও অবশ্য মৃচ্ছকটিকও ক্রেতার ভূমিকা পালন করে। যখন কোনও জলদস্যু জাহাজে কোনও সুন্দরী নারীর সন্ধান মেলে অথবা উপকূলবর্তী কোনও বাজারে বা দাসের হাটে খোঁজ পাওয়া যায় ক্রীতদাসীদের, তখন তাদের উপযুক্ত কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করে মৃচ্ছকটিক। অভিজ্ঞ গণিকারা নবাগতাদের ঝাড়াইবাছাই করে তালিম দিয়ে জাহাজি খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের উপযোগী করে তোলে।

মৃচ্ছকটিকের মালিকের নাম স্বয়ম্ভুনাথ। কালিকটের বাসিন্দা তিনি।

কালিকটেও তাঁর একটা স্থায়ী গণিকালয় আছে, বন্দরসংলগ্ন এলাকায়। বছরে আটমাস স্বয়ম্ভুনাথ মৃচ্ছকটিককে নিয়ে ভেসে বেড়ান সাগরে। আর বাকি চারমাস থাকেন কালিকটে। প্রায় আটমাস আগে তার প্রমোদতরীকে নিয়ে ঘর ছেড়েছিলেন স্বয়ম্ভুনাথ। প্রথমে ভারত মহাসাগর হয়ে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন আফ্রিকায়। এই যাত্রাপথে বেশ বড় গোটা দশেক বাণিজ্যপোতকে খদ্দের হিসাবে পাওয়া গেছিল। লাভও হয়েছে প্রচুর। আফ্রিকায় পৌঁছে মোম্বাসা বন্দরে নোঙর করেছিলেন তিনি। প্রাচীন বন্দর মোম্বাসা। সেখানে বেশ বড় কয়েকটা বেশ্যালয় আছে। নারীদের বেচা-কেনার ব্যবস্থাও আছে সেখানে। মোম্বাসার গণিকালয় থেকে একদল কৃষ্ণাঙ্গ সুন্দরীকে কিনেছেন তিনি। মোম্বাসা বন্দর ছেড়ে মাসতিনেক ভূমধ্যসাগরে ঘোরাফেরা। অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশি খদ্দের পাওয়া গেছে এবার। বিশেষত, শেতাঙ্গদের বহু জাহাজ এসে লেগেছিল মৃচ্ছকটিকের গায়ে। সেখান থেকে সোজা ঘরে ফেরার পথ ধরবেন বলে ঠিক করেছিলেন স্বয়ম্ভুনাথ। কিন্তু ফেরার পথে তার দেখা হয়ে গেল ভাস্কোর নৌবহরের সঙ্গে। বাণিজ্য তো হলই, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা কাজের বরাতও পেলেন স্বয়ম্ভুনাথ। ইদানীং পর্তুগিজরা বেশ বড় ডেরা বানিয়েছে কালিকট বন্দরে ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে। ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের। বছরখানেক আগে ভাস্কো নামের অ্যাডমিরালটা একবার এসেছিল এ দেশে। কিন্তু এবার ভাস্কোর নৌবহর দেখে বহুদর্শী স্বয়ম্ভুনাথের মনে হয়েছে লোকটা এবার শুধু এদেশে গোলমরিচ আর মশলা সংগ্রহ করতে আসেনি। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন উদ্দেশ্যও আছে। ভাস্কোর এক জাহাজের ক্যাপ্টেন নাকি মৃচ্ছকটিকের সমুদ্রসুন্দরীকে বলেছে যে, সম্রাট নাকি অ্যাডমিরালকে এ নির্দেশ দিয়ে এদেশে পাঠিয়েছেন যে, যেভাবেই হোক কালিকটের শাসনকর্তা সামোরিনের থেকে দখলই করে নেবেন বন্দরটা। এসব অবশ্য ভবিষ্যতের ব্যাপার। কিন্তু আপাতত পর্তুগিজ অ্যাডমিরাল তাঁকে বরাত দিয়েছিলেন কিছু জেপাং নারী সংগ্রহ করে দেবার জন্য। কোন অজানা কারণে জেপাং নারীদের সম্ভোগ করতে ভালোবাসে পতুর্গিজরা। দীর্ঘাঙ্গী আফ্রিকান বা আরব নারী নয়, বিম্বস্তন সিংহলী অথবা গুরু নিতম্বের ভারতীয় নারী নয়, পতুর্গিজদের প্রথম পছন্দ ছোটখাট চেহারার জেপাং দেশের রমনীরা। তাদের সংগ্রহ করার জন্য স্বয়ম্ভুনাথকে যেতে হয়েছিল জেপাং দ্বীপে। ও দেশটাকে অনেকে ডাকে 'সূর্যোদয়ের দেশ' বলে।

BanglaBook.org

জেপাং দ্বীপ থেকে একডজন নারীকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কালিকটে ফিরে ভাস্কোর লোকেদের কাছে হাতবদল হবে তারা। জেপাং দ্বীপের কাজ সেরে এবারের মতো তখন মৃচ্ছকটিকের ঘরে ফেরার পালা।

ঢেউয়ের তালে তালে মৃদুমৃদু ওঠা নামা করতে করতে শান্তভাবে এগিয়ে চলেছে স্বয়ম্ভুনাথের ময়ূরপঙ্খি। প্রভাতি সূর্যের আলোতে ঝিলিক দিচ্ছে জাহাজের সমুখভাগে ময়ূরের দীর্ঘ সোনালি গ্রীবাটা। সেটা ধরেই যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ম্ভুনাথ। বাতাসে উড়ছে তার সাদা দাড়ি, আলখাল্লার মতো দেখতে শুভ্র রেশমবস্ত্রের প্রান্তদেশ। ডেকে ইতি-উতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাল্লার দল। খোলের ভিতর থেকে জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে একদল সমুদ্রসুন্দরী। মাল্লাদের সঙ্গে মশকরা করছে তারা। সালঙ্কারা সেইসব গণিকাদের পরনে কাঁচুলি আর ঘাঘরা। তাদের বক্ষবিভাজিকায় এসে আটকে যাচ্ছে সকালের আলো। কলহাস্যে মুখরিত পরিবেশ চারপাশে। স্বয়ম্ভুনাথের মনটাও বেশ খুশি। নারীদেহের ভালোই বাণিজ্য হল এবার। এই সুদীর্ঘকাল সমুদ্র ভ্রমণে ঝড় ঝঞ্ঝার মতো কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও পড়তে হয়নি মৃচ্ছকটিককে। শুধুমাত্র দুটো ছোট্ট ঘটনা ছাড়া। একবার আরব বণিকদের একটা জাহাজ এসে লেগেছিল মৃচ্ছকটিকের গায়ে। সে সময় এক আরব বণিকের শয্যাসঙ্গিনী হতে গিয়ে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয় এক কিশোরীর। অবশ্য এ-ঘটনার জন্য সেই আরব মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণও দিয়েছে স্বয়ম্ভুনাথকে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটা হল অপর এক গণিকার ভয়ঙ্কররকম ছোঁয়াচে যৌন রোগ দেখা দিয়েছিল। অন্য কোনও জাহাজ হলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে উত্তাল সমুদ্রে ছুড়ে ফেলা হত—এটাই নিয়ম। কিন্তু স্বয়ম্ভুনাথ মানুষটা ভালো। তিনি অতটা নির্দয় হতে পারেননি সে-নারীর প্রতি। হাজার হোক, তার দেহটাই তো এক সময় বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রার যোগান দিয়েছে। মেয়েটার গাত্রবর্ণ রাঙা বলে ইওরোপীয়রা বেশ পছন্দ করত তাকে। হয়তো তেমনই কোনও মাল্লার থেকে রোগটা বাঁধিয়েছিল সে। যাই হোক, স্বয়ম্ভুনাথের নির্দেশে তাকে একটা ছোট নৌকোয় কিছু খাবার আর জল দিয়ে সমুদ্রে নামিয়ে আসা হয়েছিল। যদি অন্য কোনও জাহাজ তাকে তুলে নেয় অথবা ভাসতে ভাসতে অন্য কোনও দ্বীপে গিয়ে যদি

BanglaBook.org

সে পৌঁছোয় তবে আরও কিছু দিনের জন্য বেঁচে গেলেও বেঁচে যেতে পারে সে। এই ছোট্ট দুটো ঘটনা ছাড়া তেমন কোনও দুর্যোগের সাক্ষী হতে হয়নি স্বয়ম্ভুনাথ বা তার ময়ূরপঙ্খি নাওকে।

ময়ূরপঙ্খির সমুখ ভাগে দাঁড়িয়ে সুনীল জলরাশির দিকে তাকিয়ে স্বয়ম্ভুনাথ মনে মনে হিসাব করছিলেন আর ক'দিন সময় লাগতে পারে তার কালিকট বন্দরে পৌঁছোতে। বাতাসের যা গতি তাতে সম্ভবত সেখানে পৌঁছোতে আর তিনদিনমতো সময় লাগবে তার। হঠাৎ প্রধান মাস্তুলের গায়ের থাকে বসে থাকা দিগদর্শী মাল্লা চিৎকার করে বলল, 'কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে মনে হয়! এই বলে সে মাথার ওপর থেকে মাস্তুলের গায়ে বসে নাবিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এক দিকে। অমনি সবাই সেদিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল ব্যাপারটা কী?

দিগদর্শীর চিৎকার কানে গেছিল স্বয়ম্ভুনাথেরও। তিনিও তাকালেন সবাই যেদিকে তাকিয়েছে সেইদিকে। সমুদ্রের বুকে বেশ কিছুটা দূরে একটা কালো বিন্দু যেন ঢেউয়ের তালে ওঠা নামা করছে। কী ওটা?

স্বয়ম্ভুনাথ একজন মাল্লাকে তাঁর কক্ষ থেকে কাচ লাগানো সেই দূরদৃষ্টি-যন্ত্রটা আনতে বললেন। মাল্লা, মালিকের নির্দেশ পালন করে পিতলের তৈরি লম্বা-সরু চোঙাটা নিয়ে এল। জিনিসটা খুব কাজের। দূরের জিনিসকে কাছে টেনে আনে। এক ওলন্দাজ নাবিকের থেকে এ যন্ত্রটা কিনেছেন স্বয়ম্ভুনাথ। যন্ত্রটা তিনি চোখে লাগাতেই সেই কালো বিন্দুটা আরও কাছে এগিয়ে এল। স্বয়ম্ভুনাথের মনে হল, সে জিনিসটা একটা বড় বাক্স মতো কিছু হবে। আর সেটা ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে তাদের দিকেই! ওটা কোনও জাহাজের সিন্দুক নয়তো? অনেক সময় জলদস্যুদের আক্রমণের মুখে পড়লে মূল্যবান জিনিস সমেত সিন্দুক জলে ভাসিয়ে দেয় নাবিকরা। যাতে নিহত হলেও তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ কিছুতেই জলদস্যুদের হাতে না যায়। আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, কোনও জলদস্যু দল হয়তো নামহীন কোন অজানা দ্বীপে সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল তাদের সোনা-জহরত-লুণ্ঠিত সম্পদ। সাধারণত এভাবেই তারা সিন্দুকে ভরে সম্পদ লুকিয়ে রাখে। অনেক সময় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয় সেই দ্বীপ। কাঠের সিন্দুক বোঝাই সমুদ্র থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ আবার ফিরিয়ে নেয় সমুদ্র। এমন সিঁন্দুক পেয়ে অনেক জাহাজেরই ভাগ্য খুলে যায়। জিনিসটা তেমন কিছু নয়তো?

BanglaBook.org

কথাটা মাথায় আসতেই স্বয়ম্ভুনাথ নির্দেশ দিলেন', জাহাজ থামাও।'

পালের কাছিগুলোতে টান দিতে শুরু করল মাল্লার দল। পালগুলো একে-একে গুটিয়ে গেল মাস্তুলের গায়ে। বাতাস আর ঠেলে নিয়ে যেতে পারল না মৃচ্ছকটিককে। থেমে গিয়ে ঢেউয়ের ধাক্কায় মৃদু মৃদু দুলতে লাগল সে। কাচবসানো নলে চোখ রেখে ভাসমান জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলেন স্বয়ম্ভুনাথ।

সেটা ময়ূরপঙ্খির কাছাকাছি পৌঁছোতেই স্বয়ম্ভুনাথের নির্দেশে একদল লোক মৃচ্ছকটিকের গায়ে ঝোলানো মোটা কাছি বেয়ে নেমে পড়ল সমুদ্রের বুকে। তারপর সাঁতরে গিয়ে জিনিসটাকে ধরল। স্বয়ম্ভুনাথ এবার বুঝতে-পারলেন সেটা সিন্দুক নয়। কাঠের তৈরি খাঁচা-মতো কিছু একটা হবে। তার ওপর-নীচে কাঠের পাটাতন বসানো আছে বলে দূর থেকে জিনিসটাকে সিন্দুক বলে ভ্রম হচ্ছিল। স্বয়ম্ভুনাথ একটু নিরাশ হলেন বটে, কিন্তু জিনিসটা আসলে কী তা ভালো করে বোঝার জন্য হাত নেড়ে-জলে-নামা নাবিকদের নির্দেশ দিলেন জিনিসটাকে ওপরে তোলার জন্য।

কাছি বেঁধে জিনিসটাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই ডেকের ওপর তুলে ফেলল মাল্লারা। ডেকে উপস্থিত নাবিকরা সবাই ঘিরে দাঁড়াল জিনিসটাকে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। স্বয়ম্ভুনাথও উপস্থিত হলেন সেখানে। হ্যাঁ, সমুদ্রের বুক থেকে সদ্য তুলে আনা জিনিসটা হল বেশ বড় একটা কাঠের খাঁচা। আর তার ভিতরে দৃষ্টি যেতেই স্বয়ম্ভুনাথও অবাক হয়ে গেলেন। খাঁচার ভিতর রয়েছে সাত-আটবছর বয়সি একটা মেয়ে আর কালো লোমশ বানর জাতীয় একটা প্রাণী!

অন্য নাবিকরা সে-প্রাণীটাকে চিনতে না পারলেও স্বয়ম্ভুনাথ প্রাণীটাকে একবার দেখেছিলেন সুমাত্রাফেরত এক পশু ব্যবসায়ীর জাহাজে। এ খাঁচায় যে প্রাণীটা আছে সে শিশু। বয়সকালে এই প্রাণী প্রায় মানুষের আকৃতির হয়—শিম্পাঞ্জি। বাচ্চা মেয়েটা আর প্রাণীটা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে খাঁচার মেঝেতে শুয়ে আছে নিশ্চলভাবে। সমুদ্রের জলে দীর্ঘসময় থাকার কারণে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার দেহ। বেশ কিছু মাছও খাঁচার ভিতরে ঢুকে আটকে পড়েছিল। এমন নিস্পন্দভাবে খাঁচার ভিতর দেহদুটো পড়ে আছে যে প্রাথমিক ভাবে তাদের দেখে স্বয়ম্ভুনাথ বুঝতে পারলেন না তারা জীবিত না মৃত। একটা তীব্র আঁশটে গন্ধ নাকে এসে লাগছে! তা কি ওই মরা মাছ

BanglaBook.org

থেকেই, নাকি তা আসছে আলিঙ্গনরত মেয়েটা আর প্রাণীটার দেহ থেকে? মরে গেছে তারা?

স্বয়ম্ভুনাথ বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন, কোথা থেকে এই অদ্ভুত খাঁচাটা সমুদ্রের বুকে ভেসে এল? কোনও জাহাজ থেকে কি খাঁচাটাকে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল সমুদ্রের বুকে? সমুদ্রের বুকে জাহাজ থেকে মানুষকে ছুড়ে ফেলে হত্যার ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই মেয়েটাকে প্রাণীটার সঙ্গে খাঁচা-বন্দি অবস্থায় সমুদ্রে ফেলা হল কেন?

হঠাৎ একজন নাবিক বলে উঠল, 'আরে বাঁদরটা বেঁচে আছে! নড়ছে নড়ছে!'

স্বয়ম্ভুনাথ দেখতে পেলেন সত্যিই প্রাণীটা এবার ঘাড় ফিরিয়ে চোখ পিট পিট করছে! আর এরপরই বাচ্চা মেয়েটার দেহটাও যেন নড়ে উঠল! নাবিকরা তাই দেখে বলে উঠল, 'মেয়েটাও মনে হয় এখনও বেঁচে আছে!'

স্বয়ম্ভুনাথ সঙ্গে সঙ্গে কাছে দাঁড়ানো এক গণিকাকে ডেকে মেয়েটাকে খাঁচার বাইরে বার করতে নির্দেশ দিলেন। মেয়েটাকে বাইরে বার করে কোলে তুলে নিল সেই গণিকা। তার দেহের উষ্ণতা পেয়ে আবারও নড়ে উঠল তার ছোট্ট দেহটা। হ্যাঁ, সত্যি বেঁচে আছে মেয়েটা! স্বয়ম্ভুনাথ বললেন 'ওর শুশ্রূষা করো। জানা দরকার, ও এমনভাবে কোথা থেকে এল?'

স্বয়ম্ভুনাথ মনে মনে ভাবলেন, মেয়েটাকে যদি বাঁচিয়ে তোলা যায় তবে তার লাভ-ই আছে। কোথাও ক্রীতদাসী হিসাবে তাকে বেচে দেওয়া যেতে পারে। কালিকটের অভিজাত পরিবারগুলোতেও এ ধরনের বাচ্চা মেয়ের চাহিদা আছে। আবার এ-মেয়েটাকে পাঁচ-ছ'বছর যদি খাওয়ানো-পরানো যায় তবে তারপর তাকে গণিকাবৃত্তিতে নামানো যাবে।

ডেক সংলগ্ন অনেক ক'টা ঘর আছে, তারই একটাতে মেয়েটাকে নিয়ে গেল গণিকা। তার সারা শরীরে উষ্ণ ঘি মাখিয়ে মালিশ করে, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা মধু ঢেলে তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা শুরু করল। আরও বেশ কয়েক জন গণিকাও নিয়োজিত হল এ কাজে। ওদিকে ডেকের মাঝখানে রাখা খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে বাঁদর গোত্রের সেই প্রাণীটা খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে দড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে চড়ে বসল মাস্তুলের গায়ে একটা পাটাতনের ওপর। পাল তুলে আবার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ভেসে চলল মৃচ্ছকটিক।

BanglaBook.org

বিকাল নাগাদ, গণিকাদের প্রচেষ্টায় কাজ হল। জ্ঞান ফিরে উঠে বসল মেয়েটা। খবরটা পেয়ে স্বয়ম্ভুনাথ হাজির হলেন সেই কক্ষে। বিস্মিত-ভয়ার্ত চোখে চারপাশে তাকাচ্ছে মেয়েটা। গালিচার ওপর তাকে ঘিরে বসে আছে গণিকার দল। স্বয়ম্ভুনাথকে দেখেই প্রথমে সে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল পার্শ্ববর্তী এক গণিকার গলা। সে গণিকা মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে, তার গালে চুমু খেয়ে তার ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করতে লাগল। সম্ভবত ব্যাপারটা কাজ দিল। ধীরে-ধীরে মেয়েটা যেন স্বাভাবিক হতে শুরু করল। স্বয়ম্ভুনাথ বেশ অনেককটা ভাষা জানেন তার কাজের সুবাদে। নিজের দেশের বেশ কয়েকটা ভাষা তো জানেনই, এমনকী পর্তুগিজ, ইংরাজি শব্দও কিছুটা বলতে পারেন।

মেয়েটাকে দেখে স্বয়ম্ভুনাথের কেন জানি মনে হল মেয়েটা আরব গোষ্ঠী ভুক্ত হতে পারে। তিনি নরম গলায় বাচ্চা মেয়েটার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম কী? কোথা থেকে আসছ?'

প্রশ্নটা আয়েষার কানে গেল ঠিকই। প্রশ্নটা সে বুঝতেও পারল কিন্তু কোন জবাব দিতে পারল না সে। কিছুই তার মনে নেই। তার চোখের সামনে শুধু খালি অতল জলরাশি। সেই জলরাশিতে খাঁচাবন্দি অবস্থায় কখনও সে ডুবে যাচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। পরক্ষণেই সে, খাঁচাসমেত আবার ভেসে উঠে ঢেউয়ের দোলায় দুলতে-দুলতে এগিয়ে চলেছে দিকচিহ্নহীন অকূল দরিয়ার পানিতে। তাকে জড়িয়ে ধরে আছে 'রানি'। ওই একজনকেই, একটা নামই মনে আছে তার। নিজের নামও ভুলে গেছে সে। রানির কথা মনে পড়তেই সে চারপাশে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল রানিকে।

স্বয়ম্ভুনাথ বেশ কয়েক বার একই প্রশ্ন করলেন মেয়েটাকে। অবশেষে মেয়েটা আরবিতে এক সময় ভয়ে ভয়ে জবাব দিল—

'কিছু মনে পড়ছে না আমার।'

'কিছুই না? নাম-ধাম-কোথা থেকে এলে কিছুই না? জানতে চাইলেন স্বয়ম্ভুনাথ।

'মেয়েটা একটু চুপ করে থেকে বলল—'না, কিছুই মনে পড়ছে না। শুধু

BanglaBook.org

রানিকে মনে পড়ছে। রানি কই?'—এই বলে সে চারপাশে তাকিয়ে রানিকে খোঁজার চেষ্টা করতে লাগল।

'রানিকে? কোন দেশের রানি?' ব্যাগ্রভাবে জানতে চাইলেন স্বয়ম্ভুনাথ।

মেয়েটা জবাব দিল, 'আমার সঙ্গে খাঁচার মধ্যে যে ছিল। সেই বানরটা।'

স্বয়ম্ভুনাথ এবার হেসে ফেললেন। মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে তিনি জবাব দিলেন, 'সে এখন খোশমেজাজে মাস্তুলে বসে নাবিকদের ছুড়ে দেওয়া ফল খাচ্ছে। তা তুমি ওকে কোথায় পেলে? তোমার সঙ্গে ও এল কীভাবে?'

শিম্পাঞ্জিটা নিরাপদে আছে জেনে মেয়েটা একটু আশ্বস্ত হল ঠিকই। কিন্তু সে উত্তর দিল, 'আমার কিছুই মনে নেই।'

যে সমুদ্রবনিতার ওপর স্বয়ম্ভুনাথ মেয়েটার পরিচর্যার ভার দিয়েছিলেন তার নাম ভর্তিকা। তার যৌবন অতিক্রান্ত হতে চলেছে। সাধারণত এখন সে খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের কাজে লাগে না। স্বয়ম্ভুনাথ তাকে মৃচ্ছকটিকে রেখেছেন সদ্য যৌবনা নবাগত গণিকাদের কীভাবে খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করতে হয় তার তালিম দেবার জন্য। মেয়েটার জবাব শোনার পর স্বয়ম্ভুনাথ ভর্তিকাকে বললেন, 'ও তো কিছুই মনে করতে পারছে না দেখছি। আপাতত ও তোমার তত্ত্বাবধানেই থাক। কালিকটে ফেরার পর মেয়েটাকে নিয়ে কী করব ভাবা যাবে।'

ভর্তিকা জবাব দিল, 'আচ্ছা প্রভু। আপাতত ওর বিপদের কোনও কারণ দেখছি না, আপনি যেমন চাইবেন তেমনই হবে।'

এ কথা বলার পর ভর্তিকা জানতে চাইল, 'ওর সঙ্গিনী বান্দরীর নাম তো জানা গেল। কিন্তু কী নামে ডাকব ওকে?'

মেয়েটাকে যখন উদ্ধার করে জাহাজের ডেকে তোলা হয়েছিল সেইসময় মাছের গায়ের গন্ধের মতো একটা তীব্র আঁশটে গন্ধ বেরোচ্ছিল মেয়েটার শরীর থেকে। মেয়েটার শরীরে গণিকারা ঘৃত-মধু লেপন করলেও এ কক্ষে ঢোকার পরই সেই আঁশটে গন্ধটা নাকে লেগেছিল স্বয়ম্ভুনাথের। হয়তো বা বাতাসে রয়ে গেছিল গন্ধটা। হয়তো সে জন্যই একটু ভেবে নিয়ে মৃচ্ছকটিকের প্রভু স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'ওর নাম দিলাম—'মৎসগন্ধা।'

'আঁশটে গন্ধের সঙ্গে যৌনতাও মিশে থাকে। অনেকে এ-গন্ধের মধ্যে যৌন গন্ধও খুঁজে পায়। নারী রজস্বলা বলেই কি? হয়তো এ কারণেও প্রভু স্বয়ম্ভুনাথ মেয়েটার নাম 'মৎস্যগন্ধা' দিয়ে থাকতে পারেন। প্রভুর মনের খবর

BanglaBook.org

তো আমার জানা নেই। মৎস্যগন্ধাও আর কয়েকবছর পর হয়তো আমাদের মতোই হবে।' স্বয়ম্ভুনাথ চলে যাবার পর সঙ্গিনী সমুদ্র-সুন্দরীদের কাছে এ-মন্তব্য করল ভর্তিকা।

হেসে উঠল সবাই। বাচ্চা মেয়েটা বুঝতে পারছে না দেহোপজীবিনীদের কথাবার্তা। একজন রূপজীবিনী ভর্তিকাকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, প্রভুর ব্যবসা তো নারীদেহ নিয়ে। একথা শুনেছি যে মদ্য কারবারীরা নিজেরা মদ্যপান করেন না, গোয়ালাদের দুগ্ধ পান করার সুযোগ ঘটে না সেহেতু তিনি আমাদের স্পর্শ না-ই করতে পারেন। কিন্তু বিবাহ তো পুরুষের ধর্ম। কামেচ্ছার জন্য না হলেও অন্তত পরলোকের কথা ভেবেও তো বিবাহ করে অনেক পুরুষ।

তার কথা শুনে আর একজন দেহোপজীবিনী জানতে চাইল, 'তার মানে?'

পূর্ববর্তী রূপজীবি জবাব দিল, 'হিন্দুশাস্ত্রে নাকি আছে যে বংশরক্ষা না করলে, অর্থাৎ পুত্রসন্তান লাভ না করতে পারলে নাকি অনন্ত নরকবাস হয়। পুত্র তো পিণ্ডদান করে। আমি আমার স্বামীর তৃতীয় স্ত্রী ছিলাম। প্রথম দুই স্ত্রীর কোনও সন্তান ছিল না। আমার গর্ভে তার সন্তান এল। বাচ্চাটা দুধ ছাড়ার পরই আমার সেই স্বামী কৌশলে তার অন্য দুই স্ত্রীর সঙ্গে আমাকে বেচে দিল বন্দরের বেশ্যালয়ে। আমার বয়স তখন মাত্র ষোলো। রজস্বলা হবার পরই সন্তান ধারণ করেছিলাম। আমার স্বামী লোকটা ছিল ব্রাহ্মণ। এক মন্দিরের পূজারি। আসলে লোকটা কামেচ্ছার জন্য তিন নারীকে বিবাহ করেনি। তাঁর বিবাহের আসল কারণ ছিল বংশরক্ষা। নরকবাসের ভয়ে ভীত ছিল যে। তার মনস্কাম পূর্ণ হতেই মাত্র পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে আমাকে সে বন্দরে বেচে দিল।'

বারবনিতা সমাগমের মধ্যে একজন ছিল, তার নাম কৈকেয়ী। সার্থক নাম তার। হিংসুটে স্বভাব। নেহাত পুরুষ্ট যৌবনবতী দেহ তার যেজন্য সে রয়েছে এই ময়ূরপঙ্খিতে।

সে প্রথমে মৎস্যগন্ধার দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রভু ওকে রাখতে বলে গেল ঠিকই, কিন্তু ওকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করার দরকার নেই। ও তো আর কোনও দিন মহারানি বা বেগম হবে না, আমাদের মতো সমুদ্র বেশ্যা বা বন্দর-বেশ্যাই হবে। ওর কপাল যদি খুব ভালো থাকে তবে কোনও হারেমের দাসী-বাঁদি হবে।'

মেয়েটার ব্যাপারে একথা বলার পর সে একটু আগে যে বনিতা তার

BanglaBook.org

সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনি ব্যক্ত করল তার উদ্দেশ্যে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে বলল, 'তোর স্বামীর আগের দুই মাগি তো সন্তানের জন্ম দিতে পারেনি। তোর সন্তান হল কীভাবে? স্বামী যখন মন্দিরে যেত তখন অন্য কেউ ঘরে আসত নাকি?'

কৈকেয়ীর কথা শুনে সেই নারী বলে উঠল, 'তোর কথা আর জানতে বাকি নেই। আমাকে তো না হয় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। মালিকের সম্পত্তি বলে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে পুরুষের সঙ্গে শুতে হয়। তোর তো স্বামী ছিল। তাকে ত্যাগ করে রেশমবস্ত্র আর স্বর্ণালঙ্কারের লোভে স্বেচ্ছাভোগ্যা হলি। নরকেও ঠাঁই হবে না তোর মতো পাপিষ্ঠার।'

এই ভাসমান গণিকালয়ে তিন ধরনের নারী আছে। একদল নারী, যাদের দাসীর হাট বা বন্দরের নানা বেশ্যালয় থেকে কাঞ্চন বা রৌপ্য মূল্যে ক্রয় করে এনেছেন প্রভু। কখনও বা তাদের জলদস্যুদের জাহাজ থেকেও ক্রয় করা হয়। এরা হল প্রভু স্বয়ম্ভুনাথের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাদের ভরণপোষণের বিনিময়ে তাদের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের সবটুকুই গ্রহণ করেন প্রভু। এ ধরনের গণিকাদের বলা হয় 'দাসী' বা 'কামদাসী'। আর দ্বিতীয় ধরনের সমুদ্রগণিকা হল তারা, যারা প্রভু বা মালিকের সম্পত্তি নয়। স্বেচ্ছায় উঠে এসেছে এই সমুদ্রবেশ্যাদের তরীতে। নাবিকরা তাদের দেহের জন্য যে মূল্য নির্ধারণ করে তা আধাআধি ভাগ হয় বনিতা ও বেশ্যাপোতের অধিপতিদের মধ্যে। কামুক নাবিকদের থেকে প্রাপ্ত উপহারও তারা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারে না, তা তুলে দিতে হয় না প্রভুর হাতে। এরা হল 'স্বেচ্ছাভোগ্য'। সর্বশেষ তৃতীয় ধরনের সমুদ্রসুন্দরীরা পালের কাছিঅলাদের পত্নী বা উপপত্নী। যাদের বলা হয় 'মক্ষিকা'। মধুরূপী অর্থের গন্ধ পেলে এরা অর্থবান নাবিকদের প্রলুব্ধ করে তাদের শয্যাসঙ্গিনী হয়। তাদের আয়ের এক-তৃতীয়াংশ তুলে দিতে হয় জাহাজের প্রভু বা মালিকের হাতে। মোটামুটি এ নিয়মই চলে অন্য বেশ্যাপোতগুলোতেও।

সেই বারবনিতা কৈকেয়ীকে সমুচিত জবাব দেওয়াতে হেসে উঠল অন্য নারীরা। অপমানিত কৈকেয়ী কক্ষ ত্যাগ করল। সে চলে যাবার পর সবাই আবারও পুরোনো আলোচনায় ফিরে এল। প্রথম গণিকার প্রশ্নের জবাবে ভর্তিকা বলল, 'শুনেছি আমাদের প্রভুর বিবাহ হয়েছিল। তখন কালিকট বন্দরে ছোট মশলার দোকান ছিল তার। সেই নারী নাকি অসাধারণ সুন্দরী ছিল। কিন্তু মালিকের কপাল মন্দ। এক রাতে মালিকের স্ত্রী তার যাবতীয় টাকাপয়সা

BanglaBook.org

হাতিয়ে নিয়ে এক আরব জাহাজের চড়ে বসল। নারীদের ওপর সম্ভবত একটা বিতৃষ্ণা কাজ করে প্রভুর মনের ভিতরে।'

কথাটা শুনে একজন গণিকা বলল, 'তবে প্রভুর এত সম্পত্তি ভবিষ্যতে কে ভোগ করবে?'

তার এ প্রশ্নর উত্তরে বিভিন্ন তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগল উপস্থিত বনিতাদের মধ্যে। ছোট্ট মেয়েটা তাদের কথাবার্তা বুঝতে না পেরে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। নিজের সম্বন্ধে কিছুই মনে করতে পারছে না সে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে শুধু জল, শুধু জল! খাঁচাটা সমেত সে ডুবে যাচ্ছে জলে, আবার ভুস করে ভেসে উঠছে...

কক্ষ থেকে বেরিয়ে ডেকে গিয়ে স্বয়ম্ভুনাথ দেখতে পেলেন জাহাজের নারী-পুরুষদের অনেকেই জড়ো হয়েছে ডেকে। শিম্পাঞ্জিটা কসরত দেখাতে শুরু করেছে। কোনও সময় এক মাস্তুল থেকে অন্য মাস্তুলে ঝাঁপাচ্ছে, আবার কখনও মাস্তুলের আড়কাঠে পা-বিঁধিয়ে মাথা নীচু করে দোল খাচ্ছে। তা দেখে বেশ আমোদ পাচ্ছে নাবিক ও গণিকারা। স্বয়ম্ভুনাথও ওপর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন তার কারসাজি। তারই মধ্যে আকাশের বুকে একবার একটা জিনিস দেখতে পেলেন তিনি—ছোট্ট একখণ্ড কালো মেঘ। একসময় বিকেল গড়িয়ে অন্ধকার নামল। ধীরে ধীরে ফাঁকা হতে শুরু করল ডেক। স্বয়ম্ভুনাথও নিজের কক্ষে ফিরে এলেন। অন্ধকার নামল সমুদ্রের বুকে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সবার অলক্ষে কিছু একটা ধেয়ে আসতে লাগল জাহাজের দিকে।

প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভাঙে স্বয়ম্ভুনাথের। এদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। কক্ষে যে গোলাকার গবাক্ষ আছে তা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। কিন্তু বাইরেটা এখনও এত অন্ধকার কেন? আজ কি সূর্যোদয় হতে বিলম্ব হচ্ছে? নাকি তিনি আগেই উঠে পড়েছেন? ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না স্বয়ম্ভুনাথ। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে ডেক ছেড়ে বাইরে আসতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল তার কাছে। গতকাল সূর্যাস্তের আগে তিনি অনেক দূরে যে একখণ্ড মেঘ দেখেছিলেন তা বাড়তে-বাড়তে কালো চাঁদোয়ার মতো সারা আকাশকে গ্রাস করে নিয়েছে। সূর্যদেব তার আড়াল থেকে উঁকি দিতে পারছেন না। আর এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। আকাশ ভাঙা বৃষ্টি।

BanglaBook.org

স্বয়ম্ভুনাথ ভেবেছিলেন বাপ্যারটা হয়তো সাময়িক। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি থেমে যাবে। কিন্তু বেলা যত বাড়তে লাগল তার সঙ্গে বৃষ্টিও বেড়ে চলল। কাঠের বালতিতে জল ছাঁচতে শুরু করল মাল্লারা। আর এরপরই শুরু হল সত্যিকারের বিপদ। বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বাতাস বইতে শুরু করল। শুরু হল সামুদ্রিক ঝড়। স্বয়ম্ভুনাথ আর নাখোদার নির্দেশে জাহাজের পাল গুটিয়ে ফেলা হল যাতে বাতাস জাহাজটাকে বিপথে নিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ তেমন কিছু হল না। বাতাস ঠেলতে শুরু করল ময়ূরপঙ্খিকে। প্রচণ্ড দুলতে শুরু করল জাহাজটা। এমন দুলুনি যে মাস্তুলের ওপর যে দিকদর্শী বসে ছিল তাকে নীচে নেমে আসতে হল। ধীরে ধীরে এবার আতঙ্ক শুরু হল গণিকাদের মধ্যে। আর তা সংক্রমিত হল কিছু মাল্লাদের মধ্যেও। প্রবল বর্ষণ আর বাতাসের মধ্যেই দলে দলে ডেকে বেরিয়ে আসতে লাগল তারা। কিন্তু বাইরের পরিবেশ দেখে তারা আরও আতঙ্কিত হয়ে উঠল। এরপর সমুদ্রের কালো জলও ফুঁসে উঠতে লাগল। ঢেউগুলো কালনাগিনীর মতো ফণা তুলে ছোবল দিতে শুরু করল জাহাজের গায়ে। গণিকার দল আতঙ্কে কাঁদতে শুরু করল এবার। স্বয়ম্ভুনাথ, নাখোদা আর কয়েকজন মাল্লা মিলে কখনও হাল ধরে, কখনও কাছি টেনে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগল জাহাজটাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার। কিন্তু সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হল না। ক্রমশ জাহাজটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। উত্তাল সমুদ্র যেন লোফালুফি খেলা শুরু করল ময়ূরপঙ্খিটাকে নিয়ে। সমুদ্রজীবনে বহু তুফান দেখেছেন স্বয়ম্ভুনাথ, কিন্তু তিনি এমন দুর্যোগের মুখোমুখি কোনও দিন হননি।

আরও আরও ফুঁসে উঠতে লাগল সমুদ্রের জল। এবার সে নীচ থেকে অজগর সাপের মতো উঠে এসে আছড়ে পড়তে লাগল ডেকের ওপর। সেই জলোচ্ছ্বাসের আঘাতে ছিটকে পড়তে লাগল ডেকে সাজিয়ে রাখা কাঠের পিপেসহ অন্য সব জিনিস। অজগরের মতো ঢেউগুলো এবার যেন জাহাজটাকে সমুদ্রের জলের নীচে টেনে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি শুরু করল। প্রচণ্ড এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল ডেকে। আতঙ্কিত গণিকার দল এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করল, আর তার সঙ্গে শুরু হল মাল্লাদের চিৎকার। স্বয়ম্ভুনাথের চোখের সামনেই এক গণিকা আতঙ্কে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ডেকের কাঠের প্রাচীর টপকে ঝাঁপ দিল জলে। মুহূর্তের মধ্যে সে হারিয়ে গেল সমুদ্রর গভীরে। এসবের মধ্যেই হঠাৎ একজন গণিকা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলল, 'কেন

এমন ঝড় উঠল! কেন আমরা ডুবে যাচ্ছি?'

তার কথার প্রত্যুত্তরে অপর এক নারীকণ্ঠ চিৎকার করে উঠল, 'নিশ্চই ওই মেয়েটার জন্য।'

স্বয়ম্ভুনাথ তাকিয়ে দেখতে পেলেন, গণিকা কৈকেয়ীকে। অন্যরাও ফিরে তাকাল তার দিকে।

কৈকেয়ী তারপর বলে উঠল, 'আকাশে তো মেঘ ছিল না, তবে হঠাৎ তুফান উঠল কেন? নিশ্চই ওই মেয়েটার জন্য। সামলে, ও সমুদ্র-শয়তান! মেয়ের রূপ ধরে এসেছে। বাঁদরটাও অদ্ভুত বাঁদরি। শয়তানের অনুচর। নইলে ওরা ভাসতে ভাসতে কোথা থেকে এল? কীভাবে এল? ওদের জন্যই তীরের কাছাকাছি এসে ডুবতে বসেছি আমরা। এ-জাহাজ সমুদ্রের নীচে টেনে নিয়ে যাবার জন্যই ও জল থেকে জাহাজে উঠে এসেছে। ও আমাদের সবাইকে মারবে।'

সত্যিই তো! বাচ্চা মেয়েটা ওভাবে কোথা থেকে ভেসে এল, তার কোনও উত্তর মেলেনি। তাছাড়া সমুদ্র তো শান্তই ছিল এতদিন। ঝড়ের কোনও পূর্বাভাসই ছিল না। মেয়েটাকে জল থেকে তোলার পরই তো এই দুর্যোগ নেমে এল! মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটা সংক্রামিত হল কুসংস্কারগ্রস্ত নাবিকদের মধ্যে। একজন বলে উঠল, 'তাহলে ওদের এখনই জলে ছুঁড়ে ফেল!'

অন্যরাও সমস্বরে বলে উঠল, 'ফেলে দাও, জলে ফেলে দাও ওদের। সবাই তাদের জলে দেবার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

নাখোদা বা ক্যাপ্টেন আর স্বয়ম্ভুনাথ বুঝতে পারলেন, মাল্লা-নাবিকদের বুঝিয়ে কোনও লাভ হবে না। মৃত্যুভয়ে তারা এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে যে তাদের বাধা দিতে গেলে তারা হয়তো ক্যাপ্টেন আর স্বয়ম্ভুনাথকেই উত্তাল সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলবে। ইতিপূর্বে এমন নানা ঘটনার কথা শোনা গেছে। ক্রুদ্ধ নাবিকদের হাতে নিহত হয়েছেন ক্যাপ্টেন বা জাহাজের প্রভু। কাজেই তারা নাবিকদের বাধাদান করা সমীচীন বোধ করলেন না। নাবিকদের দল ছুটল খোলের ভিতর থেকে মেয়েটাকে বার করে আনার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটাকে বের করে আনল তারা। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। জাহাজটা এখন দুলতে দুলতে উল্কার গতিতে ছুটতে শুরু করেছে দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে। মেয়েটাকে তারা ডেকের রেলিং-এর দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। জাহাজটা এত গতিতে ছুটছে আর দুলছে যে টাল সামলানো

BanglaBook.org

মুশকিল। অসতর্ক হলে নিজেদেরই সমুদ্রে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা। মেয়েটাকে একলা টেনে আনতে দেখে একজন বলল, 'ওর অনুচর বাঁদরীটা কই? ওকেও তো জলে ফেলতে হবে।'

তার কথার প্রত্যুত্তরে অন্য একজন নাবিক বলল, 'সে শয়তানীটা ওই দেখো মাস্তুলের মাথায় বসে আছে। মেয়েটাকে জলে ফেললে নিশ্চয়ই সে ও জলে ঝাঁপ দেবে। তাড়াতাড়ি ওকে জলে ফেলো। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।'

দ্বিতীয় লোকটার কথা কানে যেতেই স্বয়ম্ভুনাথ আর ক্যাপ্টেন তাকালেন মাস্তুলের দিকে। জাহাজটার দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে বিশাল মাস্তুলটাও ঠিক দোলকের মতো দুলছে। মনে হচ্ছে প্রবল ঝড়ের দাপটে এই বুঝি সেটা মড়মড় করে ভেঙে পড়বে। আর প্রবল ঝঞ্ঝার মধ্যেও দু-পায়ে মাস্তুলটা আঁকড়ে তার মাথায় বসে আছে প্রাণীটা। চিৎকার করছে সে। যদিও এতক্ষণ তার শব্দ লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচি আর ঝড়ের শব্দের জন্য কানে পৌঁছোয়নি। স্বয়ম্ভুনাথের যেন মনে হল শিম্পাঞ্জিটা মানুষের মতোই হাত দিয়ে সমুদ্রে কী যেন একটা জিনিস নীচের ডেকে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকেদের দেখাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে!

একই কথা মনে হল ক্যাপ্টেনেরও। তার তাকালেন সমুদ্রের দিকে। এবং তাঁদের চোখে ধরা দিল ব্যাপারটা। কিছুটা দূরেই সমুদ্রর ভিতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কোন মহাদানবীয় কচ্ছপের পিঠের মতো দেখতে একটা বস্তু। সমুদ্রের উত্তাল জলরাশি তার ওপর আছড়ে পড়ে তার চারপাশে প্রবল ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে। মৃচ্ছকটিক উল্কার গতিতে এগিয়ে চলেছে সেদিকেই! ডুবো পাহাড়! এবার কী ঘটতে চলেছে তা বুঝতে অসুবিধা হল না তাঁদের দুজনের। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই নীল ঘূর্ণি জাহাজটাকে তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলবে পাহাড়টার গায়ে। মুহূর্তের মধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে জাহাজটা!

মৃচ্ছকটিককে বাঁচানোর জন্য শেষ একটা চিৎকার করলেন স্বয়ম্ভুনাথ আর ক্যাপ্টেন—'বাঁ দিকে হাল মারো সবাই, বাঁ দিকে হাল মারো!'

সৌভাগ্যবশত এই দুর্যোগের মধ্যেও হালিরা তখনও হাল ধরে বসেছিল। স্বয়ম্ভুনাথ আর ক্যাপ্টেনের চিৎকার তাদের কানে গেল। এই সামান্য কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানেই উল্কার গতিতে ছুটে চলা জাহাজটা মৃত্যুঘূর্ণির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তাদের চিৎকার কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হালিরা হাল ঘোরাল। একসঙ্গে অনেকগুলো হাল ঘোরানোতে জাহাজটা বাঁ দিকে একেবারে

BanglaBook.org

কাত হয়ে গেল। ডেকে যা যা ছিল সবকিছু ছিটকে পড়ল জলে। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন মনে হল যে, বাঁ দিকে কাত হয়ে হয়ে সোজা পাতালপ্রবেশ করছে জাহাজটা। কয়েকজন হতভাগ্য গণিকা আগাম আঁচ করতে পারেনি ব্যাপারটা। ডেক থেকে তারা ছিটকে পড়ল সমুদ্রের জলে। জাহাজটার সঙ্গে ডুবো পাহাড়ের নিচের দিকের একটা অংশের সংঘর্ষে জাহাজ থেকে ডানপাশে বাইরে বেরিয়ে থাকা সার সার দাঁড়গুলো কাঠির মতো ভেঙে গিয়ে, আকাশের ছিটকে উঠল ঠিকই, কিন্তু জাহাজের মূল কাঠামোকে স্পর্শ করতে পারল না মৃত্যু। কাত হয়ে ডুবো পাহাড়টাকে তিরবেগে পাশ কাটিয়ে ডুবতে-ডুবতেও এক সময় আবার সোজা হয়ে গেল জাহাজটা। আর এর কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎই যেন ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল সেই ভয়ঙ্কর তুফান। মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে শুরু করল সূর্য। সারা জাহাজ জুড়ে উল্লাসধ্বনি শোনা গেল—'বেঁচে গেছি! বেঁচে গেছি! ঝড় থেমে গেছে! ঝড় থেমে গেছে!

কিন্তু সেই বাচ্চা মেয়েটা কই? সমুদ্রে ছিটকে পড়ল নাকি? কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্য মেয়েটাকে দেখতে পেল তারা। জাহাজ যখন কাত হয় তখন তাকে যারা জলে ফেলতে যাচ্ছিল, মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে এটা-ওটা আঁকড়ে ধরেছিল নিজেদেরকে বাঁচাবার জন্য। আর মেয়েটা ছিটকে পড়েছিল জাহাজের ডেকের এক কোণে কুণ্ডলীকৃত যে কাছিগুলো রাখা আছে তার মধ্যে। সেখানে আটকে যাওয়াতেই সে জলে পড়েনি। বেঁচে গেছে মেয়েটা! ইতিমধ্যে তার পোষ্যটাও মাস্তুল ছেড়ে তার কাছে নেমে এসেছে। দড়িদড়ার মধ্যে তারা জড়াজড়ি করে বসে আছে! আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যে নাবিকদের দল কিছুক্ষণ আগে মেয়েটাকে জলে ফেলতে যাচ্ছিল তাদেরই মধ্যে একজন এবার হঠাৎ বলে উঠল, 'ওর জন্যই তো আমরা বেঁচে গেলাম। ওর বাঁদরীটাই তো ডুবোপাহাড়টা দেখাল! নইলে কেউ বাঁচতাম না আমরা! সমুদ্র দেবতা আমাদের রক্ষা করার জন্যই ওদের পাঠিয়েছিলেন।'—এই বলে সে ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিল তাকে। মেয়েটাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠল নাবিকরা। এর পর হঠাৎই একজন বলল, 'কিন্তু সে শয়তানীটা কই? যে মেয়েটাকে জলে ফেলে আমাদের সবাইকে মারতে চেয়েছিল? আর একটু হলেই তো ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে মরতাম আমরা!'

কৈকেয়ী এখন ডেকের ধারে একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। নাবিকদের দৃষ্টি পড়ল তার ওপর। তারা বলে উঠল, 'জলে ফেলে দাও, জলে ফেলে

BanglaBook.org

দাও ওই পিশাচীকে।'

কথাটা শোনামাত্রই কৈকেয়ী ডেক ছেড়ে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল খোলের ভিতরে। কিন্তু একজন নাবিক গিয়ে ধরে ফেলল তাকে। অন্যরাও ঘিরে ফেলল তাকে। নাবিকদের মাথায় যখন খুনের নেশা চাপে তখন তাদের নিরস্ত করা কঠিন হয়। বাচ্চা মেয়েটাকে তারা জলে ফেলতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু সেই খুনের ভাবনাটা তখনও রয়ে গেছে তাদের অবচেতনে। যতক্ষণ না তারা কাউকে খুন করতে পারছে ততক্ষণ তাদের শান্তি হবে না। কাজেই ব্যাপারটা দেখে চুপ করে রইলেন স্বয়ম্ভুনাথ। কয়েকজন নাবিক পাঁজাকোলা করে উঠিয়ে নিল সেই বারবনিতাকে। তারপর ডেকের রেলিং-এর কাছে নিয়ে গিয়ে তার হাত-পা ধরে বেশ কয়েকবার দোল খাইয়ে তাকে জাহাজ থেকে ছুড়ে ফেলল সমুদ্রের বুকে। কৈকেয়ীর আর্তচিৎকার গ্রাস করে নিল সমুদ্র। হয়তো বা শাপমুক্তি ঘটল সেই নারীর। দুর্যোগ থেকে পুনর্জন্ম লাভ করে ডেকে বেরিয়ে আসতে লাগল বনিতাদের দল। ভর্তিকাও আছে তাদের মধ্যে। তার হাতে মেয়েটাকে আবার তুলে দিল নাবিকরা। সবাই ধীরে ধীরে উঠে এল ডেকে। বৃষ্টি থেমে গেল। মেঘের আবরণ সরে গিয়ে দেখা দিল নীল আকাশ আর ঝলমলে সুন্দর রোদ। যেন কোনও সময়েই কিছু হয়নি। একইভাবে আগের মতো ভেসে চলছে ময়ূরপঙ্খি জাহাজ। ঝড়ঝঞ্ঝার ব্যাপারটা যেন নিছকই দুঃস্বপ্ন ছিল। শিম্পাঞ্জিটা আবার মাস্তুলের ওপরে চড়ে কসরত দেখাতে শুরু করল নাবিকদের।

জাহাজের সব নাবিক ও গণিকাদের গুনতি করলেন স্বয়ম্ভুনাথ। কৈকেয়ী ছাড়া চারজন গণিকা আর একজন দাঁড়িকে পাওয়া যাচ্ছে না। সমুদ্র গ্রাস করে নিয়েছে তাদের। স্বয়ম্ভুনাথ হিসাব করে দেখলেন এছাড়া ক্ষয়ক্ষতি বলতে জাহাজের একপাশের দাঁড়গুলো ভেঙে গেছে আর ডেকে রাখা পিপে আর আসবাবগুলো হারিয়ে গেছে। সামান্য কিছু জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সামুদ্রিক ঝড়ে। স্বয়ম্ভুনাথ আর ক্যাপ্টেন আলোচনা করে পাল খাটানোর নির্দেশ দিলেন। জাহাজে যে কাঠ আছে তা দিয়ে দাঁড় বানানোর নির্দেশও দেওয়া হল। এবার যে-যার কাজে লেগে পড়ল নাবিকমাল্লার দল। মৎস্যগন্ধাকে নিয়ে ডেক ছেড়ে ভিতরে চলে গেল গণিকারা। মৃচ্ছকটিক শান্ত ভাবে ভেসে চলল আগের মতোই। দিক্‌দর্শী চুম্বককাঁটা জানিয়ে দিয়েছিল যে মৃচ্ছকটিক সমুদ্রঝঞ্ঝার কবলে পড়ে তার যাত্রাপথ থেকে বেশ কিছুটা দক্ষিণে সরে এসেছে। জাহাজের

BanglaBook.org

অভিমুখ বদলে তাই গন্তব্যে পৌঁছতে বাড়তি অনেকটা সময় লাগল জাহাজের। চারদিন পর এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে দেখা দিল তটরেখা। মৃচ্ছকটিক তার নাবিক, গণিকা আর মৎস্যগন্ধাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ফিরে এল কালিকটে।

৪

সম্পদশালী বন্দরনগরী কালিকট। পার্শ্ববর্তী মালাবার ও অন্যান্য বন্দরগুলো থেকে সে আজ ছিনিয়ে নিয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট। অথচ সমুদ্রব্যবসায়ীদের কাছে অনেক বেশি সুবিধাজনক ছিল মালাবার বন্দরই। ভৌগোলিক সুবিধার দিক থেকেও, নিরাপত্তার দিক থেকে কালিকট বন্দর জাহাজ ভেড়াবার পক্ষে উপযোগী ছিল না। উপকূলে কাদামাটির চরায় এই তো সেদিনও গাছের গুড়ির মতো পড়ে থাকত কুমিরের দল। অসতর্ক কোনও নাবিক জাহাজ বা নৌকো থেকে নেমে কর্দমাক্ত তটরেখা অতিক্রম করে নগরীতে প্রবেশ করতে গিয়ে কুমিরের খাদ্যে পরিণত হত। মৌসুমী বায়ুর ধাক্কায় প্রবল জলোচ্ছাস প্লাবিত করত নগরীকে, তাছাড়া জলদস্যুর উৎপাত তো ছিলই। কিন্তু এসব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে পেরেছে শাসক সামোরিন ও কালিকটের বণিকদের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি। শাসক সামোরিন বাণিজ্য প্রসারের জন্য ও নগরীর উন্নতির জন্য নানা নীতি গ্রহণ করেছেন। জলোচ্ছ্বাস থেকে নগরীকে বাঁচাবার জন্য ঘোড়সওয়ারের কোমর সমান উঁচু প্রাচীর গড়েছেন উপকূল নগরীর চারপাশে। বন্দর অঞ্চল ঘিঞ্জি হলেও নগরীকে একটু ভিতর দিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে চওড়া রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছেন। মালাবারসহ আশেপাশের বেশ কয়েকটা বন্দরে নিয়ম আছে যে, কোনও জাহাজ যদি মিষ্টি জল সংগ্রহের জন্য বন্দরে ভেড়ে তবে তাকে শুল্ক দিতে হবে। অথবা কোনও জাহাজ, যার গন্তব্য ছিল অন্য কোনও জায়গা, সে যদি সামুদ্রিক ঝঞ্ঝা বা অন্য কোনও বিপদের সম্মুখীন হয়ে বন্দরে ভেড়ে, অথবা উপকূল অঞ্চলে ভেঙে পড়ে বা সমুদ্র-যাত্রার অনুপযুক্ত হয় তবে সেই পণ্য-জাহাজগুলোর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারেন সেখানকার শাসক। কিন্তু সম্রাট সামোরিন এসব শুল্ক বা বাজেয়াপ্তকরণের নীতি তুলে দিয়েছেন কালিকট থেকে, কড়া হাতে দমন করেছেন জলদস্যুদের। উপকূল অঞ্চলে কোনও নৌকো বা জাহাজের বিরুদ্ধে

BanglaBook.org

জলদস্যুতার অভিযোগ প্রমাণিত হলেই ততক্ষণাৎ তাদের শূলে চড়ানো হয়। একই নিয়ম প্রযোজ্য বন্দর অঞ্চলে চুরি-ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রেও। অপরাধী হিন্দু নায়ার, ইসলাম আরব, কনফুসিয়াস চীনা, পাহাড়ি বৌদ্ধ বা শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী, যে জাত-ধর্ম বা বর্ণের মানুষই হোক না কেন চুরি বা লুণ্ঠনের সাজা হল মৃত্যুদণ্ড। শুল্ক মকুব বা এ-ধরনের নিরাপত্তা দেশী-বিদেশি বণিকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছে এ বন্দরকে। আর কালিকটের ব্যবসায়ীদের উদ্যমের কথা তো বলাই বাহুল্য। প্রচলিত একটা কথাই আছে যে 'কালিকটের ব্যবসায়ীরা এমন কোনও দিন নেই যেদিন ব্যবসা করে না।' বন্দর অঞ্চলে গুদামজাত মশলা-কাপড়-শুকনো ফলের ব্যবসা তো আছেই, আছে মরুভূমি নানা জিনিসপত্রের ব্যবসা। এমনকী সেসব ব্যবসা যেদিন থাকে না সেদিন তারা বাড়ির সামনে বা রাজপথের পাশে শামিয়ানা টাঙিয়ে বসে যায় পান বিক্রি করতে। হতদরিদ্র ভিক্ষুক বা মাল্লা থেকে শুরু করে সম্রাট সমোরিন, পানের খিলিতে সুপারিকুচি ভরে খাবার অভ্যাস এ নগরীর প্রত্যেক মানুষের। স্বয়ম্ভুনাথও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। অবসরে পান বিক্রি করা ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাদের বৈভব বলতে গেলে সম্রাট সমোরিনের কাছাকাছি। কিন্তু তাঁদের শামিয়ানার নীচে বসে পান বিক্রি করতে আত্মসম্মানে বাধে না। কারণ তাঁদের কাছে সবচেয়ে সম্মানের কাজ হল ব্যবসা। তা সে সামান্য পান বিক্রিই হোক অথবা স্বয়ম্ভুনাথের মতো রূপাজীবীদের ব্যবসায়ী হোন না কেন। যে কারণে স্বয়ম্ভুনাথও সম্মানের আসনে আসীন। অন্য বড় ব্যবসায়ীদের মতো তাঁকেও যথেষ্ট সম্মান দেন সম্রাট সমোরিন। কারণ স্বয়ম্ভুনাথ একজন বড় ব্যবসায়ী। রাজা সমোরিন জানেন যে অন্য সব বন্দরকে পিছনে ফেলে কালিকট নগর-বন্দরের উৎকর্ষতার ভিত্তি হল ব্যবসায়ীরা। যদিও হিন্দু ব্যবসায়ীর সংখ্যা নগণ্য। স্বয়ম্ভুনাথের মতো দু-চারজন বড় ব্যবসায়ী হিন্দু হলেও অধিকাংশ বড় ব্যবসায়ী হলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরব জনগোষ্ঠীর লোক। তাঁরাই কালিকট বন্দরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল কারণ, যেজন্য ওই পর্তুগিজ অ্যাডমিরাল ভাস্কো যখন প্রথমবার কালিকটে এসে এ-বন্দরে ঘাঁটি গাড়ার চেষ্টা করেছিলেন তখন আরবদের আপত্তিতেই তাঁকে কালিকট ছাড়ার নির্দেশ দেন সম্রাট সামোরিন। অবশ্য ভাস্কো আর তাঁর লোকজন সামোরিনের কাছে নিজেদের বণিক-ধর্মপ্রচারকের পাশাপাশি মাঝদরিয়ার জলদস্যু বলেও প্রচার করেছিল কালিকটবাসী নাবিকদের ভয় দেখাবার জন্য।

BanglaBook.org

সেটাও অবশ্য কালিকট থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়নের আর একটা বড় কারণ জলদস্যুদের কোনও স্থান নেই কালিকটে। তবে গতবার আরব বণিকদের বিরোধিতার ব্যাপারটা সম্যক জানা আছে পর্তুগিজ ভাস্কোর। তাই তার জাতক্রোধ আছে আরবদের প্রতি। স্বয়ম্ভুনাথ যদি হিন্দু না হয়ে আরব হতেন তবে তার মৃচ্ছকটিককে মাঝসমুদ্রে ডুবিয়ে দিতেন ভাস্কো। স্বয়ম্ভুনাথের গণিকাপোতের সঙ্গে ভাস্কোর রণতরীর প্রথম সাক্ষাতের পর যে কারণে পর্তুগিজরা প্রথমেই জানতে চেয়েছিল যে এই বেশ্যাপোতের মালিক আরব নাকি হিন্দু?

বন্দর বা নগরীর বেশ্যাপতিদের বেশ খাতির করেন সামোরিন বা নগরবাসীরা। তার কারণ শুধু এই নয় যে এসব গণিকালয়গুলো নাগরিকদের মনোরঞ্জন ঘটায়, নাবিকদের তৃপ্তিদান করে সেজন্য। নগরীতে গণিকাপল্লী থাকলে নগরীর সম্ভ্রান্ত অথবা গৃহস্থনারীরা পুরুষের কাম-লালসার শিকার হয় না বলেই সম্রাট সামোরিন ও নগরবাসীর ধারণা। বহুদেশের বহু জাতের মানুষ আছে এই বন্দরনগরী কালিকটে। দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রযাত্রার কারণে তাদের অনেকেই নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু তারাও তো রক্তমাংসের মানুষ। যৌনতা তো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের দেহের তৃষ্ণা মেটায় সমুদ্রসংলগ্ন কালিকট নগরীর বন্দরসুন্দরীরা।

শুধু নারীরাই নয়, ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের কিছু মানুষেরা উপযুক্ত প্রণামী পেলে নারীদেরও কামতৃষ্ণা মেটায়। তবে সে নারীকে হতে হবে তাঁর সমগোত্রীয়। সম্রাটের আসনে যিনি অধিষ্ঠিত হন তিনি পুরুষ হলেও মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত কালিকটে। নারীরা সম্পত্তির মালিক হন। তিনিই নির্ধারণ করেন পারিবারিক সম্পত্তির হস্তান্তর কার কাছে কীভাবে হবে। একজন নারী আইনসম্মতভাবেই তিনজন পুরুষের সঙ্গে সহবাস করতে পারে এবং তা করে থাকে। তবে এক দ্বিপ্রহর থেকে দ্বিতীয় দ্বিপ্রহরের মধ্যে দ্বিতীয় কোনও পুরুষের সঙ্গে মিলন নিষিদ্ধ। পুরুষের মতো নারীও বহুগামিনী। কালিকটের জনসাধারণের যে ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে তা ইউরোপের কোথাও নেই। বর্ধিষ্ণু এই জনপদের লোকজন বেশ শৌখিনও বটে। সাধ্যমতো সোনারুপোর অলঙ্কার, সিন্ধু ছেঁচে আনা পারসিক মুক্তো ধারণ করে তারা। ফুল তাঁদের বিশেষ প্রিয়। গোলাপ আর হাস্নুহানা ফুলের বহু বাগিচা আছে এখানে। সূর্য ডোবার পর যখন সমুদ্র থেকে ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসে নগরীর ভিতর, তখন ফুলের সুবাসে ভরে

BanglaBook.org

ওঠে চারপাশ। চাঁদের আলো রাতের বেলা মায়া ছড়ায় এ-নগরীর ওপর, আবার দিনের আলোতে উদ্ভাসিত হয় কর্মচঞ্চল ব্যস্ত কালিকট নগরী। মন্দিরের মাথার ওপর বসানো স্বর্ণ-কলসগুলো দ্যুতি ছড়ায় সূর্যালোকে। এ-নগরীতেই জন্মেছেন স্বয়ম্ভুনাথ। শৈশব-কৈশোর-যৌবন-মধ্যবয়স অতিক্রম করে তিনি এখন বার্ধক্যের সীমানায় উপনীত। এই নগরীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বয়ম্ভুনাথের জীবন। কালিকট বন্দর চোখে পড়তেই উদ্বেল হয়ে উঠল স্বয়ম্ভুনাথের মন। কতদিন পর তিনি আবার ফিরে এলেন তাঁর প্রিয় নগরীতে।

পাড় থেকে কিছুটা তফাতে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ময়ূরপঙ্খি। জলের নাব্যতা কম। তাই আর এগোনো যাবে না। কিন্তু বন্দরে পৌঁছোবার পর চারপাশের পরিবেশ কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল স্বয়ম্ভুনাথের। কোনও জাহাজকে তীরের দিকে আসতে দেখলেই লোকজন পাড়ের কাছে ভিড় করে দাঁড়ায়, জাহাজ কী নিয়ে এসেছে তা দেখার জন্য। ছোট ছোট শালতিগুলো পিলপিল করে ছুটে এসে ঘিরে ফেলে জাহাজকে, পণ্য অথবা যাত্রী পরিবহনের জন্য। হতে পারে মৃচ্ছকটিক পণ্যবাহী জাহাজ নয়, তবুও সমুদ্রজীবন কাটিয়ে সে যতবার ঘরে ফিরেছে ততবার তাকেই ঘিরে ধরেছে কিছু মানুষ। পতিতাদের দালাল, জাহাজকে কাদামাটির ওপর দিয়ে যে প্রশিক্ষিত হাতিরা পাড়ে টেনে তোলে তার মালিকরা, জাহাজ যে উদ্বৃত খাবার-রসদ নিয়ে ফিরেছে তা কম দামে কিনে নেবার লোকেরা এবং অবশ্যই শুল্ক দপ্তরের লোকজন। কিন্তু আজ তাদের কারোরই দেখা মিলল না। মৃচ্ছকটিককে স্বাগত জানাবার জন্য কেউ ভিড় জমাল না তার গায়ে। বন্দরে খুব সামান্য কয়েকজন লোক চোখে পড়ছে। স্বয়ম্ভুনাথের ময়ূরপঙ্খি যেখানে এসে থেমেছে তার কাছাকাছি আরও কয়েকটা জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকলেও তা জনশূন্য বলেই মনে হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করার পরও যখন তাঁকে আপ্যায়নের জন্য কেউ এগিয়ে এলনা তখন জাহাজ থেকে দুটো নৌকো নামালেন স্বয়ম্ভুনাথ। গণিকা আর ক্রিতদাসীদের ময়ূরপঙ্খিতে নাখোদা বা ক্যাপ্টেনের তত্ত্বাবধানে রেখে কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে সে-দুটো নৌকাতে চেপে বসলেন তিনি।

চড়ায় এসে আটকে গেল নৌকো। সামনের বেশ কিছুটা জমি নোংরা কাদামাটি ভরা। জোয়ারের সময় জলে ঢেকে যায় জায়গাটা। মাটির ওপর লাল কাঁকড়ার গর্ত। সিগাল আর লম্বা হাড়গিলে পাখির দল ঘুরে বেড়াচ্ছে খাদ্য অন্বেষণে। জাহাজের নানা আবর্জনাও জমা হয় সেখানে। নৌকা থেকে

BanglaBook.org

নেমে সেই নোংরা-কর্দমাক্ত-পূতিগন্ধময় জায়গাটা অতিক্রম করে স্বয়ম্ভুনাথ উঠে দাঁড়ালেন শক্তমাটিতে।

অঞ্চলটা অত্যন্ত ঘিঞ্জি। চারপাশে ছোট-বড় ঘর-বাড়ি। নীচু-শ্রেণির মাল্লা-মাঝি-জাহাজ মেরামতকারী, পণ্য ব্যবসায়ী, ফড়ে, দালালদের বাসস্থান। আছে অসংখ্য শুঁড়িখানা আর ছোট বড় বেশ্যালয়। আর তারই মাঝে দাঁড়িয়ে আছে পন্য মজুতের জন্য ইটের তৈরি বিরাট বিরাট গুদামঘর। এইসব গুদামঘরে সারাবছর সুতি আর রেশমের কাপড়ের গাঁটরি উপচে থাকে। এছাড়াও থাকে মন মন এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ, দারুচিনিসহ নানা ধরনের মশলা, চন্দনকাঠ থেকে শুরু করে হাতির দাঁতও। এছাড়া নারকেল আর ছোবড়ার স্তূপ তো আছেই। কত বিচিত্র ধরনের মানুষ যে বন্দর অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে পেটের জন্য তার হিসেব নেই। হিসেব নেই কত জাতের মানুষ এখানে আছে! হিন্দু, নায়ার, আরব তুর্কি, পারসিক, সিরীয়, চৈনিক থেকে শুরু করে আফ্রিকান কাফ্রিরাও। এখানে যেমন দেখা মেলে সবুজ পাগড়ি-পরা হজযাত্রীদের আর তেমনই দেখা মেলে সাদা ধুতি-পৈতেধারী, কপালে বাহুতে চন্দনলেপা, ব্রাহ্মণদের। যাঁরা সমুদ্রে জাহাজ ভাসার আগে তার মঙ্গলকামনায় পূজা-অর্চনার কাজ করে, গণৎকারের কাজ করে। আর অবশ্যম্ভাবী রূপে আছে অগণিত মাতাল-জুয়াড়ি-বেশ্যারা। যে-কোনও বন্দরেই যাদের দেখা মেলে।

বন্দরের বাইরের অংশে কোনও মানুষজন না থাকলেও ঘিঞ্জি অঞ্চলটার ভিতরে ঢুকতেই লোকজনের ভিড় দেখতে পেলেন স্বয়ম্ভুনাথ। স্থানে স্থানে উত্তেজিতভাবে জটলা করছে তারা। তিনি তাঁর ডেরার পথ ধরতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকে দেখতে পেয়ে পরিচিত এক ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। মৃচ্ছকটিক সমুদ্রে যাত্রা করার আগে এ-ব্রাহ্মণই পূজা-অর্চনা করেছিলেন। স্বয়ম্ভুনাথ ভেবেছিলেন যে ব্রাহ্মণ হয়তো জানতে চাইবেন তাঁর জাহাজ কোনও ম্লেচ্ছদেশে গেছিল কিনা? যদি গিয়ে থাকে তবে নগদ অর্থের বিনিময়ে তার জন্য প্রায়শ্চিত্য করবেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ সেসব প্রশ্ন করলেন না। তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন, 'কবে ফিরলেন? খবর শুনেছেন কিছু?'

স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'আজই ফিরলাম। এখনই। কী খবর?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'বছরখানেক আগে যে পর্তুগিজ বণিকটাকে রাজা তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সে আবার ফিরে এসেছে। এবার আর বণিকের বেশে নয়, সে এসেছে এখানকার বাণিজ্যের দখল নিতে। অ্যাডমিরাল ভাস্কো নামের লোকটা

BanglaBook.org

অনেক যুদ্ধ জাহাজ সঙ্গে এনেছে। হজযাত্রীদের মক্কা ফেরত একটা জাহাজকে সে মাঝসমুদ্রে পুড়িয়ে দিয়েছে। তারপর কন্নোনর হয়ে উপস্থিত হয়েছে এখানে। বন্দরের উত্তরে মাইল তিনেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে সেই নৌবহর অবস্থান করছে। রাজা সামোরিনকে তারা বার্তা পাঠিয়েছে যে অবিলম্বে সব আরব ব্যবসায়ীদের তাড়িয়ে দিতে হবে। এবং তাদের হাতে কালিকট বন্দরের নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে হবে! নইলে নাকি তারা নিজেরাই বন্দরের দখল নেবে!'

ভাস্কো যেদিন হজযাত্রীদের জাহাজটা ধ্বংস করেছিলেন তার তিনদিনের মাথায় সেই বাচ্চা মেয়েটাকে উদ্ধার করেছিলেন স্বয়ম্ভুনাথ। তারপর ঝঞ্ঝার কবলে পড়ে যাত্রাপথ পরিবর্তন হওয়ায় মৃচ্ছকটিকের বন্দরে ফিরতে সময় লেগেছে আরও চারদিন। অর্থাৎ হজযাত্রীদের জাহাজে আগুন লাগার পর একটা সপ্তাহ কেটে গেছে। তার মধ্যে ভাস্কো কন্নোনরে পৌঁছে সেখানকার রাজার থেকে সামোরিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করে তিনদিন আগে কালিকট বন্দরের কাছে ঘাঁটি গেড়েছেন। এ-ব্যাপারগুলো জানা ছিল না স্বয়ম্ভুনাথের! অবশ্য জানা থাকার কথাও নয়। ভাস্কোর সঙ্গে স্বয়ম্ভুনাথের দেখা হয়েছিল মাস খানেক আগে মাঝসমুদ্রে। তাঁর সঙ্গে সেই সাক্ষাতের কথা ব্রাহ্মণকে জানানো সমীচীন মনে করলেন না স্বয়ম্ভুনাথ। ব্যাপারটা চেপে গিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, 'তারপর?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'রাজা অ্যাডমিরালের প্রস্তাবে রাজি নন। হওয়া সম্ভবও নয়। যুগ যুগ ধরে আরব ব্যবসায়ীরা এখানে আছে। কালিকটের সমৃদ্ধির মূলে তো ওরাই। কিন্তু পর্তুগিজ অ্যাডমিরালও তাঁর প্রস্তাবে অনড়। দফায় দফায় আলোচনা চলছে। রাজা সামোরিন আজ দুই সঙ্গী সহ এক ব্রাহ্মণকে পর্তুগিজদের জাহাজে পাঠিয়েছেন আলোচনার জন্য। রাজা তাঁদের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছেন যে, পর্তুগিজদের দাবি তাঁর পক্ষে মানা সম্ভব নয়। তাঁদের অন্য কোনও দাবি বা প্রস্তাব থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু দু-পক্ষই যদি নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে তবে মনে হয় যুদ্ধ বাধবে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বন্দর ছেড়ে সবাই শহরের ভিতরে চলে যাচ্ছে। মালপত্রর গুদামও খালি করে ফেলা হবে। সবাই এখন অপেক্ষা করছে যে তিনজন লোককে পর্তুগিজদের কাছে পাঠানো হয়েছে তারা ফিরে এসে কী সংবাদ দেয় তার জন্য। তবে পরিস্থিতি খুব একটা সুবিধার নয় বলেই মনে হচ্ছে!' কথাগুলো বলে এরপর আর দাঁড়াল না ব্রাহ্মণ। নতুন কোনও খবরের

BanglaBook.org

প্রত্যাশায় একটা ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধা হল না স্বয়ম্ভুনাথের। তিনি তো নিজের চোখেই দেখেছেন ভাস্কোর নৌবহরকে। সার সার কামান বসানো আছে তার ডেকে। ওসব কামানসম্মিলিত জাহাজ নিয়ে কেউ বাণিজ্য করতে বেরোয় না, যুদ্ধ করতে বেরোয়। তাছাড়া ভাস্কোর কালিকটে দুর্গ তৈরির কথাটা এক গণিকার মাধ্যমে শুনেছেন তিনি। রাজা সামোরিন হিন্দু। স্বয়ম্ভুনাথও হিন্দু বলে রাজার আস্থাভাজন। রাজা বেশ কয়েকবার কুমারী কন্যা কিনেছেন স্বয়ম্ভুনাথের কাছ থেকে। যতই ভাস্কোর কাছ থেকে তিনি জেপাং নারী সরবরাহের বরাত পান, রাজা সামোরিনের পাশেই দাঁড়াতে হবে তাঁকে। স্বয়ম্ভুনাথ তাঁর পার্শ্বচরদের বললেন, 'দ্রুত নৌকার ব্যবস্থা করে গণিকাদের-ক্রীতদাসীদের আমার গনিকালয়ে নিয়ে এসো। আর নাবিকদেরও বন্দরে উঠে আসতে বলো। নাখোদাও যেন জাহাজ ত্যাগ করেন।'

একথা বলার পর স্বয়ম্ভুনাথের হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই ছোট্ট মেয়েটার কথা। ডুবোপাহাড়ের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফেরার পর কেন জানি স্বয়ম্ভুনাথের মনেও ধারণা জন্মেছে যে-ওই বালিকা দেবপ্রেরিত। তার জন্যই রক্ষা পেয়েছে সবাই। স্বয়ম্ভুনাথের কথা শুনে তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য এগোচ্ছিল অনুচরেরা, কিন্তু তারা যাবার আগে তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন 'শুধু ওই বাচ্চা মেয়েটা তার সঙ্গিনী বাঁদরীটা আর গণিকা ভর্তিকাকে আমার গৃহে আনবে। ওরা ওখানেই থাকবে।'

তাঁর লোকজন চলে গেল ময়ূরপঙ্খি খালি করার ব্যবস্থা করার জন্য আর স্বয়ম্ভুনাথ এগোলেন তাঁর বাড়িতে ফেরার জন্য। বন্দর থেকে একটু এগোলেই তার বিশাল গণিকালয়। অনেক কক্ষসম্মিলিত বিশাল বাড়িটা। রাস্তার ধারে সার সার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে খদ্দের-প্রত্যাশী গণিকারা। সরু গলিটাতে সবসময় জাহাজিদের ভিড় লেগে থাকে। কিন্তু আজ সেখানে খদ্দেরের ভিড় নেই। গণিকারাই শুধু দাঁড়িয়ে আছে। প্রভুকে দেখতে পেয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল তারা।

স্বয়ম্ভুনাথ একবার শুধু তাকালেন বাড়িটার দিকে। কিন্তু সেখানে থামলেন না। সর্পিল পথটা এগিয়ে গিয়ে মিশেছে পাকা সড়কের সঙ্গে। সে-সড়ক আরও এগিয়ে প্রধান সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে থেমেছে রাজা সামোরিনের প্রাসাদের সামনে। পাকা সড়কের দু-পাশ থেকে শুরু হয়েছে ধনী ব্যবসায়ীদের

BanglaBook.org

বাসস্থান। স্বয়ম্ভুনাথের বাসস্থানও সেখানেই। নারকেলগাছঘেরা অনেকটা জমি নিয়ে তার বাড়ি। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার শেষে অবশেষে এক দুর্যোগপূর্ণ দিনে ঘরে ফিরলেন স্বয়ম্ভুনাথ।

ওদিকে তাঁর অনুচরেরা ময়ূরপঙ্খি থেকে নামিয়ে আনল সবাইকে। নামল সেই বাচ্চা মেয়েটাও। এই কালিকট বন্দর থেকেই আব্বুর কোলে চেপে একদিন জাহাজে উঠেছিল সে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল সে-দিনটা কী সুন্দর ছিল। অনেক লোকের ভিড় ছিল চারপাশে। বহু মানুষ যাত্রীদের বিদায় দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল বন্দরে। সবুজ পতাকায় সাজানো হয়েছিল সারা বন্দর। জরিদার ঝলমলে নিশানও উড়ছিল চারদিকে। লোকজনের ব্যস্ততা, চিৎকার-চেঁচামেচিতে মুখরিত ছিল বন্দর।

সেদিনের সেই বন্দরের সঙ্গে আজকের এ-বন্দরের কোনও মিল নেই। চারপাশে সব ফাঁকা হয়ে গেছে। অশুভ কোনও ঘটনার আশঙ্কায় নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে আছে কালিকট বন্দর। অবশ্য বন্দরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও হয়তো তাকে চিনতে পারত না মেয়েটা। তার চোখে শুধু জেগে আছে সেই দৃশ্য—অকূল দরিয়ায় খাঁচাবন্দি অবস্থায় সে ভেসে চলেছে। ঢেউয়ের তালে সে উঠছে-নামছে-ডুবছে-ভাসছে! চারপাশে শুধু জল আর জল, দিকচিহ্নহীন অসীম জলরাশি! প্রভু স্বয়ম্ভুনাথের নির্দেশ মোতাবেক বাচ্চা মেয়েটাকে তার বাঁদরী আর গণিকা ভর্তিকার সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া হল স্বয়ম্ভুনাথের বাসস্থানে। ভর্তিকার তত্ত্বাবধানে সেগৃহেই থাকার ব্যবস্থা করা হল মৎস্যগন্ধা ও তার পোষ্যের।

দীর্ঘদিন পর ঘরে ফিরেছেন মালিক। স্বাভাবিকভাবেই নিজ গৃহে বেশ কিছু কার্য সম্পাদন করতে হল তাঁকে। অনেক দিন পর সমুদ্রের নোনা জলের পরিবর্তে কূপের মিষ্টি জলে স্নান করে বেশ আরামবোধ করলেন তিনি। সমুদ্রের নোনা বাতাস দেহের চামড়াকে রুক্ষ করে তোলে, ফাটিয়ে দেয়। তার ওপর নোনা জলে স্নান করলে যে জ্বলুনি হয় তার থেকে মুক্তি পেলেন তিনি। তারপর খাওয়া সেরে পালঙ্কে শুয়ে পড়লেন। পর্তুগিজদের ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা জেগেছে ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার ক্লান্তিতে ঘুম নেমে এল তাঁর চোখে।

স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন স্বয়ম্ভুনাথ। তার ময়ূরপঙ্খি নাও নিয়ে অকূলপাথারে ভাসছেন তিনি। ধীরে ধীরে মেঘ জমতে শুরু করল। এক সময় তা ঘন-গাঢ়

BanglaBook.org

হয়ে সূর্যকে ঢেকে দিল। কালো হয়ে উঠল সমুদ্রের জলও। দিনেরবেলাই যেন রাতের অন্ধকার নেমে এল সমুদ্রের বুকে! তারপর শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। আর বাতাস। সমুদ্রর জলও এরপর ফুঁসে উঠতে লাগল। সমুদ্রের ঢেউগুলো পাতাল থেকে উঠে আসা লক্ষ ফণাঅলা নাগিনীর মতো ছোবল মারতে শুরু করল জাহাজের গায়ে। ডেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বয়ম্ভুনাথ। একসময় তিনি বুঝতে পারলেন, জাহাজের ওপর আর কারও নিয়ন্ত্রণ নেই, উল্কার গতিতে অজানার উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে তাঁর প্রমোদতরী। মাল্লারা সব চারপাশে ছোটাছুটি, চিৎকার শুরু করেছে, নারীদের আতঙ্কিত ক্রন্দনধ্বনি শুরু হয়েছে খোলের ভিতরে। প্রধান মাস্তুলটা এমনভাবে কাঁপছে যে এখনই হয়তো সেটা মড়মড় করে ভেঙে পড়বে! হঠাৎ দিগ্‌দর্শী চিৎকার করে উঠল 'ডুবো পাহাড়! ডুবো পাহাড়!' এ কথায় মুহূর্তের মধ্যে আরও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। নাবিকরা পাগলের মতো কেউ কেউ আর্তনাদ করে উঠল। স্বয়ম্ভুনাথ, দিগদর্শীর চিৎকার শুনে সামনে তাকিয়ে দেখতে পেলেন অন্ধকার জলতলের ভিতর থেকে জেগে-ওঠা সেই পাহাড়টাকে। সমুদ্রের জল ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে তার চারপাশে। আর সেদিকেই বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলেছে ময়ূরপঙ্খি। স্বয়ম্ভুনাথ চিৎকার করে উঠলেন, 'বামে হাল মারো! হাল মারো!'—কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল সমুদ্রগর্জনে। ডুবো পাহাড়ের ঘূর্নির মধ্যে এসে পড়ল জাহাজটা। আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র, আর তার পরই ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে ময়ূরপঙ্খি। জাহাজের সমস্ত মানুষ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একযোগে চিৎকার করে উঠল! চিৎকার করে উঠলেন স্বয়ম্ভুনাথও। আর বুঝি শেষ রক্ষা হল না! আর মাত্র কয়েক কাছি ব্যবধান ডুবোপাহাড়ের সঙ্গে জাহাজটার...

ঠিক এ-পর্যন্ত স্বপ্নটা দেখে ঘুম ভেঙে গেল স্বয়ম্ভুনাথের। বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। তাঁর কানে তখনও বেজে চলেছে নাবিকদের চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ! স্বয়ম্ভুনাথের ধাতস্থ হতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। তারপর তিনি বুঝতে পারলেন তিনি স্বপ্নই দেখছিলেন। কিন্তু উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে বাইরের রাস্তার দিক থেকে সত্যিই যেন একটা শোরগোলের শব্দ ভেসে আসছে! একজন ভৃত্য স্বয়ম্ভুনাথের কক্ষে প্রবেশ করেছে। স্বপ্নের মধ্যে জাহাজ ডুবোপাহাড়ে আছড়ে পড়তে দেখে স্বয়ম্ভুনাথ আতঙ্কে যে চিৎকার করে উঠেছিলেন ঘুমের ঘোরে, তা কানে যাওয়াতেই লোকটা কক্ষে প্রবেশ করেছে। স্বয়ম্ভুনাথ জানতে

BanglaBook.org

চাইলেন 'বাইরে ও কীসের শব্দ?'

ভৃত্য বলল, 'মালিক, বন্দরে মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে! ওদিক থেকে সব লোকজন নগরীর ভিতরে প্রবেশ করছে।'

কথাটা শোনামাত্রই শয্যাত্যাগ করলেন স্বয়ম্ভুনাথ। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ঘোড়ায় চেপে রাজপথে এসে দাঁড়ালেন। সত্যিই বন্দরের দিক থেকে দলে দলে মানুষ নগরীর অভ্যন্তরে এগোচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। আরব, আফ্রিকান, পারসিক, চৈনিক, নানা ধরনের, নানা জাতের মানুষ পালাচ্ছে শহরের দিকে। স্বয়ম্ভুনাথ একজনকে জিগ্যেস করল, 'ব্যাপারটা কী ঘটেছে?'

সে জবাব দিল, 'শুনেছেন নিশ্চই যে রাজা সামোরিন, পর্তুগিজদের সঙ্গে আলোচনার জন্য পুত্রসহ এক ব্রাহ্মণকে ও অপর এক ব্যক্তিকে তাদের জাহাজে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পর্তুগিজ দস্যুরা সামোরিনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ব্রাহ্মণকে তারা মুক্তি দিয়েছে রাজার কাছে এ-সংবাদ প্রেরণের জন্য যে, আগামীকাল সূর্যাস্তের মধ্যে পর্তুগিজদের দাবি না মানলে তারা কালিকট ধ্বংস করবে। ব্রাহ্মণকে তারা মুক্তি দিলেও রাজপুত্র ও অপর সঙ্গীকে হত্যা করেছে তারা। শুধু তাই নয়, একদল ধীবর সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছিল, তাদেরও পর্তুগিজরা হত্যা করেছে। সামোরিন কী সিদ্ধান্ত নেবেন তা কারও জানা নেই, পর্তুগিজরাও হয়তো আজই আক্রমণ করে বসল বন্দর! কিছুই বিশ্বাস নেই ওদেরকে। ওদের জাহাজগুলো পাক খেতে শুরু করেছে বন্দরে। তাই সবাই বন্দর ছেড়ে পালাচ্ছে।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ম্ভুনাথ ব্যাপারটা চাক্ষুস করার জন্য অশ্বপৃষ্ঠে এগোলেন বন্দরের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে জায়গায় পৌঁছে গেলেন তিনি। এখন বিকেল। সবাই পালিয়েছে। জনশূন্য হয়ে গেছে বন্দর। একটা গুদাম ঘরের আড়াল থেকে তিনি তাকালেন সমুদ্রের দিকে। দেখতে পেলেন পর্তুগিজ জাহাজগুলোকে। পর্তুগিজ নৌবহরের মাঝারি আকৃতির ও জাহাজগুলোকে আগে তিনি দেখেছেন। হাঙরের ঝাঁক যেমন শিকারের সন্ধানে উপকূলে পাক খায়, তেমনই ঝাঁক বেঁধে উপকূলের গা ঘেষে পাক খাচ্ছে রণতরীগুলো। তাদের পালগুলোকে সত্যিই সমুদ্রের ওপর জেগে থাকা হাঙরের পাখনার মতো দেখাচ্ছে। জাহাজের ডেকে বসানো কামানগুলোর মুখ সব বন্দরের দিকে ফেরানো। ভালো করে সেই রণপোতগুলোর দিকে তাকাবার

BanglaBook.org

পর তীর ঘেঁষে জাহাজগুলো কেন ঘুরছে তা বুঝতে পারলেন স্বয়ম্ভুনাথ। পর্তুগিজ জাহাজগুলোর প্রত্যেকটার মাস্তুলগুলোর গায়ের আড়কাঠ থেকে ঝুলছে মানুষের লাশ! সম্ভবত ওগুলো সেই ধীবরদের দেহই হবে। বন্দর নগরীর মানুষদের ব্যাপারটা দেখাবার জন্যই, পর্তুগিজদের বিরুদ্ধাচরণ করলে কী ফল হবে তা বোঝাবার জন্যই লাশগুলো ঝুলিয়ে কূলের গা ঘেঁষে পাক খাচ্ছে পর্তুগিজ নৌবহর। কালিকটের বুকে যে চরম দুর্যোগ ঘনিয়ে আসতে চলেছে তা এবার আর অনুমান করতে অসুবিধা হল না স্বয়ম্ভুনাথের। পরিত্যক্ত বন্দরে নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ম্ভুনাথের সাধের ময়ূরপঙ্খি নাও। আর তার গা ঘেঁষে হাঙরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে রণপোতগুলো। পর্তুগিজরা তার জাহাজটাকে চেনে। হয়তো তাই তারা চট করে ডুবিয়ে দেবে না ময়ূরপঙ্খিকে। কিন্তু স্বয়ম্ভুনাথ মনে মনে ভেবে নিলেন তার নারীদের নিয়ে পরদিন চলে যাবেন বন্দর অঞ্চল ছেড়ে নগরীর ভিতর দিকে।

বন্দর থেকে নিজের বাসস্থানে ফিরে এলেন স্বয়ম্ভুনাথ। তাঁর অনুচরদের ডেকে পাঠিয়ে আলোচনায় বসলেন পরদিন সকালে তাঁর গণিকালয়ের নারীদের শহরের অভ্যন্তরে কোথায়, কীভাবে স্থানান্তরিত করা হবে, সে ব্যাপারটা নিয়ে। অন্ধকার নামল কালিকট বন্দরের বুকে। অন্য দিনের মতো এদিন আর বন্দরে আকাশপ্রদীপ জ্বালালো না কেউ। সার সার সুউচ্চ দন্ডের মাথায় যে আলোগুলো দেখে জাহাজ, নৌকোগুলো বন্দরের অবস্থান বোঝে। নিকষকালো অন্ধকারে নিমজ্জিত হল বন্দর। অন্ধকার নামল সমুদ্রতেও। তবে কেউ কেউ দেখতে পেল, অন্ধকারে সমুদ্রের কূল ঘেঁষে শ্বাপদের চোখের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে পর্তুগিজ রণতরীর মশালের আলো।

অনুচরদের সঙ্গে আশু কর্তব্য নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলেন স্বয়ম্ভুনাথ। পরদিন নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে একসময় চলে গেল তারা।

লোকগুলো চলে যাবার পর সামান্য কিছু আহার গ্রহণ করে বিছানায় শুতে যাচ্ছিলেন স্বয়ম্ভুনাথ। পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে করতে হবে বনিতাদের স্থানান্তরকরণের কাজে। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে সে-কাজ সম্পন্ন করে নিজেও এ গৃহের লোকজনকে নিয়ে চলে যাবেন নগরীর অভ্যন্তরে। এ বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ঘরের কুলুঙ্গিতে জ্বলতে থাকা বড় প্রদীপটা নিভিয়ে ফেলতে যাচ্ছিলেন তিনি। ঠিক সেইসময় বাইরে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে স্বয়ম্ভুনাথের কানে এল অশ্বখুরের শব্দ। সে-শব্দ এসে থামল

BanglaBook.org

বাড়ির সদর দরজার সামনে।

এত রাতে কে এল? কোন জরুরি প্রয়োজনে তাঁর অনুচররা আবার ফিরে এলো নাকি?

না, তারা নয়, এক ভৃত্য এসে খবর দিল, 'সম্রাট সামোরিনের দরবার থেকে তাঁর এক পার্শ্বচর আর কয়েকজন সৈনিক এসেছে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য।'

খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কক্ষ থেকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন স্বয়ম্ভুনাথ। ফ্যাকাসে চাঁদের আলোতে তার সামনে অশ্বপৃষ্ঠে সম্রাটের এক ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর কোটকেশ্বর ও একদল অশ্বারোহী সৈনিক। সামোরিনের এই পার্শ্বচরের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে স্বয়ম্ভুনাথের। যুবা বয়সে এই কোটকেশ্বর তার বেশ্যালয়ের গ্রাহক ছিলেন। তাকে দেখতে পেয়ে স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'আসুন, ভিতরে এসে আসন গ্রহণ করুন।'

কোটকেশ্বর বেশ উদ্বিগ্নভাবে বললেন, 'না, আজ আর সেই সময় নেই বণিক। কাল সকালে সম্রাট তাঁর প্রাসাদে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ খবরটাই জানাতে এলাম।'

সম্রাটের ইচ্ছা মানে তো আদেশ। কাজেই স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'আমি সম্রাটের আজ্ঞাবাহী দাস। তাঁর নির্দেশমতো যথাসময়ে তাঁর প্রাসাদে উপস্থিত হব।'

কোটকেশ্বর তাঁর জবাব শুনে বললেন, 'ধন্যবাদ।' তারপর স্বয়ম্ভুনাথকে আর কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দলবলসমেত চলে গেলেন।

স্বয়ম্ভুনাথ ঘরে ফিরে এসে অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগলেন, এই দুর্যোগে সম্রাট সামোরিন তাঁর মতো একজন বণিককে হঠাৎ ডেকে পাঠালেন কেন?

৫

সকাল হল। সারারাত প্রবল উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেছে স্বয়ম্ভুনাথের। অনুচরেরা সকাল হতেই উপস্থিত হল তার বাড়িতে। আগেরদিনই কর্মপন্থা ঠিক করা

BanglaBook.org

ছিল। তবুও তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় কিছু সময় ব্যয় করতে হল তাঁকে। তারপর পোশাক পরিবর্তন করে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। হঠাৎ তার চোখ পড়ল বাগিচার এক কোণে। সেখানে একটা গাছের ডাল ধরে দোল খাচ্ছে সেই শিম্পাঞ্জিটা। আর গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আছে সেই ছোট্ট মেয়েটা—মৎস্যগন্ধা। কাজের চাপে উত্তেজনায় তাদের কথা যেন ভুলতেই বসেছিলেন তিনি। গাছের নীচ থেকে স্বয়ম্ভুনাথের দিকে তাকিয়ে যেন আবছা হাসি ফুটে উঠল মৎস্যগন্ধার মুখে। স্বয়ম্ভুনাথ অনুমান করলেন, সম্ভবত মেয়েটার ভয় কাটতে চলেছে। সে কি সুস্থ হয়ে আত্মপরিচয় দিতে পারবে? অবশ্য ওসব নিয়ে স্বয়ম্ভুনাথের বিশেষ কিছু ভাবার অবকাশ নেই। তাঁর মাথায় কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজা সামোরিনের আহ্বানের কথা। স্বয়ম্ভুনাথ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। একজন পরিচারক ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিল। স্বয়ম্ভুনাথ ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়লেন। গৃহসংলগ্ন বাগিচা ত্যাগ করে তিনি রাজপথে নেমে পড়লেন সামোরিনের প্রাসাদে যাবার জন্য।

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই নগরবাসী পথে নেমে পড়েছে। কিন্তু সবার চোখে মুখেই কেমন যেন উত্তেজনার ভাব। ভোরবেলা হতেই যে ফেরিওলারা গোলাপ আর হাস্নুহানা ফুলের ডালি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে প্রতিদিনের মতো রোজগারের ধান্দায়, যাদের মুখে সবসময় হাসি লেগে থাকে, তাদের ঠোঁটেও যেন হাসি নেই। জনতা কেউ পদব্রজে, কেউ অশ্বপৃষ্ঠে, কেউ বা গো-শকট অথবা পালকিতে চেপে এগিয়ে চলেছে নগরীর অভ্যন্তরে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ম্ভুনাথও এগিয়ে চললেন চারপাশে ভালো করে তাকাতে-তাকাতে।

এই ছ'-সাত মাস স্বয়ম্ভুনাথের অনুপস্থিতকালে নগরীর তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। আগের মতোই রাস্তার পাশে রয়েছে নারকেলের পাহাড়, ছোবরার স্তূপ, রাশিকৃত বস্তাবন্দি পণ্য। মাঝে মাঝেই রয়েছে ফলের বাজার। সেখানে বিক্রি হচ্ছে আম, লেবু, শুকনো নারকেলের শাঁস। মিঠাইয়ের দোকানে বিক্রি হচ্ছে রঙবেরঙের মিঠাই। তাছাড়া সর্বত্র শামিয়ানার নীচে পান-সুপুরির দোকানতো আছেই।

চলতে-চলতে স্বয়ম্ভুনাথ এসে উপস্থিত হলেন পশু পাখির বাজারে। খাঁচাবন্দি অবস্থায় সেখানে বিক্রি হচ্ছে পায়রা, কথা বলা বড় বড় টিয়াপাখি, বানর, বেজি সহ নানারকম পশুপাখি। নাবিক ও জাহাজিদের কাছে কথা বলা

BanglaBook.org

পাখির প্রচুর চাহিদা। এখান থেকেই পাখি সংগ্রহ করে তারা। বাঁদর কিনে নিয়ে গিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অনেকে নারকেল পাড়ায়। গৃহস্থবাড়িতে বেজি পোষে অনেকেই। কালিকটে পশু পাখির বাজার থাকলেও খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া এখানে কোন ধরনের প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ। এমনকী দংশক সর্পকেও হত্যা করা যাবে না। আইনভঙ্গকারীকে সামোরিনের নায়ার সৈনিকরা হাজতে পোরে। অন্যদিন এ-জায়গা ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাঁকডাকে সরগরম থাকে, কিন্তু আজ যেন তেমন ভিড় নেই।

পশুপাখির বাজার থেকে রাস্তা বাঁক নিয়েছে কেন্দ্রের দিকে। আরও কিছুটা এগিয়েই ওষুধের বাজার। নানা ধরনের জড়িবুটি, শেকড়বাকড়, অদ্ভুত জিনিস বিক্রি হয় এখানে। যা শুধু রোগ নিরাময়ের জন্যই নয়, অন্যান্য নানা কাজে লাগে। নাবিকরা এবং যারা নিয়মিত গণিকালয়ে যায় তারাও এখানে আসা যাওয়া করে। দোকানগুলোতে রুপোর থালায় সাজানো থাকে ছোট ছোট পুরিয়াতে চুম্বকচূর্ণ আর গন্ডারের খড়্গচূর্ণ। এ দুটোই মহার্ঘ্য জিনিস। দামে এবং কাজেও। খাদ্যের সঙ্গে চুম্বকচূর্ণ মিশিয়ে ভক্ষণ করলে নাকি বৃদ্ধ মানুষেরও যৌন ক্ষমতা ফিরে আসে। এ বাজারেই একমাত্র পাওয়া যায় নেপাল থেকে আনা সর্বরোগহরা বিশল্যকরণীর শিকড়ও সোনার বিনিময়ে বিক্রি হয় তা। এসব অদ্ভুত জিনিস ছাড়াও এখানে বিক্রি হয় হরতকি-হলুদ-সর্পগন্ধা, যা ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে। রাস্তার পাশে ঝুড়িতে রাখা আছে চকচকে নিমফল। নিমতেল চর্মরোগ দূর করে, সমুদ্রর নোনা বাতাস লেগে নাবিকদের খসখসে হয়ে যাওয়া চামড়াকে আবার মসৃণ করে তোলে। স্বয়ম্ভুনাথ নিজেও নিমতেল মাখেন। আর তাঁর গণিকালয়ে এ-বাজার থেকেই নিমফল সরবরাহ করা হয়। বাজার সংলগ্ন রাজপথের ধারে রমণীরা বসে

BanglaBook.org

আছে ঘৃতকুমারী পাতার ঝাঁকা নিয়ে। শ্লেশসর্দিতে যা খুব উপকারী। এখানে কিন্তু লোকজনের ভিড় আগের মতোই মনে হল স্বয়ম্ভুনাথের। অসুখ আর যৌনতা, এ-দুটোর কোনওটাই তো আর দিনকাল বুঝে আসে না। কাজেই এখানে লোকজনের ভিড় লেগে থাকা স্বাভাবিক। পার্থক্য বলতে এখানে তিনি কয়েকজন অশ্বারোহী সৈনিককে দেখতে পেলেন।

চারপাশ দেখতে-দেখতে নগরীর মধ্যস্থলে পৌঁছে গেলেন স্বয়ম্ভুনাথ। এবার পরিবেশটা সত্যিই বেশ অন্যরকম মনে হল তাঁর। জনসাধারণের ভিড় তো আছেই কিন্তু সংখ্যায় তাদের থেকেও যেন অনেক বেশি অস্ত্রধারী সৈনিকের দল। অশ্বারোহী-সৈনিক, পদাতিক সৈনিক এমনকী হস্তিযূথে আসীন সৈনিকদেরও দেখা যাচ্ছে নানা সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘুরে বেড়াতে। সতর্ক চাহনি তাদের, চোয়াল কঠিন। যেন যুদ্ধর দামামা বাজতে চলেছে। এই সৈনিকরা অধিকাংশই নায়ার গোষ্ঠীর। দৃঢ় মজবুত শরীর তাদের। চুলগুলো মাথার ওপর ঝুটি করে বাঁধা। লোহার গহনা পরে তারা। এছাড়া সৈন্যদলে কিছু আরব যুদ্ধ ব্যবসায়ীও আছে। তারা নায়ারদের মতো কৃষ্ণকায় নয়, গাত্রবর্ণ তাদের শুভ্র। কোমরবন্ধনী থেকে তাদের দীর্ঘ তলোয়ার ঝোলে। সৈন্য ও জনতার ভিড় অতিক্রম করে স্বয়ম্ভুনাথ একসময় পৌঁছে গেলেন সম্রাট সামোরিনের প্রাসাদের সামনে। ঘোড়া থেকে নেমে সংলগ্ন আস্তাবলে ঘোড়া রেখে প্রাসাদের প্রবেশপথে উপস্থিত হলেন তিনি। প্রবেশতোরণের পাশেই খড়ের ছাউনির নীচে রয়েছে বিরাট বিরাট পিতলের জালা। জলসত্র। কাঠের বারকোশে রয়েছে নারকেলের টুকরো। প্রাসাদে প্রবেশের আগে ঠান্ডা জল ও নারকোলের টুকরো দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করা হয় সেখানে। অন্যদিনের মতো প্রাসাদের প্রবেশপথে দর্শনার্থীদের ভিড় লেগে আছে। তাদেরকে এদিনও ঠান্ডা জল আর নারকোল দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু প্রাসাদের প্রবেশমুখে রাজকীয় সৈনিকের দল তার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে 'আজ আর সম্রাট সাক্ষাৎপ্রার্থীদের দর্শন দেবেন না, জরুরি কাজে আজ ব্যস্ত আছেন তিনি।'

অনেকটা জমি নিয়ে সম্রাট সামোরিনের বিশাল প্রাসাদ। কিন্তু ইট, কাঠ, পাথর নির্মিত সম্রাটের প্রাসাদ কেমন যেন ছিরিছাদহীন। পরিকল্পনা করে এ প্রাসাদ বানানো হয়নি। যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে তখন তেমনভাবে কক্ষ বানানো হয়েছে প্রাসাদে। নান্দনিক ভাবনা বা শিল্প সুষমার ব্যাপারটায় তেমন

BanglaBook.org

জোর দেওয়া হয়নি। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রাজপ্রাসাদগুলো দেখলে যেমন চোখ জুড়িয়ে যায়, এ-প্রাসাদের ক্ষেত্রে তেমনটা নয়। সর্বত্র কেমন যেন রুক্ষতা ফুটে আছে। ভারতীয় স্থাপত্যের তুলনায় এ স্থাপত্যের অনেক বেশি মিল আছে আরবের রুক্ষ মরুঅঞ্চল বা আফ্রিকার স্থাপত্যের। প্রাসাদের বহির্গাত্রের দেওয়ালগুলো অলঙ্করণহীন শুষ্ক-কঠিন-নিষ্প্রাণ। প্রাসাদের চারপাশ তিনটে স্তরে খুঁটির বেড়া দিয়ে ঘেরা। প্রতিটা খুঁটির সামনে ভীষণাকায় শূল হাতে দাঁড়িয়ে আছে ধাতু বা কচ্ছপের শক্তখোলের বর্ম-আঁটা সৈন্যরা। কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে আভূমিলম্বিত তলোয়ার। কারও পিঠে তিরধনুকও আছে। মুখমণ্ডল ভাবলেশহীন, শুধু তাদের অক্ষিগোলক ঘুরছে চারপাশে। সৈনিকদের এই ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা বিনা অনুমতিতে অতিক্রম করে মাছিও প্রবেশ করতে পারে না এ প্রাসাদে। নিরাপত্তা বলয়ের তিনটে তোরণ অতিক্রম করে তারপর উপস্থিত হতে হয় প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ তোরণের সামনে।

স্বয়ম্ভুনাথ পথপার্শ্বে বহিঃতোরণের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই এক উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীর নেতৃত্বে রক্ষীদল তাঁর চারপাশে ব্যূহ রচনা করল। পদস্থ রাজকর্মচারী স্বয়ম্ভুনাথের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন করলেন 'কি চাই?'

স্বয়ম্ভুনাথ জবাব দিলেন, 'আমি সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

রাজসৈনিক বললেন, 'সম্রাট আজ কাউকে দর্শন দেবেন না। কবে দর্শন দেবেন তাও এখন বলা যাবে না। ফিরে যান। রাজ্যের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আসবেন।'

স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'আমি কোনও আবেদন নিবেদন নিয়ে সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রার্থী নই। তিনি নিজেই আমাকে কোনও জরুরি প্রয়োজনে সাক্ষাতের জন্য তলব করেছেন। আমার নাম স্বয়ম্ভুনাথ। পেশায় সমুদ্রবণিক। কালিকটেরই বাসিন্দা।'

স্বয়ম্ভুনাথের কথা শুনে সেই পদস্থ রাজসৈনিক আর একবার ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন তাঁকে। সম্ভবত বণিক স্বয়ম্ভুনাথের অভিজাত চেহারা ও পোশাক দেখে তাঁর কথা কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল প্রবেশতোরণের সৈনাধ্যক্ষের। তবুও তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি খোঁজ নিচ্ছি যে সম্রাট বর্তমানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী কিনা?'

BanglaBook.org

দ্বারপ্রান্তে সৈনিকদের ঘেরাটোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন বনিক। আর দলনেতার নির্দেশে একজন বয়স্ক সৈনিক এগোল প্রবেশতোরণের ভিতর দিকে আগন্তুকের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে লোকটা ফিরে এসে দলনেতাকে কী যেন বলল। সৈনাধ্যক্ষ, স্বয়ম্ভুনাথকে বললেন, 'আপনার প্রাসাদে প্রবেশের অনুমতি মিলেছে। রক্ষীরা আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেবে।'

তোরণের অভ্যন্তরে প্রবেশের আগে অবশ্য প্রথামাফিক কয়েকজন সৈনিক স্বয়ম্ভুনাথের পোশাকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে নিল যে তার শরীরে কোনও লুকোনো অস্ত্র আছে কিনা। স্বয়ম্ভুনাথ যে অস্ত্রবিহীন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর দুজন সৈনিক তাঁকে নিয়ে চলল প্রাসাদের দিকে। প্রাসাদের মূল প্রবেশদ্বারে পৌঁছোবার আগে আরও দুটো তোরণ অতিক্রম করার সময় একইভাবে তল্লাসী চালানো হল তার দেহে। অবশেষে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশতোরণের সামনে ফাঁকা জমিতে স্বয়ম্ভুনাথকে পৌঁছে দিয়ে গেল সে দুজন রক্ষী। তারা বহির্দ্বারের রক্ষী। ভেতরে প্রবেশ করার অধিকার নেই তাদেরও। প্রাসাদের ভিতর ও প্রাসাদ সংলগ্ন এ অঞ্চলের নিরাপত্তার ভার বিশেষ সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সম্রাটের দেহরক্ষীদের। জায়গাটা থিক থিক করছে তাদের ভিড়ে। দীর্ঘাকার চেহারা তাদের, পরনে রক্তবর্ণের পোশাকের ওপর ধাতু বা গন্ডারের চামড়ার বর্ম। মাথায় শিরস্ত্রাণ, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ফিতে দিয়ে বাঁধা চর্মপাদুকা। চওড়া কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে দীর্ঘ তলোয়ার। কাঁধে ধনুক আর তূণীর। শুধু ধারালো অস্ত্রই নয়, একমাত্র এদের কাছেই বারুদ-ঠাসা বন্দুকও আছে। এই বন্দুকগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে চীনা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। সৈনিকদের ভিড়ের মাঝে কিছু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীও আছে। তাদের অনাবৃত ঊর্ধাঙ্গে চুনি-ফিরোজা-নীলকান্তমনিখচিত স্বর্ণালঙ্কার তাদের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছে। জায়গাটাতে পৌঁছে একটু থমকে দাঁড়ালেন স্বয়ম্ভুনাথ। কিন্তু সৈনিক আর রাজকর্মচারীদের জটলার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সম্রাটের পার্শ্বচর কোটকেশ্বরও। তিনি স্বয়ম্ভুনাথকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বললেন, 'প্রাসাদের ভিতরে চলুন, সম্রাট আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছেন।'

কোটকেশ্বর সঙ্গে থাকায় সৈনিকরা আর স্বয়ম্ভুনাথকে প্রাসাদে প্রবেশে বাধা দিল না। তবে ভিতরে ঢুকে এক জায়গাতে একটু থামতে হল স্বয়ম্ভুনাথকে। প্রাসাদে প্রবেশ করতেই দেখা গেল অলিন্দের দু-পাশে সার সার ঘর।

BanglaBook.org

রাজকর্মচারীরা সেখানে বসে কাজ করেন। প্রাসাদে যারা প্রবেশ করে ঐকটা ঘরে তাদের নাম নথিভুক্ত করা হয়। তালপাতার ওপর শক্ত লোহার কলম দিয়ে নাম লেখা হয়। এ কলমে কোন কালি থাকে না। তালপাতার গায়ে তীক্ষ্ণ-শক্ত-সরু কলমের মুখ দিয়ে আঁচড় কেটেই অক্ষর ফুটিয়ে তোলা হয়। কোটকেশ্বর সঙ্গে থাকলেও নিয়মানুসারে সেখানে নাম পরিচয় নথিভুক্ত করতে হল স্বয়ম্ভুনাথকে। তারপর কোটকেশ্বরের সঙ্গে তিনি চললেন সম্রাটের দরবারের দিকে।

সামোরিনের প্রসাদের বাইরেটা ছিরিছাঁদহীন হলেও ভিতরটা কিন্তু একেবারেই তা নয়। ঝকঝকে শীতল শ্বেতপাথরের মেঝে। দেওয়ালগাত্রেও মসৃণ পাথর বসানো। তার ওপর খোদাই করা রুপোর পাতের অলঙ্করণ। অলিন্দের প্রতিটা কোনায় নানা ধরনের পাথর অথবা পিতলের মূর্তি বসানো। আর কুলুঙ্গিগুলোতে রাখা ঝকঝকে তকতকে বিরাট বিরাট পিতলের প্রদীপ। সারা প্রাসাদ গোলাপের পাপড়ির সুগন্ধে আমোদিত। সপ্তাহে একদিন গোবরজল দিয়ে সারা প্রাসাদ জীবাণুমুক্ত করা হয় সনাতন রীতিতে। তারপর গোলাপের পাপড়ি আর গোলাপজল ছিটানো হয় সারা প্রাসাদ জুড়ে। প্রাসাদের ভিতর পরিচারিকার দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা সবাই উচ্চবর্ণের হিন্দু নারী। তারা কেউ প্রদীপে তেল ঢালছে, আবার কেউ দেওয়ালগাত্রের অলঙ্করণ বা মূর্তিগুলো ঘষামাজা করছে। সেইসব পরিচারিকা ও ঝলমলে পোশাক পরা রাজরক্ষীদের পাশ কাটিয়ে বেশ কয়েকটা কক্ষ অলিন্দ অতিক্রম করে কোটকেশ্বর, স্বয়ম্ভুনাথকে নিয়ে প্রবেশ করলেন রাজদরবারে।

সোনা-রুপোর কাজ করা দরবারকক্ষ। রুপোর সার সার প্রদীপদানের ওপর বসানো বিরাট বিরাট প্রদীপ থেকে আলো ছড়িয়ে পড়ছে দরবারকক্ষে। দেওয়াল, স্তম্ভর গায়ে বসানো সোনার অলঙ্করণগুলো ঝিলিক দিচ্ছে সেই আলোতে। সোনার সিংহাসনের ওপর বসে আছেন রাজা সামোরিন। তাঁর কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত শুভ্র রেশমবস্ত্রে আচ্ছাদিত। কৃষ্ণবর্ণের ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। না, অনাবৃত ঠিক নয়। তার কণ্ঠ থেকে বুক পর্যন্ত স্বর্ণছটায় মোড়া। সেই হারের ছড়ায় বসানো আছে রক্তের ছটার মতো লাল ব্রহ্মদেশের চুনি, গাঢ় সবুজ পান্না, ফিরোজা, নীলকান্ত মণি আর অবশ্যই চোখধাঁধানো হীরকখণ্ড। এছাড়া বাজুবন্ধ, অঙ্গদ আর পায়ে মোটা বালার মতো সোনার মল তো আছেই। সম্রাটকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তিনজন সুন্দরী বাঁদি। তাদের একজন সিংহাসনের

BanglaBook.org

পিছনে দাঁড়িয়ে সোনার হাতলঅলা চমরিগাইয়ের চামর দোলাচ্ছে। আর অপর দুজন সিংহাসনের দুপাশে দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে লম্বা নলঅলা রূপোর জলপাত্র। রাজার তৃষ্ণা লাগলে সে ওই লম্বা-বাঁকানো নল দিয়ে জল ঢেলে দেয় রাজার মুখে। আর একজন একটা রুপোর রেকাবিতে পানের খিলি সাজিয়ে দাঁড়িয়ে। কালিকটবাসীদের মতো রাজা সামোরিনও পান পছন্দ করেন। যে-বেদির ওপর সম্রাটের সিংহাসন তার নীচে মাটির ওপর চৌকোনো ছোট ছোট পাথরের বেদির ওপর বসে আছেন প্রধান সেনাপতিসহ সামোরিনের কয়েকজন ঘনিষ্ট পার্শ্বচর। আর দেওয়ালের ঘা ঘেঁষে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সম্রাটের একান্ত বিশ্বাসী জনা দশেক অঙ্গরক্ষক।

সামোরিনের সামনে উপস্থিত হলে তাঁকে নজরানা দিতে হয়। সোনা ছাড়া কোনও নজরানা গ্রহণ করেন না সামোরিন। নজরানা এক কণা হোক তাতে তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু সেটা সোনা হতে হবে। স্বয়ম্ভুনাথ শুনেছিলেন এর আগেরবার ওই পর্তুগিজ অ্যাডমিরালটা যখন এদেশে প্রথম এসেছিল তখন নাকি সে সামোরিনের নজরানা হিসেবে তার চাকরদের হাতে বেশ কিছু রঙিন কাপড়ের টুকরো, প্রবালের মালা, এক পাত্র চিনি, তেল আর মধু দিতে চেয়েছিল। হয়তো পর্তুগিজরা আফ্রিকার উপকূলে যে উপজাতি রাজারা থাকেন তাঁদের সঙ্গে কালিকটের রাজা সামোরিনকে গুলিয়ে ফেলেছিল। স্বাভাবিক নিয়মেই ভাস্কোর নজরানা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং খবরটা সামোরিনের কানে যাওয়াতে প্রাথমিক অবস্থাতেই যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হন ভাস্কোর প্রতি।

স্বয়ম্ভুনাথ, সম্রাটের সিংহাসনের নীচে দাঁড়িয়ে প্রথমে নতজানু হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বেশ কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা নজরানা স্বরূপ তাঁর পায়ের কাছে নামিয়ে কিছুটা পিছু হটে দাঁড়ালেন। সিংহাসনে বসা সামোরিন মৃদু দৃষ্টিপাত করলেন তাঁর পায়ের সামনে রাখা স্বর্ণমুদ্রাগুলোর দিকে। সামোরিন এরপর তাঁর পরিচর্যারত দাসী ও সৈনিকদের চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন কক্ষ ত্যাগ করার জন্য। ধীরে ধীরে কক্ষত্যাগ করল তারা। একজন দাসী অবশ্য যাবার আগে স্বর্ণমুদ্রাগুলো উঠিয়ে নিয়ে গেল। দরবারসংলগ্ন বেশ কিছু ছোট ছোট কক্ষ আছে। সেসব কক্ষের দরজাও দরবারে প্রবেশ দরজাও বন্ধ হয়ে গেল তারপর।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে স্বয়ম্ভুনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন সামোরিন। তারপর স্বয়ম্ভুনাথকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন 'দেশে ফেরার সময় ওই পর্তুগিজ

BanglaBook.org

জলদস্যু ভাস্কোর সঙ্গে সমুদ্রে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল?'

প্রশ্নটা শুনে স্বয়ম্ভুনাথ বুঝতে পারলেন, যে-নাবিকরা তার মৃচ্ছকটিকে সঙ্গী হয়েছিল তারাই মাটিতে নামার পর খবরটা ছড়িয়েছে এবং কোনওভাবে অতি দ্রুত সে-সংবাদ পৌঁছে গেছে সম্রাটের কানে। যে গুপ্তচরের দল বন্দর অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় তাদের মাধ্যমেও হয়তো এ-সংবাদ পেয়ে থাকতে পারেন সামোরিন। এ ঘটনার জন্য কি তাঁকে শাস্তি দেবেন তিনি?

কিন্তু ব্যাপারটা অস্বীকার করার আর কোনও উপায় নেই। কাজেই স্বয়ম্ভুনাথ, মাথা নীচু করে জবাব দিলেন 'হ্যাঁ, মাসাধিক কাল আগে আফ্রিকা উপকূলের কাছাকাছি মাঝসমুদ্রে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমার মৃচ্ছকটিককে দেখতে পেয়ে তারাই আমাদের ঘিরে ধরেছিল চারপাশ থেকে।'

'পর্তুগিজ জলদস্যুটা আপনার ময়ূরপঙ্খিতে পা রেখেছিল?' জানতে চাইলেন সামোরিনের এক পার্শ্বচর।

স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'না, সে মৃচ্ছকটিকে আসেনি। তবে বহু পর্তুগিজ নাবিক আমার ময়ূরপঙ্খিতে সময় কাটিয়েছে। আমাকে ভাস্কোর জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোর জন্য।'

'কী কথাবার্তা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে? সে কী কারণে এখানে আসছে তার কোনও ইঙ্গিত পেয়েছিলেন আপনি?' অপর একজন পার্শ্বচর প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন পাশ থেকে।

এ-প্রশ্নের জবাব দেবার সময় স্বয়ম্ভুনাথ মৃদু মিথ্যার আশ্রয় নিলেন। কারণ, তার জানা নেই যে, সেই পর্তুগিজ নৌবহরের দলপতি ভাস্কোর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটা সামোরিন অপরাধ হিসাবে গণ্য করেছেন কিনা? স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'পর্তুগিজরা জেপাং নারীদের পছন্দ করে। অ্যাডমিরাল আমাকে তার নাবিকদের জন্য জেপাং নারী জোগাড় করার বরাত দিয়েছিল। তাঁর কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে সে মহামান্য রাজার অতিথি হয়ে এদেশে আসছে। আর সেজন্য আমি তার প্রস্তাবে সম্মত হই এবং জেপাং থেকে নারী সংগ্রহ করে এনেছি।'

পার্শ্বচর বললেন, 'কিন্তু কালিকটে নামার পর নিশ্চই বুঝতে পারছেন যে সেই ধূর্ত-শয়তান-পর্তুগিজটা কেন আবার ফিরে এসেছে এখানে? আগের বার সে এসেছিল বণিকের ছদ্মবেশে সরেজমিনে তদন্ত করতে। আর এবার এসেছে এ-দেশটার দখল নিতে। তার সঙ্গে অত নৌবহর দেখে আপনার মনে সন্দেহের

BanglaBook.org

উদ্রেক হয়নি?'

স্বয়ম্ভুনাথ জবাব দিলেন, 'আমার সঙ্গে যখন তার সাক্ষাৎ হয় তখন তার সঙ্গে একটা নৌবহর ছিল ঠিকই, তবে এত বড় নৌবহর ছিল না। সম্ভবত অন্য নৌবহরগুলো পরবর্তীকালে তার সঙ্গে সমুদ্রপথে মিলিত হয়। আমি বনিক। বছরের সাত-আট মাসই আমি সমুদ্রে কাটাই আমার ভাসমান গণিকালয় নিয়ে। স্থলে যে-কয়মাস কাটাই তখন আমার গণিকালয় নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে, রাজনীতির খুঁটিনাটি ব্যাপার আমার তেমন জানা হয় না। একটা ব্যাপারই শুধু আমি জানি, আমাদের বণিকদের মাথার ওপর সম্রাট সামোরিন আছেন, তাই আমরা বিপদমুক্ত। বন্দরে নামার পর লোকমুখে পর্তুগিজদের হুমকির ব্যাপারটা শুনলাম। আর তাদের নৃশংসতাও প্রত্যক্ষ করলাম। নিরীহ ধীবরদের হত্যা করে মাস্তুলে টাঙিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। শুনলাম সম্রাট যাদের পর্তুগিজদের জাহাজে দৌত্যকার্যে পাঠিয়েছিলেন তাদেরও কাউকে কাউকে নাকি হত্যা করেছে তারা।'

পার্শ্বচর বললেন, 'ঠিকই শুনেছেন। পর্তুগিজরা শর্ত দিয়েছে, কালিকটের সমৃদ্ধিমূলে যে আরব ব্যবসায়ীরা আছেন তাঁদের বিতাড়িত করতে হবে, কোনও আরব জাহাজকে বন্দরে আশ্রয় দেওয়া যাবে না। বন্দরের বাণিজ্যের সম্পূর্ণ অধিকারও তাদের দিতে হবে। কালিকটে দুর্গ নির্মাণ করবে তারা। যেসব শর্তর কোনওটাই মানা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। তাই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।' এ কথা বলার পর অমাত্য মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি জপাং নারীদের নিয়ে কী করবেন এখন? মাঝসমুদ্রে গিয়ে পর্তুগিজদের কাছে তাদের তুলে দেবেন?'

স্বয়ম্ভুনাথ মাথা নীচু করে বললেন, 'তার আর কোনও প্রশ্নই নেই। আমি তো আগেই নিবেদন করলাম যে, ওই পর্তুগিজ অ্যাডমিরালের উদ্দেশ্য জানলে আমি কখনই তার প্রস্তাবে রাজি হতাম না। আপনারা চাইলে আমি আপনাদের হাতে জেপাং নারীদের তুলে দিতে পারি।'

এতক্ষণ রাজা সামোরিন মনোযোগ দিয়ে তাঁর পার্শ্বচরদের সঙ্গে স্বয়ম্ভুনাথের কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি এবার বলে উঠলেন, 'আপনি ওই পর্তুগিজদের হাতেই জপাং রমণীদের তুলে দেবেন।'

সম্রাট কি তাঁকে ব্যঙ্গ করলেন? এরপরই কি শত্রুপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগে রাজদণ্ড ঘোষিত হতে চলেছে? সামোরিনের কথা শুনে একটু ভীতভাবে স্বয়ম্ভুনাথ তাকালেন সামোরিনের দিকে। সামোরিন তাকালেন তাঁর

BanglaBook.org

বেদির ঠিক নীচেই উপবিষ্ট সেনাপতির দিকে। সেনাপতি, স্বয়ম্ভুনাথকে প্রশ্ন করলেন, আপনি বৃশ্চিক দ্বীপে আগে একবার গেছিলেন, তাইনা?'

কালিকট থেকে দক্ষিণে সমুদ্রপথে একদিন সময় লাগে সে দ্বীপে যেতে। বছর কুড়ি আগেও সে দ্বীপ জনমানবহীন ছিল। বড় বড় বিছার দল সে দ্বীপে ঘুরে বেড়ায়, যার একটা দংশনে বিরাট আরবি ঘোড়াও মারা যায়। যে-কারণে সে দ্বীপে কেউ বসতি স্থাপন করেনি। কিন্তু সামোরিন যখন সিংহাসনে বসলেন তখন মন দিলেন উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে জলদস্যু দমনের কাজে। তাদের বহু নৌকো জাহাজ ডোবানো হল। বহু জলদস্যুকে শূলে চড়ানো হল, মুণ্ডচ্ছেদ করা হল। একসময় ভীত-সন্ত্রস্ত জলদস্যুরা দলে দলে আত্মসমর্পণ করতে লাগল কালিকট বন্দরে এসে। সংখ্যাটা প্রায় হাজারের মতো। সামোরিন পড়লেন সমস্যায়। এতগুলো লোককে নিয়ে তিনি কী করবেন? একে তো এতগুলো লোককে রাখার বড় কয়েদখানা নেই কালিকটে। যদি কোনওভাবে তাদের কোথাও রাখার ব্যবস্থাও করা যায় তবে প্রচুর অর্থ রাজকোষ থেকে বেরিয়ে যাবে তাদের ভরণপোষণের জন্য। আবার তাদের স্বাধীন ভাবে নাগরিক সমাজে ছেড়েও রাখা যাবে না। কারণ, তাদের রক্তে অপরাধপ্রবণতা আছে, নরহত্যার নেশা আছে। তারা জনজীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারে। অবশেষে সামোরিনের এক পার্শ্বচরের পরামর্শে সমাধানসূত্র মিলল।

জলদস্যুদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে যাদের দলপতি নির্বাচন করা হয়েছিল তাদেরকে বলা হল দলবল নিয়ে ওই জনহীন বৃশ্চিকদ্বীপে চলে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষআবাদ-মাছ শিকার করে জীবনধারণ করবে তারা। সামোরিন অবশ্য তাদের ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য, পরিকাঠামো তৈরির জন্য প্রতিবছর তাদের কিছু অর্থ সাহায্য করবেন। আর তার পরিবর্তে প্রয়োজন হলে সামোরিনের পক্ষ অবলম্বন করে উপকূল অঞ্চলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে সে লোকগুলো। সামোরিন অবশ্য এ-কথাও জানিয়েছিলেন যে, দস্যুপতিরা যদি 'তার শর্ত না মানে তবে সবাইকে একটা বড় জাহাজে তুলে মাঝসমুদ্রে সেই জাহাজকে তিনি ডুবিয়ে দেবেন। কাজেই শর্ত মানতে বাধ্য হয়েছিল জলদস্যুরা। বেঁচে থাকার কিছু উপকরণসহ তাদের নামিয়ে আসা হয়েছিল সেই বৃশ্চিক দ্বীপে। সামোরিন হয়তো এও ভেবে থাকতে পারেন যে-ওই দ্বীপে গেলে বিছের কামড়ে, সাপের কামড়ে বা দ্বীপের স্যাঁতস্যাঁতে জলবায়ুতে রোগে ভুগে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে দলটা। আর কোনও দুর্ভাবনা

BanglaBook.org

থাকবে না কালিকটবাসীর।

কিন্তু তা হয়নি। কিছু লোক ওভাবে মারা গেছিল ঠিকই, কিন্তু বাকিরা বেঁচে গেছিল। কাজেই সামোরিনকেও শর্তমতো তাদের সাহায্য পাঠাতে হয়। তবে কাজটা করে যে তিনি ভালোই করেছেন তা তিনি বুঝতে পেরেছেন বছর সাতেক আগে। রাজা যখন অতর্কিতে কালিকট বন্দরে হামলার জন্য সমুদ্রে নৌ সমাবেশ ঘটাচ্ছিলেন তখন সে খবর পেয়ে কালিকট অধিপতি দ্বীপবাসী জলদস্যুদের সাহায্য চেয়েছিলেন। সামোরিনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল তারা। নারকেল গুড়ির তৈরি একধরনের কেনো থেকে ওরা দূরগামী তীর ছোড়ে। সেই তীরের ডগায় বাঁধা থাকে জ্বলন্ত পিণ্ড। যেখানে সেই তীর এসে পড়ে মুহূর্তে সেখানে আগুন ধরে যায়। তাদের নীল রং করা নৌকা আর নীল পোশাক সমুদ্রের জলের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে-চট করে তাদের উপস্থিতি বোঝা যায় না। সামোরিনের ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে ঝাঁকে ঝাঁকে কেনো নৌকো নিয়ে বেরিয়ে ঘিরে ধরেছিল কন্নোনরের বণপোত গুলোকে। তারাও কিছু কামানের গোলায় মারা পড়েছিল ঠিকই কিন্তু তির ছুড়ে আগুন লাগিয়ে কন্নোনরের জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। ব্যর্থ হয়েছিল কন্নোনরের কালিকট অধিকারের ইচ্ছা। আর তারপর থেকে সামোরিন ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সেই বৃশ্চিক দ্বীপবাসীকে খুশি রাখার চেষ্টা করেন। তাদের আবদার রক্ষা করার চেষ্টা করেন প্রায়শই। বিভিন্ন জাতির মানুষ আছে সেখানে। বিভিন্ন ধর্মেরও। মলাক্কা, সিংহলি, চৈনিক, পারসিক এবং অবশ্যই আরবীয়। কিছু শ্বেতাঙ্গও আছে। তবে তাদের এখন একটাই পরিচয়। তাদের সেই দ্বীপের নামানুসারে বৃশ্চিক বলে ডাকা হয়। প্রাক্তন জলদস্যুদের বর্তমান সর্দারের নাম মারীচ। জাতে যে সিংহলী। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের দানবাকৃতী চেহারা তার। এখনও যদি সে কারও দিকে তাকায় তার রক্ত জল হয়ে যায়। রাজ নির্দেশেই একবার তার সঙ্গে বৃশ্চিক দ্বীপের তটরেখায় সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছিল স্বয়ম্ভুনাথের। সেনাপতির প্রশ্নের জবাবে স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, রাজনির্দেশেই সে-দ্বীপের তটরেখায় পাঁচ বছর আগে পদার্পণ করেছিলাম আমি। কিছু নিম্নশ্রেণির নারীকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে এসেছিলাম, তাদের বংশবৃদ্ধির জন্য। রাজকোষ থেকেই তার ব্যয় মেটানো হয়েছিল।'

সেনাপতি বললেন, 'হ্যাঁ, সে কথা স্মরণ করেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন সম্রাট। এই কালিকটের যাবতীয় সমৃদ্ধির মূলে আপনারা

BanglaBook.org

অর্থাৎ নানা শ্রেণির বনিক সম্প্রদায়। সম্রাট আপনাদের বিশ্বাস করেন। এবং এও বিশ্বাস করেন যে এই কালিকটকে আপনারা নিজের মায়ের মতোই ভালোবাসেন। এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহের কোনও অবকাশ আছে কি?'

স্বয়ম্ভুনাথ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন। 'না, নেই। কালিকট আমার মায়ের সমান। এখানেই আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি, আমার এই যাবতীয় সমৃদ্ধির মূলে এই কালিকট বন্দর। এ দেশকে আমি মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি।'

সেনাপতি ও অন্যান্যরা স্বয়ম্ভুনাথের জবাব শুনে সন্তুষ্ট হলেন। এমনকী এই দুর্যোগের সময়ও আবছা হাসি ফুটে উঠল যেন রাজা সামোরিনের ঠোঁটের কোণে।

সেনাপতি বললেন, 'কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত পর্তুগিজরা তাদের শর্তপালনের চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। কাল সকাল থেকেই হয়তো তারা গোলাবর্ষণ করবে বন্দরে। কারণ, তাদের শর্ত মানার কোনও প্রশ্নই নেই। আমার নায়ার সেনারা যথোপযুক্ত জবাব দেবে তাদের। আপনি জানেন যে নায়ার সেনারা মরতে ভয় পায় না। ইতিপূর্বে বিভিন্ন ঘটনায় তা প্রমাণিত। কিন্তু পর্তুগিজরা এবার দলে ভারী হয়ে এসেছে। অনেক রণপোত, অনেক কামান তাদের। দু-দিক থেকে অর্থাৎ বন্দরের দিক থেকে এবং সমুদ্রপথে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করলে তাদের পরাস্ত করা সহজ হবে। সেজন্য বৃশ্চিক দ্বীপের অধিবাসীদের সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু সে দ্বীপে যেতে হলে যে-কোনও জাহাজকে বা নৌকোকে পর্তুগিজদের রণপোত অতিক্রম করে যেতে হবে। যা কেবলমাত্র আপনার দ্বারাই সম্ভব। সম্রাট আপনার কাছে একটা পত্র ও পেটিকা তুলে দেবেন দ্বীপের দলপতি মারীচের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। আপনি তারপর সে-দ্বীপেই অবস্থান করবেন। দুর্যোগ কেটে গেলে, পর্তুগিজরা ধ্বংস হলে বা পালিয়ে গেলে সেই পেটিকা নিয়ে আপনি আবার ফিরে এসে তা তুলে দেবেন সম্রাটের হাতে...

সেনাপতির কথা শেষ হবার আগেই স্বয়ম্ভুনাথ বিস্মিতভাবে বললেন, 'পর্তুগিজরা তাদের নৌবহরের ব্যূহ অতিক্রম করে আমাকে বৃশ্চিকদ্বীপে যেতে দেবে কেন?'

সেনাপতি বললেন, 'সম্ভবত যেতে দেবে। তার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কী কৌশল তা আমরা ভেবে রেখেছি। আপনি বলবেন যে, পর্তুগিজদের সঙ্গে মাঝসমুদ্রে সাক্ষাতের ব্যাপারটা, তাদের জন্য জপাং নারী

BanglaBook.org

সংগ্রহের ব্যাপারটা সম্রাট জেনে গেছেন। তিনি এ হেন ব্যাপার জেনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে আপনার বন্দরস্থিত গণিকালয়ের নারীসমেত সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন এবং জেপাং নারীসমেত আপনাকে কাল সূর্যোদয়ের পূর্বেই কালিকট ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অগত্যা আপনি পর্তুগিজদের হাতে জেপাং নারীদের তুলে দিয়ে দক্ষিণের কোনও বন্দরে চলে যাচ্ছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে, অর্থাৎ পর্তুগিজরা যদি কালিকটে আধিপত্য কায়েম করতে পারে, তবে আপনি আবার ফিরে আসবেন। আপনি জেপাং নারীদের পর্তুগিজদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছেন দুটো কারণে। প্রথম কারণ, আপনি ব্যবসায়ী। যে-কোনও মূল্যে ব্যবসায়িক চুক্তি পালন করা আপনার ধর্ম। আর দ্বিতীয়ত, আপনি আশা রাখছেন যে, এ-কাজ সম্পন্ন করার জন্য ভবিষ্যতে পর্তুগিজদের আশ্রয় পাবেন আপনি।'

কথাটা শুনে স্বয়ম্ভুনাথ একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'কিন্তু তাদের কি বিশ্বাস করানো যাবে ব্যাপারটা?'

সম্রাটের একজন পার্শ্বচর বলে উঠলেন, 'আপনার তাৎক্ষণিক উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটা তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। আমরা মূল পরিকল্পনাটা কষেছি। ব্যাপারটা সামাল দেবার দায়িত্ব আপনার।'

তার কথা শুনে স্বয়ম্ভুনাথ চুপ করে গেলেন।

এরপর মুখ খুললেন স্বয়ং সামোরিন। তিনি বললেন, 'কালিকটের স্বার্থে এ কার্য সম্পাদনের জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করি আপনি আমার এ অনুরোধ রক্ষা করবেন।'

রাজ অনুরোধ মানে তো রাজনির্দেশ। হাজার বিপদ আসলেও এ-নির্দেশ অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয় সাধারণ মানুষের পক্ষে। অগত্যা স্বয়ম্ভুনাথ সম্রাটের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনার আদেশ শিরোধার্য। কখন, কবে আমাকে রওনা হতে হবে পর্তুগিজদের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য?'

জবাব দিলেন সেনাপতি। তিনি বললেন, 'আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। আজ সূর্যাস্তের আগেই আপনাকে ময়ূরপঙ্খি ভাসাতে হবে সমুদ্রে। তবে জেপাং নারীদের, নাখোদা আর দাঁড়ি-হালি ছাড়া লোক নেবেন না আপনার জাহাজে। কারণ তাতে পর্তুগিজদের সন্দেহের উদ্রেক ঘটতে পারে। তাছাড়া কারও মুখ থেকে বেঁফাস কথাও বেরিয়ে আসতে পারে। আপনি দ্রুত ফিরে গিয়ে যাত্রারম্ভের প্রস্তুতি শুরু করুন। পর্তুগিজদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের ব্যূহ

BanglaBook.org

অতিক্রম করে কাল সকালের মধ্যেই আপনাকে যথাস্থানে সম্রাট সামোরিনের পেটিকা আর পত্র পৌঁছে দিতে হবে। প্রয়োজনে আমরা কিছু লোকও দেব আপনার যাত্রা শুরুর প্রস্তুতির জন্য। আর অর্থের জন্যও কোনও কার্পণ্য করবেন না। যাত্রা শুরুর প্রাকমুহূর্তে সেই পেটিকা আর চিঠি আমি আপনার হাতে পৌঁছে দেব।'

কথাবার্তার পর্ব সাঙ্গ হল এবার। স্বয়ম্ভুনাথ এরপর সামোরিনের প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। অবশ্য তার আগে রাজা সামোরিনের পার্শ্বচর কোটকেশ্বর একটা রেশমের থলে তুলে দিলেন স্বয়ম্ভুনাথের হাতে। তার মধ্যে রয়েছে স্বর্ণমুদ্রা। সেই থলে নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে স্বয়ম্ভুনাথ ঘোড়া ছোটালেন ফেরার জন্য। ইতিমধ্যে স্বয়ম্ভুনাথের অনুচররা বন্দরস্থিত গণিকালয় থেকে গণিকাদের স্থানান্তরিত করার কাজ শুরু করেছিল। মাঝপথে সেই বলদের গাড়িগুলোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল স্বয়ম্ভুনাথের। বলদের গাড়িগুলোর মধ্যে যে-গাড়িগুলোতে সেই জেপাং নারীরা ছিল, যে-গাড়িগুলোকে তিনি আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন।

৬

স্বয়ম্ভুনাথ সামোরিনের প্রসাদ থেকে যথাসম্ভব দ্রুত নিজের গৃহে ফিরে এলেন। লোক পাঠিয়ে তিনি প্রথমেই ডেকে আনলেন নাখোদাকে। স্বয়ম্ভুনাথের মুখ থেকে সব শোনার পর নাখোদা বললেন, 'সম্রাটের অনুরোধ মানে তা আসলে নির্দেশ। তাই যেতে হবে আমাদের। কাজটা অতিমাত্রায় বিপজ্জনক কোনও সন্দেহ নেই। ঝড়ের মুখে পড়ে আমরা তো মরতেই বসেছিলাম। বাচ্চা মেয়েটা আর তার বাঁদরির জন্য সে-যাত্রায় রক্ষা পেয়েছি। কিন্তু বার বার তো এভাবে মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না।'

স্বয়ম্ভুনাথ জবাব দিলেন, 'কী আর করা যাবে? জলস্থল দু-জায়গাতেই বিপদ ঘিরে ধরেছে। সামোরিনের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে হয়তো পর্তুগিজদের হাতে মরতে হবে। আর তাঁর নির্দেশ পালন না করলে সামোরিন হয়তো শূলে চড়াবেন।'

নাখোদা বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'আমি তো নাবিক। তাই যদি সমুদ্রে আমার

BanglaBook.org

মৃত্যু হয় তবে তা আমার কাছে অপেক্ষাকৃত গৌরবের হবে। দেখা যাক আমাদের ভাগ্যে কী লেখা আছে?'

স্বয়ম্ভুনাথ তার হাতে সামোরিনের দেওয়া স্বর্ণমুদ্রার থলিটা তুলে দিয়ে বললেন, 'আপনি এবার দাঁড়ি-মাঝিদের দ্রুত জোগাড় করুন।' তবে পোশাক বা চেহারা দেখে আরব বলে চেনা যায় এমন কোনও লোককে নির্বাচন করবেন না।'

নাখোদা সেই স্বর্ণমুদ্রার থলি নিয়ে রওনা হলেন বন্দরের দিকে। বন্দরচত্ত্বর পর্তুগিজদের আক্রমণের ভয়ে প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে। কাছাকাছি পৌঁছে নাখোদা শুনতে পেলেন, ভোরবেলা নার্কি একটা নৌকো ভেসে এসেছে চরে। পর্তুগিজরা সেই হতভাগ্য ধীবরদের মুন্ডুগুলো কেটে পাঠিয়ে দিয়েছে সেই নৌকোয়। এভাবে কালিকটবাসীদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে তারা। সামোরিন যদি তাদের প্রস্তাবে রাজি না হন তবে নগরবাসীদের কপালেও এমন ঘটনা লেখা আছে।

বন্দর ফাঁকা হয়ে গেলেও, কিছু লোক তখনও সে জায়গা ছেড়ে যায়নি। সত্যি কথা বলতে কী, তাদের যাবারও তেমন কোনও জায়গা নেই। প্রত্যেক বন্দরেই এমন বেশ কিছু লোক দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের মানুষ সব। জাহাজে জাহাজে ভবঘুরের মতো এ বন্দর-সে বন্দর ঘুরে বেড়ায় তারা। বছরের অধিকাংশ সময়, তারা জলেই কাটায়। আর বাকি সময়টা কাটায় বন্দরের বেশ্যালয়, ভাটিখানায় বা জুয়ার আড্ডায়। ঘর, বাড়ি, পরিজন না থাকার কারণে এ লোকগুলো একটু দুর্ধর্ষ প্রকৃতির হয়। পয়সা পেলে তারা কোনও কাজ করতে পিছপা হয় না। এমনকী নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পা বাড়াতেও পিছুপা হয় না এই ভবঘুরে নাবিকরা। নাখোদা গিয়ে হাজির হলেন তেমনই এক শুঁড়িখানায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি জোগাড় করে ফেললেন জনা কুড়ি দাঁড়ি-হালিকে। তাদের নিয়ে কাজে নেমে পড়লেন নাখোদা।

ওদিকে স্বয়ম্ভুনাথও নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কীভাবে যে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেল তা মালুমই পেলেন না স্বয়ম্ভুনাথ। যাত্রা আরম্ভর সময় হয়ে এল। বিকেলবেলা একটা গো-শকট এসে উপস্থিত হল তাঁর সদর দরজার সামনে। রক্ষী পরিবৃত গো-শকট। তার নেতৃত্বে স্বয়ং সেনাপতি। শকট থেকে লোহার চওড়া পট্টি দেওয়া একটা ছোট কাঠের সিন্দুক নামানো হল। তাতে একটা বড় তালা ঝুলছে। তালার ওপর কাপড় জড়িয়ে গালা দিয়ে

BanglaBook.org

সম্রাটের মোহর বসানো হয়েছে। সেই সিন্দুক নিয়ে সেনাপতি প্রবেশ করলেন স্বয়ম্ভুনাথের গৃহে। স্বয়ম্ভুনাথের কাছে সিন্দুকটা তুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'আপনার প্রস্তুতি সম্পন্ন তো?'

স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'হ্যাঁ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি রওনা হব বন্দরের দিকে। নাখোদা ইতিমধ্যে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। সূর্যাস্তের আগেই মৃচ্ছকটিকের নোঙর তুলে ফেলা হবে। জেপাং নারীদেরও জাহাজে তুলে ফেলার কথা।'

সেনাপতি পেটিকাটার দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'এটা কিন্তু খুব যত্নে রাখবেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার এই সিন্দুকটা ফিরিয়ে এনে তুলে দেবেন সম্রাটের হাতে। মনে রাখবেন আপনার যাবতীয় সম্পত্তি, গণিকালয় এ-সবই কিন্তু কালিকট বন্দরে ফেলে রেখে যাচ্ছেন।'

এ কথাটার মাধ্যমে সেনাপতি কী বলতে চাইলেন তা বুঝতে অসুবিধা হল না স্বয়ম্ভুনাথের। অর্থাৎ এই পেটিকা যদি তিনি ফিরিয়ে আনতে না পারেন তবে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবেন সম্রাট সামোরিন। সেনাপতি আর কোনও কথা না বাড়িয়ে এরপর স্বয়ম্ভুনাথের গৃহ ত্যাগ করলেন। পেটিকাটা তাঁর শয়নকক্ষের মেঝেতে রেখে স্বয়ম্ভুনাথ চলে গেলেন স্নান সেরে পোশাক পরিবর্তনের জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যে সব কাজ সমাধা হল। এবার তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হবে। পেটিকাটা সঙ্গে নেবার জন্য তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন। মৎস্যগন্ধা আর তার শিম্পাঞ্জিটা কখন যেন তাঁর অনুপস্থিতিতে কক্ষে প্রবেশ করে সিন্দুকটার ওপর বসে আছে!

সরলতা মাখানো দৃষ্টিতে বাচ্চা মেয়েটা তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তাকে দেখে স্বয়ম্ভুনাথের মনে হল, তিনি যদি আর কোনদিন কালিকটে ফিরে আসতে না পারেন তবে মেয়েটার ভাগ্যে কী হবে? এই মেয়েটার জন্যই তো তাঁর আর মৃচ্ছকটিকের অতগুলো মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছিল। আর এরপরই স্বয়ম্ভুনাথের মনে হল বাচ্চামেয়েটার সিন্দুকের ওপর এভাবে বসা কোনও ইঙ্গিতবাহী নয়তো? যে-কাজে এবার তিনি গৃহত্যাগ করতে যাচ্ছেন তাতে বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর। মেয়েটি পয়মন্ত। সে সঙ্গে থাকলে হয়তো তিনি বিপদমুক্ত হবেন। কথাটা মনে হতেই তিনি মেয়েটার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে বসলেন, 'তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

BanglaBook.org

মৎস্যগন্ধা, স্বয়ম্ভুনাথের প্রশ্ন শুনে কী বুঝল কে জানে! সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বয়ম্ভুনাথ সেই পেটিকাসমেত, মৎস্যগন্ধা, তাঁর পোষ্য আর গণিকা ভর্তিকাকে তাঁর সঙ্গে গো-শকটে উঠিয়ে নিয়ে গৃহত্যাগ করে রওনা হলেন বন্দরের দিকে।

নাখোদা বন্দরেই অপেক্ষা করছিলেন। সূর্য এবার ঢলতে শুরু করেছে সমুদ্রে। দিনের শেষ আলো ছড়িয়ে পড়েছে নির্জন-বিষণ্ণ কালিকট বন্দরের বুকে। নাখোদা আর তাঁর সঙ্গী দুজন মাল্লা ছাড়া কেউ কোথাও নেই। একদল হাড়গিলে পাখি শুধু কর্দমাক্ত চরে আবর্জনা খুঁটে খাচ্ছে। স্বয়ম্ভুনাথ মিলিত হলেন তার সঙ্গে। তিনি তাকালেন চড়ায় আটকে থাকা মৃচ্ছকটিকের দিকে। তার প্রধান মাস্তুলে সাদা পাল টাঙানো হয়েছে যাতে তার ওপর পর্তুগিজ জাহাজগুলো আক্রমণ না হানে। পর্তুগিজ নৌবহরগুলোকেও তিনি দেখতে পেলেন। অন্ধকার নামলে বন্দর থেকে কালিকটবাসীরা আক্রমণ হানতে পারে এই আশঙ্কায় বেশ কিছুটা দূরে সরে গেলেও তারা দৃষ্টিপথের একেবারে আড়ালে চলে যায়নি। হাঙরের মতো সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে পর্তুগিজ নৌবহরের ঝাঁক। নিশ্চয়ই তারা আতস কাচ লাগানো নল দিয়ে নজর রাখছে বন্দরের ওপর। মৃচ্ছকটিককে তারা দেখতে তো পাচ্ছেই, হয়তো বা পাড়ে দাঁড়ানো স্বয়ম্ভুনাথদেরও দেখতে পাচ্ছে। একটাই ভরসা, মৃচ্ছকটিককে তারা চেনে। হয়তো তারা চট করে গোলা দাগবেনা। জেপাং নারীরা ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। স্বয়ম্ভুনাথের মনে হল, তার সঙ্গে মৎস্যগন্ধাকে দেখে যেন খুশি হলেন নাখোদা। তাঁর মনেও হয়তো বিশ্বাস জন্মেছে মেয়েটার শুভশক্তির ব্যাপারে। কারণ, মুখে তিনি কিছু না বললেও মেয়েটাকে কোলে তুলে নিলেন। তাঁর দুজন অনুচর তুলে নিল সিন্দুকটা। কর্দমাক্ত জমিটা পেরিয়ে তাঁরা এগোলেন মৃচ্ছকটিকের দিকে। জাহাজটার কাছে পৌঁছে দড়ির মই বেয়ে উঠে এলেন মৃচ্ছকটিকের ডেকে। মাল্লাদের সবাইকে প্রথমে পাল খাটাবার নির্দেশ দিলেন নাখোদা। স্বয়ম্ভুনাথ নিজের কাঁধে তুলে নিলেন সেই পেটিকা। তারপর ভর্তিকা, মৎস্যগন্ধা আর তার পোষ্যকে নিয়ে ডেক ছেড়ে জাহাজের খোলের ভিতর নামলেন। মৃচ্ছকটিকের খোলের ভিতর একটা গোপন কক্ষ আছে। বাইরে থেকে কাঠের পাটাতন সরিয়ে তাতে ঢুকতে হয়। তার মধ্যে একটা ছোট নৌকোও আছে। সমুদ্রর জলতলের প্রায় সমান্তরালে সে কক্ষের অবস্থান।

BanglaBook.org

ঘরের উল্টোদিকের দেওয়ালের গায়ের পাটাতন সরিয়ে নৌকো নিয়ে ভেসে পড়া যায় সমুদ্রে। নাখোদা আর স্বয়ম্ভুনাথ ছাড়া যে মাল্লারা এখন মৃচ্ছকটিকে আছে তাদের এই গুপ্ত কক্ষের অবস্থান জানা নেই। সেই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে তিনি সিন্দুকটা রাখলেন। ভর্তিকাকে বললেন মৎস্যগন্ধা আর তার পোষ্যকে নিয়ে সেখানে লুকিয়ে থাকতে। তারা যেন একমাত্র স্বয়ম্ভুনাথের গলার শব্দ শুনলে তবেই ভিতর থেকে সাড়া দেয়। তাদের সেই কক্ষের ভিতরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে কাঠের পাটাতন টেনে দিয়ে খোল ছেড়ে আবার ডেকে উঠে এলেন স্বয়ম্ভুনাথ।

পাল খাটানো হচ্ছে। সাদা পালে দিনান্তের সূর্য লাল আভা ছড়াচ্ছে, সমুদ্রেও ছড়িয়ে পড়ছে আবিরের রং। ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে জেপাং-মেয়েগুলো। হয়তো তারা ভাবছে সমুদ্রের ওপারে তাদের দেশের কথা, যেখানে দ্বীপমালার কোনও নিভৃতপল্লীতে এই সূর্যাস্তের সময় তাদের কথা ভাবছে, তাদের ফেরার প্রতীক্ষা করছে তাদের প্রিয়জনেরা। কিন্তু তাদের আর কোনওদিন ফেরা হবে না সমুদ্র-ঘেরা সেই দেশে। সমুদ্র বড় নিষ্ঠুর। তাদের জীবন থেকে সব কিছু কেড়ে নিয়ে অকূল দরিয়ায় এনে ফেলল তাদের। সমুদ্র এই জেপাং নারীদের ভাসাতে ভাসাতে কোথায় নিয়ে যাবে তা একমাত্র সমুদ্রই জানে। চোখের জল বহুদিন আগেই শুকিয়ে গেছে এই নারীদের। শুধু এক স্থায়ী বিষণ্ণতা গ্রাস করেছে ওদের মুখমণ্ডলকে। তারা তাকিয়ে আছে ডুবন্ত সূর্যের দিকে। ওই সূর্যটা যেন তাদের জীবনেরই প্রতিবিম্ব। মহাসমুদ্র ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে তাকে।

পাল খাটানো হয়ে গেল। নাখোদা, স্বয়ম্ভুনাথের মুখের দিকে তাকালেন নির্দেশের অপেক্ষায়। স্বয়ম্ভুনাথ নির্দেশ দিলেন, 'নোঙোর তোলো।'

কাছিতে টান পড়ল। নোঙর উঠে এল। ময়ূরপঙ্খি একটু কেঁপে উঠল ঠিকই, কিন্তু তক্ষুনি সমুদ্রে ভাসল না। স্বয়ম্ভুনাথদের আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল জোয়ারের জল আর একটু বাড়ার জন্য। যতক্ষণ না মৃচ্ছকটিক জলে ভাসল ততক্ষণ একদৃষ্টে বন্দরের দিকে চেয়ে রইলেন স্বয়ম্ভুনাথ। তাঁর জীবনের সবটুকু জুড়েই তো রয়েছে এই কালিকট নগরী। প্রত্যেকবার মৃচ্ছকটিককে সমুদ্রে ভাসাবার সময় এই নগরীর প্রতি একটা টান অনুভব করেন স্বয়ম্ভুনাথ। কিন্তু আজ যেন সেই টান বড় বেশি অনুভব করলেন তিনি। আস্তে আস্তে এক সময় সূর্য ডুবে গেল সমুদ্রের জলে। আর তারপর ধীরে ধীরে স্বয়ম্ভুনাথের

BanglaBook.org

চোখের সামনে থেকে মুছে গেল কালিকট। আজ আর কেউ বন্দরের আকাশপ্রদীপ জ্বালাল না। নিকষ কালো অন্ধকার গ্রাস করে নিল কালিকট বন্দরকে।

সম্বিত ফিরে পেয়ে স্বয়ম্ভুনাথ এরপর ফিরে তাকালেন সমুদ্রের দিকে। কালিকট বন্দর অন্ধকারে ডুবে গেলেও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে স্বয়ম্ভুনাথ দেখতে পেলেন অনেক দূরে বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। পর্তুগিজ নৌবহরের আলো।

জোয়ারের জল বাড়ছে। ছোট ছোট ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রথমে কাঁপতে শুরু করল মৃচ্ছকটিক। তারপর ধীরে ধীরে সে ভাসতে শুরু করল। হালিরা হাল মেরে সমুদ্রর দিকে ঘুরিয়ে নিল মৃচ্ছকটিকের মুখ। ময়ূরপঙ্খি ভেসে পড়ল অন্ধকার সমুদ্রে। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সমুদ্রের বুকে জেগে থাকা আলোকবিন্দুগুলোর দিকে।

একটা সময় পর্তুগিজ রণপোত গুলোর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেল। স্বয়ম্ভুনাথ প্রথমে মশাল জ্বালাবার নির্দেশ দিলেন। আলোকিত হয়ে উঠল মৃচ্ছকটিকের ডেক। তারপর তা ধরিয়ে দেওয়া হল ডেকের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা জেপাং মেয়েগুলোর হাতে। যাতে দূর থেকেই তাদের চোখে পড়ে পর্তুগিজদের।

মৃচ্ছকটিক, নৌবহরের কাছাকাছি পৌঁছোতেই চাঞ্চল্য শুরু হল রণপোতগুলোর মধ্যে। স্বয়ম্ভুনাথ দেখতে পেলেন পর্তুগিজ জাহাজগুলোর কামানের মুখ ঘুরে যাচ্ছে মৃচ্ছকটিকের দিকে। নড়তে শুরু করেছে জাহাজগুলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারপাশ থেকে নৌবহরের বেশ কয়েকটা হালকা রনপোত ঘিরে ধরল মৃচ্ছকটিককে। পর্তুগিজ জাহাজ থেকে কাঠের পাটাতন এসে পড়ল মৃচ্ছকটিকের ডেকে। সেই কাঠের পাটাতন বেয়ে পর্তুগিজরা লাফিয়ে নামতে লাগল ময়ূরপঙ্খির ডেকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পর্তুগিজদের সূচিমুখ তলোয়ারের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে গেল মৃচ্ছকটিকের নাবিকরা।

লম্বা-চওড়া চেহারার একজন পর্তুগিজ পিস্তল হাতে এসে দাঁড়াল স্বয়ম্ভুনাথ আর নাখোদার সামনে। পাশাপাশি তাঁরা দুজন দাঁড়িয়েছিলেন। যে পর্তুগিজটা সামনে এসে দাঁড়াল তার নাম না জানলেও লোকটা সেবার সম্ভোগের জন্য মৃচ্ছকটিকে এসেছিল। তাই লোকটার মুখ চেনা আছে স্বয়ম্ভুনাথের। স্বয়ম্ভুনাথ লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। লোকটা কিন্তু হাসল না। হাতের পিস্তলটা

BanglaBook.org

তাঁদের দিকে উঁচিয়ে ধরে কর্কশস্বরে বলল, 'তোমাদের কি সামোরিন পাঠিয়েছে?'

স্বয়ম্ভুনাথ জবাব দিলেন, 'না, তিনি আমাকে কালিকট থেকে বিতাড়িত করেছেন। আমি অ্যাডমিরালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

লোকটা জবাব শুনে ধমকের স্বরে বলে উঠল, 'মিথ্যে কথা বলছ। নিশ্চই ওই বুনো সামোরিন কোনও ফন্দি করে তোমাদের এখানে পাঠিয়েছে। সত্যি বলো, নইলে এখনই তোমার মুন্ডু কেটে মাস্তুলের আড়কাঠে ঝুলিয়ে দেব। একটা লোকও বাঁচবে না।'

ঘাবড়ালে চলবে না। স্বয়ম্ভুনাথ বেশ দৃঢ়ভাবে বললেন, 'বললাম তো তিনি আমাদের কালিকট থেকে বিতাড়িত করেছেন।'

নাখোদা জেপাং মেয়েগুলোকে দেখিয়ে বললেন, 'এই জেপাং মেয়েগুলোকে আমরা অ্যাডমিরালের কাছে দিতে এসেছি। তার সঙ্গে আমাদের তেমনই কথা হয়েছিল।'

পর্তুগিজ এবার তাকাল সার বেঁধে মশাল-হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ভীতসন্ত্রস্ত জেপাং রমণীদের দিকে। মনে মনে সে কী যেন ভাবল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'তল্লাসী নাও জাহাজের।'

তাঁর নির্দেশ পালন করে একদল লোক ছুটল জাহাজের খোলের দিকে। স্বয়ম্ভুনাথ তাঁর মুখভঙ্গিতে কোনও উত্তেজনার ভাব প্রকাশ না করলেও যতক্ষণ না পর্তুগিজদের দলটা খোল ছেড়ে উপরে উঠে এল ততক্ষণ আশঙ্কায় কাঁপতে লাগল তাঁর বুক। যদি কোনওভাবে পর্তুগিজরা সেই গুপ্ত কক্ষের সন্ধান পেয়ে যায় তবে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটবে।

তবে তেমন কিছু ঘটল না। পর্তুগিজদের দলটা খোল থেকে ফিরে এসে জানাল, না, তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। তাদের কথা শুনে দলপতি যেন কিছুটা আশ্বস্ত হল। স্বয়ম্ভুনাথকে সে বলল, 'এই সামান্য ব্যাপারে এখন অ্যাডমিরালকে বিরক্ত করা যাবে না। এই নৌবহরের দায়িত্বে আছেন এস্তাভাও-ডা-গামা। তাঁকে আমরা খবর পাঠাচ্ছি। তিনি এসে তোমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। মনে রেখো, তোমরা যদি কোনও চালাকির চেষ্টা করো তবে মৃত্যু নিশ্চিত।'

এ কথা বলার পর লোকটা তার এক অনুচরকে কিছু একটা বললেন, দলপতির নির্দেশে লোকটা একটা মশাল নিয়ে তরতর করে উঠে গেল মলচ্ছকটিকেরও প্রধান মাস্তুলের মাথায়। তারপর সমুদ্রের এক অন্ধকার

BanglaBook.org

অংশের দিকে মশাল নাড়িয়ে সংকেত দিতে শুরু করল। কিছু সময়ের ব্যবধান। আর তার পরই সমুদ্রের অন্ধকারের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল বিরাট এক রণপোত। এতক্ষণ তা অন্য জাহাজগুলোর থেকে কিছুটা তফাতে অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল। ঠিক যেমন আরও বেশ কিছুটা দূরে অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে ভাস্কোর মূল নৌবহর। শুধু মৃচ্ছকটিককে যে-চারটে জাহাজ ঘিরে ধরেছে তাতেই শুধু মশালের আলো জ্বালানো ছিল।

অন্ধকার থেকে আবির্ভূত জাহাজটা এসে দাঁড়াল মৃচ্ছকটিকের অন্য পাশে। এবার সে জাহাজেও সার সার মশাল জ্বলে উঠল। তার ডেকভর্তি সশস্ত্র পর্তুগিজ সেনা। সে জাহাজ থেকেও পাটাতন ফেলা হল মৃচ্ছকটিকে। পাটাতনের ঢাল বেয়ে একদল পর্তুগিজকে সঙ্গে নিয়ে মৃচ্ছকটিকের ডেকে পা রাখলেন এস্তাভাও। তাঁর পরনে ঝলমল করছে রাজকীয় পোশাক। বুকে আড়াআড়িভাবে আটকানো চামড়ার বেল্ট থেকে ঝুলছে রুপোর বাঁট আর লম্বা নলঅলা পিস্তল, কোমর থেকে ঝুলছে দীর্ঘ তলোয়ার। তিনি মৃচ্ছকটিকে পদার্পণ করতেই পূর্বোক্ত সেই পর্তুগিজ দলপতি তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে মাথার টুপি খুলে সম্ভাষণ জানাল তাঁকে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল তাদের দুজনের মধ্যে। তারপর ডাক পড়ল স্বয়ম্ভুনাথের। দুজন পর্তুগিজ তলোয়ারের খোঁচা দিয়ে স্বয়ম্ভুনাথকে এনে দাঁড় করাল এস্তাভাওর সামনে। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন স্বয়ম্ভুনাথ। এবার তাঁকে জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে।

ভাস্কোর ভাইপো, তাঁর তৃতীয় নৌবহরের সেনাপতি এস্তাভাও ভালো করে একবার দেখলেন স্বয়ম্ভুনাথকে। তারপর তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন। 'তোমাকে জেপাং নারী সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ঠিক। কিন্তু এই যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে তুমি এখন তাদের আমাদের হাতে তুলে দিতে এলে কেন? বিশেষত যখন আমরা এখন তোমার শত্রুপক্ষ?

স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'অ্যাডমিরালের কথামতো জেপাং দ্বীপ থেকে নারী সংগ্রহ করে গতকালই আমি ফিরেছিলাম কালিকটে। কিন্তু বন্দরে পৌঁছোবার পর নাবিকেরা হয়তো কারও কাছে গল্প করেছিল মাঝসমুদ্রে অ্যাডমিরালের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা, তাঁর জন্য জেপাং থেকে নারী সংগ্রহের কথা। এবং এসব কথা গুপ্তচর মারফত পৌঁছে যায় সামোরিনের কানে। তিনি আমাকে

BanglaBook.org

ডেকে পাঠান। সামোরিন ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়েছেন অ্যাডমিরালের জন্য নারী সংগ্রহের ব্যাপারে। তিনি আমাকে আগামীকাল সূর্যোদয়ের পূর্বে জেপাং নারীসমেত কালিকট বন্দর ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি বন্দর ত্যাগ না করলে আমার মুন্ডুচ্ছেদ করা হত।'

এস্তাভাও বললেন, 'তুমি তো গণিকালয়ের ব্যবসা করো। গণিকা সংগ্রহ করা তোমার পেশা। তাছাড়া তোমার সঙ্গে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল তখন আমরা কালিকটে পৌঁছোইনি। বুনো সামোরিনের সঙ্গে আমাদের ঝগড়াও শুরু হয়নি। তোমার দোষটা কোথায় ছিল? সামোরিনকে এ-কথা বোঝাওনি?'

স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'সে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। আসলে আমার সঙ্গে কয়েকজন ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক কারণে বিরোধ আছে। আমার অনুপস্থিতিকালে বেশ কয়েকবার বন্দরস্থিত আমার বেশ্যালয় দখল করার চেষ্টা করেছিল। সেই আরব ব্যবসায়ীরা এবার অ্যাডমিরালের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যাপারটাকে হাতিয়ার করে সামোরিনকে ভুল বুঝিয়েছে। তারা সামোরিনকে বলেছে, আমি নাকি তোমাদের গুপ্তচর। ইতিমধ্যেই সামোরিন আমার গণিকালয় ও সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এক আরব ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।'

'আরব' শব্দটা শুনে এস্তাভাও যেন প্রচণ্ড ঘৃণায় বলে উঠলেন, 'তোমার জাহাজে কোনও আরব নেই তো?'

স্বয়ম্ভুনাথ জবাব দিলেন 'না, নেই। আপনি খুঁজে দেখতে পারেন। আমি

BanglaBook.org

অনেক কষ্টে কয়েকজন ভিন্ন ধর্মের নাবিক সংগ্রহ করে ময়ূরপঙ্খি জলে ভাসিয়েছি।'

এস্তাভাও প্রথমে স্বগতোক্তি করলেন, 'আরবরাই বুনো সামোরিনের ধ্বংসের কারণ হবে।' তারপর তিনি বললেন, 'তুমি এখন আমাদের কাছে কী চাও? আশ্রয়?'

স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'না, আশ্রয় নয়। আমি বণিক। ব্যবসা আমার কাছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। অ্যাডমিরাল আমাকে এই নারীদের জন্য অর্থ দিয়েছিলেন। তাই তোমাদের কাছে এলে আমার বিপদ হতে পারে জেনেও আমি জেপাং নারীদের তোমাদের হাতে তুলে দিতে এসেছি। আমি কখনও ব্যবসায়িক চুক্তির খেলাপ করি না। এদের তোমাদের হাতে দিয়ে আমি অন্যত্র চলে যাব। পরিস্থিতি যদি কোনও দিন স্বাভাবিক হয় তবে আবার কালিকটে ফিরব।'

এস্তাভাও বললেন, 'তুমি তো তোমার সঙ্গে এই নারীদের নিয়ে যেতে পারো? পরিস্থিতি খুব দ্রুত স্বাভাবিক হবে বলে আমাদের ধারণা। কালিকট দখল করতে আমাদের দু-তিন দিনের বেশি সময় লাগবে না। তারপর ফিরে এসে এই নারীদের আমার হাতে তুলে দিতে পারো।'

স্বয়ম্ভুনাথ জবাব দিলেন, 'আপনারা তিনদিনে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটাবেন বললেও মাসাধিক কালও কিন্তু লাগতে পারে। বিশেষত আরব ব্যবসায়ীরা আপনাদের প্রতিরোধ করার জন্য তৈরি হচ্ছে। আমি নিঃসম্বল অবস্থায় জলে জাহাজ ভাসিয়েছি। দক্ষিণে কোথায়, কোন বন্দরে আশ্রয় পাব জানা নেই। এতজন নারীকে বহন করা বা তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

স্বয়ম্ভুনাথের কথা শুনে এস্তাভাও-এর চোখের সামনে ভেসে উঠল মেরি জাহাজের সেই দৃশ্য! জ্বলন্ত মেরির ডেকে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত কীভাবে লড়াই চালিয়েছিল আরব মেয়েরাও! এস্তাভাও মুখে তিনদিনে কালিকট দখল করার কথা বললেও কতদিনে তারা এই বন্দরনগরী দখল করবেন তা নিয়ে স্বয়ং অ্যাডমিরাল ভাস্কোর মনেই সন্দেহ আছে। এস্তাভাও জানতে চাইলেন, 'নগরীতে সৈন্যসংখ্যা কত?'

সামরিক ব্যাপারে কোনও খোঁজ রাখেন না স্বয়ম্ভুনাথ। তবে তিনি জবাব দিলেন, 'দশ হাজার।'

'কামানের সংখ্যা?'

BanglaBook.org

'একশো।'

'তিরন্দাজ?'

আর বানিয়ে না বলতে পেরে স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'আরব তিরন্দাজ আছে। তবে সংখ্যা জানা নেই।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন এস্তাভাও। হয়তো তিনি মনে মনে হিসাব কষলেন যে, লোকটার কথা যদি সত্যি হয় তবে কালিকটের সামরিক শক্তির সঙ্গে ভাস্কোর নৌবহর এঁটে উঠতে পারবে কিনা। লোকটা যা বলল সে-খবর দ্রুত ভাস্কোকে পৌঁছে দেওয়া দরকার।

এস্তাভাও এরপর শেষ প্রশ্ন করলেন, 'যদি আমরা এখন জেপাং-নারীদের না নিই তবে তুমি কী করবে?'

'ওদের সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। এছাড়া আমার আর কিছু করার নেই।' স্পষ্ট জবাব দিলেন স্বয়ম্ভুনাথ।

জেপাং নারী পর্তুগিজ নাবিকদের কাছে খুব আকর্ষণীয়। ইতিমধ্যেই ডেকে দাঁড়ানো পর্তুগিজ নাবিকরা লোলুপদৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করেছে ডেকে দণ্ডায়মান নারীদের দিকে। মুখে কিছু না বললেও তাদের একান্ত ইচ্ছা, এই নারীদের তুলে নেওয়া হোক পর্তুগিজ জাহাজে। তাছাড়া স্বয়ং অ্যাডমিরালও এই নারীদের সংগ্রহ করার জন্য টাকা লগ্নি করেছেন। কাজেই এস্তাভাও শেষ পর্যন্ত বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা ওদের আমাদের জাহাজে তুলে নিচ্ছি। তবে একটা কথা মনে রেখো, এ ব্যাপারে যদি কোনও চাতুরী থেকে থাকে তবে আমাদের সঙ্গে তোমার তৃতীয় সাক্ষাৎই কিন্তু শেষ সাক্ষাৎ হবে।'

স্বয়ম্ভুনাথ হেসে বললেন, 'আমাকে তো তৃতীয়বারের জন্য সাক্ষাৎ করতে হবেই। অ্যাডমিরাল যে অর্থ আমাকে প্রদান করেছিলেন তার থেকে অধিক অর্থমূল্যে এই জেপাং নারীদের ক্রয় করেছি আমি। আমি সেই অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য তো আসবই।'

স্বয়ম্ভুনাথের কথা শুনে হেসে ফেললেন এস্তাভাও। সত্যি লোকটার সাহস আছে! অথবা লোকটার মাথায় গন্ডগোল আছে! নারীদের নিজেদের জাহাজে তোলার পর লোকটাকে যে তিনি মেরে ফেলছেন না, এটা তার পরম সৌভাগ্য। তার ওপর আবার লোকটা বকেয়া অর্থর দাবি জানিয়ে রাখছে!

এস্তাভাও অবশ্য মুখে কিছু বললেন না। জেপাং-নারীদের তাঁর জাহাজে তোলার নির্দেশ দিয়ে মৃচ্ছকটিকের ডেক ত্যাগ করে কাঠের পাটাতন বেয়ে

BanglaBook.org

জাহাজে উঠে পড়লেন।

লোলুপ পর্তুগিজ নাবিকের দল সেই নারীদের মহা-উৎসাহে নিয়ে চলল এস্তাভাওর জাহাজে। না, তরোয়ালের খোঁচায় নয়। জাপ্টে ধরে। পর্তুগিজ নাবিকদের কর্কশ হাত সেইসময়টুকুর মধ্যেই ছুঁয়ে যেতে লাগল জেপাং রমণীদের অর্ধ বিম্বের মতো চাপা বর্তুল স্তন, নিজস্ব স্পর্শ সুখের জন্য। শেষ নারীকে পর্তুগিজ জাহাজে তুলে ফেলার পর মৃচ্ছকটিক ত্যাগ করল পর্তুগিজ নাবিকরা। দু-পাশের রণপোত থেকে ফেলা কাঠের পাটাতনও সরিয়ে ফেলা হল। প্রথমে এস্তাভাওর রণতরী রওনা হল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। তারপর একে একে অন্য চারটে জাহাজও সরে দাঁড়াল মৃচ্ছকটিকের পাশ থেকে। নাখোদা নোঙর তুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। বাতাসে ফুলে উঠতে শুরু করেছে পাল। মৃচ্ছকটিক ভেসে পড়ল সমুদ্রে। মশালগুলো নিভিয়ে দেওয়া হল।

এস্তাভও এগোচ্ছিলেন ভাস্কোর জাহাজের দিকে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর একটা ব্যাপার মনে হল। গণিকা ব্যবসায়ীকে ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হল? অ্যাডমিরালের সামনে তাকে হাজির করানো উচিত ছিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা তিনিই নিতেন। কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভাবলেন, ময়ূরপঙ্খিটা নিশ্চই এখনও বেশি দূরে যেতে পারেনি। তাঁর দ্রুতগামী রণপোত নিশ্চই ধরে আনতে পারবে তাকে। সেটা করাই ভালো। এস্তাভাও তাঁর রণতরীর মুখ ঘোরাবার নির্দেশ দিলেন মৃচ্ছকটিককে ধরার জন্য।

চাঁদ উঠে গেছে। নক্ষত্ররাজী ঝিকমিক করতে শুরু করেছে সমুদ্রর আকাশে। তারাঘেরা-রাতে বেশ অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। পালেও বাতাস লেগেছে। বাতাস মৃচ্ছকটিককে নিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট দিকে। ছোট ছোট ঢেউ-এর দোলায় মৃচ্ছকটিক উঠছে-নামছে। দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। হালিরা শুধু হাল ধরে বসে আছে সঠিক দিশায় ময়ূরপঙ্খিকে চালিত করার জন্য।

স্বয়ম্ভুনাথ আর নাখোদা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন ডেকে। নাখোদা বললেন, 'যাক, এ-যাত্রায় রক্ষা পাওয়া গেল। আশা করি কাল সূর্যোদয়ের প্রাক মুহূর্তেই আমরা বৃশ্চিক দ্বীপে নোঙর করতে পারব। বাতাসের গতি তেমনই ইঙ্গিত বহন করছে।'

স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'দেখা যাক, বৃশ্চিক দ্বীপের অধিবাসীরা আমাদের কেমন আপ্যায়ন করে? তবে কালিকটে আর কোনওদিন ফিরতে পারব কিনা

BanglaBook.org

কে জানে!'

এরপরই স্বয়ম্ভুনাথের খেয়াল হল মৎস্যগন্ধার কথা। সত্যিই কি এবারও তিনি ওই মেয়েটার জন্য দুর্যোগমুক্ত হলেন? মৎস্যগন্ধার কথা মনে পড়তেই তিনি ভাবলেন এবার তাদের সেই গোপন কক্ষ থেকে বাইরে বের করে আনা যাক। খোলে নামবার সিঁড়ির দিকে এগোতে যাচ্ছিলেন তিনি। ঠিক সেই সময় প্রধান মাস্তুলের ওপরে বসে থাকা একজন মাল্লা চিৎকার করে উঠল, 'জাহাজ, একটা জাহাজ আসছে!'

লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করে স্বয়ম্ভুনাথ আর নাখোদা তাকালেন সেদিকে। চাঁদের আলোতে অনেকদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, একটা জাহাজ খুব দ্রুত দূর থেকে এগিয়ে আসছে তাঁদের দিকে!

জাহাজটার গতি আর চার থাক পাল দেখে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নাখোদা বলে উঠলেন, 'আরে, ওটা তো পর্তুগিজ রণপোত! সম্ভবত পর্তুগিজ সেনাপতি এস্তাভাওর জাহাজ ওটা!'

স্বয়ম্ভুনাথও একই অনুমান করলেন। তিনি বলে উঠলেন, 'সম্ভবত ওরা কোনও কিছু সন্দেহ করেছে। আমাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্য আসছে অথবা জাহাজ ডুবিয়ে দেবার জন্য আসছে! পালাতে হবে!

নাখোদা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, 'দাঁড় মারো, দাঁড় মারো! পর্তুগিজরা আমাদের ধাওয়া করেছে!'

নাখোদার নির্দেশে একসঙ্গে অনেকগুলো দাঁড় পড়তে লাগল জলে। যথাসম্ভব দ্রুত জল কেটে এগোতে লাগল মৃচ্ছকটিক। পর্তুগিজরাও বুঝতে পারল যে ময়ূরপঙ্খিটা পালাচ্ছে। নৌপোতের গতিবেগ বাড়িয়ে দিল তারা। ডেকে দাঁড়িয়ে এস্তাভাও নির্দেশ দিলেন, 'গোলা সাজাও। কিছুতেই ওদের পালাতে দেওয়া যাবে না। নিশ্চই ওরা কোনও ব্যাপারে ফাঁকি দিয়েছে! নইলে আমাদের দেখে ওরা পালাচ্ছে কেন?'

মৃচ্ছকটিক যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে পালাবার চেষ্টা করলেও দ্রুত কমে আসতে লাগল পর্তুগিজদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান। মৃচ্ছকটিকের থেকে অনেক বেশি দ্রুতগামী পর্তুগিজ রণপোত। একসময় পর্তুগিজ রণতরীর কামানের পাল্লার মধ্যে এসে গেল ময়ূরপঙ্খি। যদি ময়ূরপঙ্খিটাকে আত্মসমর্পণ করানো যায় সেজন্য প্রথমে সমুদ্রে গোলা নিক্ষেপ করতে বললেন এস্তাভাও। গর্জে উঠল পর্তুগিজ কামান। জ্বলন্ত অগ্নি গোলক মৃচ্ছকটিকের মাথায় ওপর দিয়ে

BanglaBook.org

উড়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ল। ব্যাপারটাতে মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে দাঁড় টানা বন্ধ করল দাঁড়িরা। তাই দেখে নাখোদা আবার চিৎকার করে উঠলেন 'দাঁড় টানো, দাঁড় টানো। আত্মসমর্পণ করলেও ওরা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে।'

কথাটা শুনেই দাঁড়ি নাবিকরা তাদের উল্কি-আঁকা পেশিবহুল হাত দিয়ে আরও দ্রুত দাঁড় ফেলতে লাগল। তাই দেখে এস্তাও বুঝতে পারলেন, ময়ূরপঙ্খিটা ধরা দেবে না। তাই তিনি পলায়মান জাহাজ লক্ষ্য করতে গোলা ছোড়ার নির্দেশ দিলেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একসঙ্গে তিনটে কামান গর্জে উঠল। দুটো গোলা লক্ষ ভ্রষ্ট হলেও একটা গোলা প্রধান মাস্তুলের পালে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পালে আগুন লেগে গেল। মাস্তুলের আড়কাঠে যে বসেছিল সে জ্বলন্ত অবস্থায় ছিটকে পড়ল জলে। মৃচ্ছকটিকের ডেকে একটাই ছোট কামান ছিল জলদস্যুদের আটকাবার জন্য। কিছু গোলাও মজুত ছিল। এক নাবিক সেই কামান দেগে দিল পর্তুগিজ রণপোতকে লক্ষ্য করে। এবং কাকতালীয়ভাবেই সে-গোলা গিয়ে আছড়ে পড়ল একবারে এস্তাভাও-এর ডেকের মাঝখানে। তার আঘাতে শেষ হয়ে গেল দু-জন পর্তুগিজ। ছোট কামানের গোলা এর থেকে বেশি ক্ষতি না করতে পারলেও এই প্রত্যাঘাতে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেলেন এস্তাভাও। ময়ূরপঙ্খির কামানের পাল্লার বাইরে যাবার জন্য তিনি প্রথমে তাঁর জাহাজের গতি কিছুটা মন্থর করে দিলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই একসঙ্গে বেশ কয়েকটা কামানের গোলা আছড়ে পড়ল মৃচ্ছকটিকে। তার মধ্যে একটা গোলা ময়ূরপঙ্খির সামনের অংশের ময়ূরের গ্রীবাটা ভেঙে দিল। মৃচ্ছকটিক থেকে আবারও গোলা ছোড়া হল বটে কিন্তু সে-গোলা পর্তুগিজ রণতরী পর্যন্ত পৌঁছোল না। ভগ্নগ্রীবা ময়ূরপঙ্খির ডেকে এবার আগুন ধরে গেল। গোলার আঘাতে কিছুক্ষণের মধ্যে ভেঙে গেল মাস্তুলও। স্লথ হয়ে গেল মৃচ্ছকটিকের গতি।

নাখোদা পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্বয়ম্ভুনাথকে বললেন, 'শেষ রক্ষা আর হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ ডুবে যাবে। আপনি খোলে গিয়ে গুপ্তকক্ষ থেকে নৌকো নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়ুন। তাতে যদি কোনওভাবে বাঁচতে পারেন।'

স্বয়ম্ভুনাথ বললেন, 'আপনিও চলুন।'

BanglaBook.org

নাখোদা বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'না, আমি জাহাজ ছেড়ে যাব না। আমি জাহাজের নাখোদা। দাঁড়ি-হালিদের ছেড়ে আমি যাব না। এরা যত খারাপই হোক না কেন, নাখোদা কখনও জাহাজের অন্য কর্মীদের ফেলে পালায় না। আমি শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে ডেকে দাঁড়িয়ে থাকব। নাখোদাদের সমুদ্রের বুকে মৃত্যু গৌরবের ব্যাপার।'

নাখোদার কথা শুনে তবুও ইতস্তত করতে লাগলেন স্বয়ম্ভুনাথ। একটা কামানের গোলা এসে আছড়ে পড়ল তাঁদের কাছেই। নাখোদা এবার বলে উঠলেন, 'আর দেরি করবেন না। যা বলছি, তাই করুন। এরপর খোলেও আগুন ছড়াচ্ছে। আর দেরি করলে আপনি বাঁচবেন না। অনেক বছর নুন খেয়েছি আপনার। দোহাই আপনার, পালান।'

স্বয়ম্ভুনাথ আর দেরি করলেন না। শেষবারের জন্য তিনি একবার হাত রাখলেন নাখোদার কাঁধে। তারপর ছুটলেন খোলের ভিতর। ধোঁয়া তখন ডেকের ওপর থেকে খোলেও প্রবেশ করেছে। সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে আসছে। হাতড়ে হাতড়ে স্বয়ম্ভুনাথ পৌঁছে গেলেন নির্দিষ্ট জায়গাতে। দেওয়ালের গায়ের পাটাতন সরিয়ে ফেললেন। সেই গুপ্তকক্ষের ভিতর তিনটে প্রাণী তখন ধোঁয়াতে দম বন্ধ হয়ে মরতে বসেছিল। স্বয়ম্ভুনাথ সেই কক্ষে প্রবেশ করেই উল্টোদিকের গুপ্ত দরজা খুলে ফেললেন। বাইরেই সমুদ্র। সামোরিনের সেই পেটিকা আর মৎস্যগন্ধাকে তিনি তুলে ফেললেন নৌকোতে। বানরটাও চড়ে বসল তাতে। তারপর স্বয়ম্ভুনাথ আর ভর্তিকা দুজনে মিলে নৌকোটাকে ঠেলে খোল থেকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন। তাঁরা নিজেরাও এরপর বাইরে বেরিয়ে কয়েক হাত সাঁতরে সেই ছোট নৌকোতে গিয়ে উঠলেন। মুহুর্মুহু গোলা এখন আছড়ে পড়ছে মৃচ্ছকটিকের গায়ে, তার আশেপাশের সমুদ্রে। একটা গোলা ছোট্ট নৌকাটার গায়ে এসে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সেটা। ময়ূরপঙ্খির ডেকে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। কালো ধোঁয়ার বলয় সৃষ্টি হয়েছে তার চারপাশ ঘিরে। সেই ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে স্বয়ম্ভুনাথ আর ভর্তিকা সেই ছোট্ট নৌকার দাঁড় টানতে শুরু করলেন গভীর সমুদ্রের দিকে। মৃচ্ছকটিক থেকে দূরে সরে যাবার আগে স্বয়ম্ভুনাথ শেষ একবার তাকালেন তার সাধের ময়ূরপঙ্খির দিকে। গোলাবর্ষণের মধ্যেই ডেকের রেলিং ধরে অগ্নিকুণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে স্থির অবিচল একটা অবয়ব। আসন্ন মৃত্যুকে যেন সে ব্যঙ্গ করছে। ধন্য নাবিকের জীবন, ধন্য নাখোদার

BanglaBook.org

জীবন। তিনি মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও মাথা নত করলেন না। ধোঁয়া আর অন্ধকারের মধ্যে পর্তুগিজদের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগল নৌকাটা। অনেকটা দূরে চলে যাবার পর হঠাৎ স্বয়ম্ভুনাথের পিছনের আকাশটা হঠাৎ যেন লাল হয়ে উঠল, একটা অস্পষ্ট জলোচ্ছ্বাসের শব্দও যেন শোনা গেল। স্বয়ম্ভুনাথ বুঝতে পারলেন বিস্ফোরণ ঘটার পর সমুদ্রে তলিয়ে গেল তাঁর সাধের মৃচ্ছকটিক। দাঁড় বাইতে লাগলেন স্বয়ম্ভুনাথ। তবে সেই বৃশ্চিক দ্বীপের দিকে নয়, যা অবস্থা তাতে সে-পথ ধরলে আবার পর্তুগিজদের হাতে তাঁদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। তিনি এগোলেন মাঝ-সমুদ্রের দিকে। কিন্তু শেষ রাতের দিকে স্বয়ম্ভুনাথের হাতদুটো যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল। প্রচণ্ড যন্ত্রণাও শুরু হল তাঁর বুকে।

পরদিন দুপুরে একটা ছোট জাহাজ উদ্ধার করল তাদের। বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের জাহাজ সেটা। জাহাজ না বলে তাকে বড় নৌকা বলাই ভালো। বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন করে ঘরে ফিরছেন তাঁরা। এক মঠাধ্যক্ষ ও তার কয়েকজন শিষ্য। চারটে প্রাণী আর সিন্দুকটাকে বৌদ্ধদের নৌকায় তুলে নেওয়া হলেও স্বয়ম্ভুনাথ তখন মৃত্যুপথযাত্রী। কথা বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। শেষ কটা দিন কোন অজানা আত্মীয়তায় তাঁর পাশে সবসময় বসে থাকত মৎস্যগন্ধা। বোবা দৃষ্টিতে তারা দুজন চেয়ে থাকত দুজনের দিকে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাঁদের সাধ্যমতো আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন স্বয়ম্ভুনাথকে বাঁচাবার জন্য। ঘৃত-ওষধী লেপন করেছিল তাঁর বুকে। কিন্তু তাদের চেষ্টা বিফলে গেল। শেষক্ষণ ঘনিয়ে এল স্বয়ম্ভুনাথের জীবনে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মঠাধ্যক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কিছু বলে যেতে চান?'

প্রশ্ন শুনে স্বয়ম্ভুনাথ তাঁর কাঁপা কাঁপা হাতটা তুলে প্রথমে নির্দেশ করলেন তাঁর শয্যার পাশে রাখা সামোরিনের সেই পেটিকার দিকে, তারপর অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন মৎস্যগন্ধার দিকে। আর এরপরই স্বয়ম্ভুনাথের হাতটা খসে পড়ল। চোখ বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। পরমুহূর্তেই একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল মৎস্যগন্ধার গলা থেকে।

স্বয়ম্ভুনাথ হিন্দু। হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী তাঁকে দাহ করারই নিয়ম। কিন্তু মাঝসমুদ্রে যে কাজ সম্ভব নয়। তাই তার মুখে একটা জ্বলন্ত কাঠকয়লা পুরে দেহটাকে ভাসিয়ে দেওয়া হল সমুদ্রে। হয়তো বা জলের নীচে আবার তাঁর মিলন হবে মৃচ্ছকটিকের সঙ্গে। স্বয়ম্ভুনাথের আর কালিকটে ফেরা হল না।

BanglaBook.org

কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি জেনে যেতে পারলেন না যে, শেষ পর্যন্ত ভাস্কো কালিকট দখল করতে পারেননি। তাঁর সঙ্গে এস্তাভাও-এর সাক্ষাতের পরদিন সকাল থেকে পর্তুগিজরা কালিকট বন্দরের ওপর গোলা বর্ষণ শুরু করেছিল ঠিকই, হয়তো তারা দখলও করে নিত কালিকট, কিন্তু ভাস্কো, এমনকী স্বয়ং সামোরিনেরও জানা ছিল না যে, মেরি জাহাজের নিরীহ হজযাত্রীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে আরবদের এক বিশাল নৌবহর এগিয়ে আসছে। সেই নৌবহরের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা পর্তুগিজ নৌবহরের ছিল না। তারা প্রায় চক্রব্যূহে বেঁধে ফেলেছিল পর্তুগিজ অ্যাডমিরালকে। সহকারী ভিনসেন্ট সোদ্রের বুদ্ধিমত্তায় ভাস্কো শেষ মুহূর্তে প্রাণে বেঁচে গিয়ে রওনা হয়েছেন পর্তুগালের দিকে, বলা ভালো পালিয়ে যাচ্ছেন। এদেশে তার এই দ্বিতীয় অভিযানের শেষে জনাকুড়ি আরবকে মাঝসমুদ্রের এক জাহাজ থেকে বন্দি করে পর্তুগাল নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর তেমন কিছুই নিয়ে যেতে পারছেন না ভাস্কো এমনকী জেপাং নারীদেরও নয়; সে জাহাজের দখল নিয়েছে আরবরা। আর ফিরে যাবার সময় ভাস্কো এদেশের মানুষের কাছে রেখে গেলেন তাঁর উন্মত্ত-হিংস্র-নিষ্ঠুর এক মূর্তি। যে দানবীয় মূর্তি মেরির নিরপরাধ শিশুদের মৃত্যু দেখে অট্টহাস্য করেছিল, ধীবরদের মুন্ডু কেটে দেহগুলোকে পর্তুগিজ জাহাজের মাস্তুলের আড়কাঠে টাঙিয়েছিল, দখল করার চেষ্টা করেছিল কালিকট বন্দর।

স্বয়ম্ভুনাথের দেহ অন্তিম সংস্কারের পর বৌদ্ধ শ্রমণদের নৌকাটা মৎস্যগন্ধাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করল। না, সে-জায়গা কালিকট বন্দর নয়, কালিকট থেকে বহু দূরে হাজার বছরের প্রাচীন এক বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হল তাঁরা। যেখানে আছে তাঁদের প্রাচীন মঠ। সে-মঠ সেই প্রাচীন বন্দরের থেকেও প্রাচীনতম।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পর্ব

৭

'নাবিকদের বন্দরে বন্দরে স্ত্রী থাকে'—এ প্রবাদ নাবিকদের সম্বন্ধে চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। স্ত্রী অর্থাৎ শয্যাসঙ্গিনী-বন্দর সুন্দরী—বন্দর-বেশ্যার দল। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার শেষে যখন বন্দরে জাহাজ এসে ভেড়ে তখন যারা নাবিকদের রোদে পোড়া, সমুদ্রের নোনা বাতাসে মৃতমানুষের দেহের মতো চামড়া খসখসে হয়ে যাওয়া দেহগুলোকে আলিঙ্গন করে, নাবিকদের দেহগুলোকে তৃপ্ত করে। কখনও কখনও বন্দর সুন্দরীরা ক্ষণিকের তরে কোনও অচেনা অজানা নাবিককে ভালোওবেসে ফেলে, অথবা ভালোবাসার অভিনয়ও করে। অভিনয় হলেও অবশ্য তাতে তেমন কোনও ক্ষতি হয় না নাবিকদের। সে তো আর সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না বন্দর সুন্দরীকে। কিছুদিনের জন্য নাবিকের দেহ, হয়তো বা মনও বিনিময় হয় সেই বন্দর সুন্দরীর সঙ্গে। তারপর নাখোদা বা জাহাজের মালিক-নায়ক একদিন জানিয়ে দেন, 'কাল ভোরে জাহাজ ছাড়বে।' ভিনদেশী নাবিক তার সঙ্গিনীর আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে আবার জলে নেমে পড়ে। নাবিকের কাছে সমুদ্রের ডাক অগ্রাহ্য করা বড় কঠিন। হয়তো দিনের শেষে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে নাবিকের প্রথম কয়েকটা দিন মনে পড়ে তার বন্দর কালের কথা, সেই বন্দর সুন্দরীর কথা; তারপর ধীরে ধীরে সমুদ্রর

BanglaBook.org

নোনা বাতাস আর নাবিকের কঠিন পরিশ্রমের জীবন নাবিকের স্মৃতি থেকে মুছে ফেলে সেই বন্দর সুন্দরীকে। জাহাজ এগিয়ে চলে, পাড়ি দেয় নতুন কোনও বন্দরের উদ্দেশে। যেখানে অচেনা অজানা কোনও বন্দর সুন্দরী প্রতীক্ষা করে আছে তার জন্য।

আর সেই বন্দর সুন্দরী, যাকে ছেড়ে এল সেই নাবিক? সে যদি নাবিককে ক'দিনের জন্যেও সত্যি ভালোবেসে থাকে তবে বন্দর ছেড়ে চলে যাওয়া, সমুদ্রর বুকে ক্রমশ ছোট হতে হতে হারিয়ে যাওয়া জাহাজটার দিকে তাকিয়ে গোপনে একবার চোখ মোছে। বন্দর সুন্দরীদের কাঁদতে নেই। তাই সবার অলক্ষ্যে চোখ মুছে সে আবারও সুন্দরী হয়ে ওঠে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে নতুন কোনও নাবিকের প্রতীক্ষায়।

'যে বন্দরে বেশ্যালয় নেই সেটা কোনও বন্দরই নয়'। একথা নাবিকদের মুখে মুখে ফেরে। 'বন্দর' আর 'বেশ্যালয়' শব্দদুটো তাদের কাছে সমার্থক। তাই প্রতি বন্দরেই অসংখ্য না হলেও অন্তত একটা বেশ্যালয় থাকবেই। বন্দর-গণিকাদের এই আস্তানাগুলো যেমন ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে ওঠে, তেমন কোথাও কোথাও ওঠে রাজা বা স্থানীয় জমিদারের অর্থানুকুল্যে। কারণ এ ব্যবসায় মুনাফা প্রচুর। নাবিকের জীবন পদ্মপাতায় জলের মতো। একবার সমুদ্রে ভাসলে আবার কোনওদিন মাটিতে পা রাখতে পারবে কিনা জানা থাকে না কারোরই। যে-কোনও মুহূর্তে সমুদ্রে ঝড় উঠতে পারে, জলদস্যু বা শত্রুজাহাজ হানা দিতে পারে, সামুদ্রিক রোগ কেড়ে নিতে পারে জীবন। সমুদ্রের নোনা বাতাসও অনেক সময় হিংস্র করে তোলে নাবিকদের। মুহূর্তের মনোমালিন্যে জাহাজের ডেকে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে পড়ে দুজন নাবিক। যারা একটু আগেই হাতে হাত মিলিয়ে পালের দড়ি খাটিয়েছিল বা পাশাপাশি বসে দাঁড় টানছিল, মুহূর্তের বচসায় তারা হয়ে ওঠে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আস্তিনের নীচ থেকে বেরিয়ে আসে তীক্ষ্ণ জাহাজি ছুরি অথবা বুকে ঝোলানো খাপ থেকে লম্বা চোঙার মতো নলঅলা বারুদ-ঠাসা পিস্তল। অন্য নাবিকরা যুযুধান দু-পক্ষের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করে এ-লড়াই। যতক্ষণ না একজন নাবিকের মৃতদেহটা ডেক থেকে সমুদ্রের জলে ছুড়ে ফেলে দেবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ লড়াই চলতে থাকে। এভাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদেও অনেকের মৃত্যু ঘটে। কাজেই যতক্ষণ তারা বন্দরে থাকে ততক্ষণ তারা জীবনটাকে চেটেপুটে উপভোগ করে নেয়। তারা তখন শুধু

BanglaBook.org

বর্তমানের কথা ভাবে, ভবিষ্যতের কথা ভাবে না। বিশেষত, সেই সব নাবিকরা, যাদের কোথাও কোনও ঘরবাড়ি নেই, পরিজন বলে কেউ কোথাও নেই, শুধু সমুদ্র আর এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে ভাসতে ভাসতে জীবনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়াই যাদের কাজ তারা অনেক সময় জাহাজ থেকে পাওয়া সর্বস্বও তুলে দেয় বন্দরের গণিকালয়ের মালিক বা মালকিনদের কাছে।

পালতোলা পর্তুগিজ জাহাজটা এগিয়ে চলছিল বন্দরের দিকে। এ-বন্দর পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বন্দর। এতটাই প্রাচীন যে এই বন্দরের কথা পুরাণগ্রন্থেও উল্লেখ আছে। এখানকার রাজা তাম্রধ্বজ নাকি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙা ছুঁয়ে গেছিল এ-বন্দর, এখান থেকেই একদিন বোধিবৃক্ষের চারা নিয়ে সিংহলে যাত্রা করেছিলেন অশোক সন্তান। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ মহাবংশে উল্লেখিত, চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ যার টানে ছুটে এসেছিলেন, যার নাম তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন 'তান-মো-লি-তি' নামে, গ্রিক ভৌগোলিক টলেমির মানচিত্রে 'তমালিটিস্' বলে উল্লেখ করা হয়েছে যে বন্দরকে, সে বন্দরে আজ কোনও দুঃসাহসী জাহাজ না ভিড়লেও কিছু জাহাজ কিন্তু আজও ভেড়ে এ বন্দরে। এ বন্দরকে আজ কেউ ডাকে তাম্রলিপ্তি বলে। কেউ বলে তমালিকা বন্দর।

BanglaBook.org

বন্দর যখন তখন তো সেখানে বেশ্যালয় থাকবেই। এ বন্দরেও আছে। বলতে গেলে এই বেশ্যালয়টাই বর্তমানে অনেকাংশে এ মৃতপ্রায় বন্দরের কৌলিন্য ধরে রেখেছে। সাতগাঁও বা সপ্তগ্রামে যেসব ভিনদেশি বণিকের দল বাণিজ্য করতে যায় তারাও আসাযাওয়ার পথে একবার ছুঁয়ে যায় এ বন্দর। কারণ, ওই বন্দরস্থিত গণিকালয়ের আকর্ষণ। ভারতীয়, সিংহলি, জেপাং, আরব, এমনকী নীলনয়না শ্বেতাঙ্গ সুন্দরীদেরও দেখা মেলে এই তমালিকা বন্দরে। নাবিকদের দেহ-মনের ক্ষুধা মেটায় তারা। এই গণিকালয় ব্যক্তি মালিকানাধীন। স্থানীয় জমিদারকে করের বিনিময়ে এই গণিকালয় পরিচালনা যে করে সে পুরুষ নয়, এক নারী। তার নাম 'মৎস্যগন্ধা'। দীর্ঘাঙ্গী, চাঁপাফুলের মতো গাত্রবর্ণ, হরিণ নয়না সেই তন্বী তমালিকা বন্দরের গণিকালয়ের সর্বময়ী কর্ত্রী। বয়স তার তিরিশ ছুঁই ছুঁই। কিন্তু রূপলাবণ্যে সে যে-কোনও অষ্টাদশী তরুণীকেও হার মানায়। লোকে বলে তমালিকা বন্দরের গণিকালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী সে-ই। তবে সাধারণ নাবিকরা তার স্পর্শসুখ থেকে বঞ্চিত থাকে। ধনী

ব্যবসায়ী, জাহাজের নায়ক অর্থাৎ মালিক—এ ধরনের লোককেই মোটা অর্থের বিনিময়ে স্পর্শদান করে সে। এমনকী জাহাজ যদি বড় না হয় তবে তার নাখোদা বা ক্যাপ্টেনকেও সে তার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। তার কটিদেশে থাকে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা। বেশ কয়েকবার কয়েকজন অবাধ্য নাবিক সেই ছুরিকার স্বাদ গ্রহণ করেছে। আরও একজন সবসময় তার সঙ্গে থাকে। মানুষের মতো আকারের বিশাল এক ভিনদেশি বাঁদরি—একটা শিম্পাঞ্জি। মৎস্যগন্ধা আর তার বাঁদরি কবে কোন দেশ থেকে এই তমালিকা বন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা নেই কারও। শুধু তারা আজ একটা কথাই জানে, মৎস্যগন্ধাকে বাদ দিয়ে তমালিকা বন্দরের কথা ভাবা যায় না। মৎস্যগন্ধা আর তমালিকা বন্দর এ শব্দদুটো এখন প্রায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে বন্দরবাসীর কাছে।

মোহনা ছেড়ে চওড়া নদীপথ ধরে তমালিকা বন্দরের দিকে এগোচ্ছিল পর্তুগিজ জাহাজ 'সান্টা মারিয়া'। সকালের বাতাসে তার প্রধান মাস্তুলের মাথায় পতপত করে উড়ছিল রক্তবর্ণের ক্রশ আঁকা পর্তুগিজ পতাকা। না, তবে এ জাহাজ পর্তুগিজ রণপোত নয়। ডেকে বসানো একটা আবশ্যিক কামান ছাড়া কোনও অস্ত্র বহন করছে না এই ছোট বাণিজ্যপোত। অস্ত্র থাকলে তাদের সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে বন্দরবাসীর মধ্যে। এমনিতেই পর্তুগিজদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সুখকর নয় এদেশের মানুষের কাছে। ভাস্কোর দ্বিতীয় অভিযান, তারপর আলবুকার্কের ভারত অভিযান, তারও নৃশংসতা, কালিকট বন্দর দখল না করতে পারলেও গোয়াতে পর্তুগিজ উপনিবেশ স্থাপন করা এসব ভালোভাবে দেখেনি ভারতের অন্য অঞ্চলের মানুষও। একুশ বছর পর ভাস্কো আবার ভারতে আসছেন। এবার তিনি এদেশে আসছেন পর্তুগালের নতুন সম্রাট তৃতীয় জন-এর সনদ নিয়ে পর্তুগিজ উপনিবেশ গোয়ার শাসক অর্থাৎ ভাইসরয়ের দায়িত্ব সামলাবার জন্য। তাঁর এই তৃতীয় অভিযান দীর্ঘস্থায়ী হবে। তাঁকে ভারতের মাটিতে থাকতে হবে অন্তত বেশ কয়েকটা বছর। তাই এবার অনেক বেশি সতর্ক ভাস্কো। লিসবন বন্দর থেকে ইতিমধ্যে তিনি তাঁর দুই পুত্র ডম পাওলো, ডম এস্তাভাও আর তিন হাজার নাবিকের চোদ্দোটি বড় জাহাজের নৌবহরকে নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন ঠিকই কিন্তু সান্টা মারিয়ার মতো বেশ কিছু ছোট বাণিজ্যতরীকে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন বন্দরগুলোতে তাঁর নৌবহরের যাত্রা শুরুর আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

BanglaBook.org

সান্টা মারিয়ার মতো জাহাজগুলোর কাজ হবে এসব বন্দরে বাণিজ্য করার সঙ্গে সঙ্গে বন্দরের হাল হকিকত সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া এবং তা গোয়াতে ভাস্কোর কানে পৌঁছে দেওয়া। বিশেষত এ অঞ্চলের গাঙ্গেয় বন্দর সম্বন্ধে বেশ আগ্রহ জেগেছে ভাস্কোর মনে। তমালিকা বন্দর থেকে বেশ কিছুটা দূরে মোহনার অন্য অংশে ছোট একটা বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেছে এক পর্তুগিজ বণিক। সে পর্তুগালের খবর পৌঁছে দিয়েছে যে, ভারতের দূরবর্তী এই অঞ্চল নাকি তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ। আরবদের আক্রমণের ভয় সেখানে নেই। আর স্থানীয় জমিদাররাও তেমন সামরিক ক্ষমতাসম্পন্ন নন। কাজেই এ তল্লাটে দ্বিতীয় এক উপনিবেশ গড়ে তোলা যায় কিনা সে-ভাবনা খেলা করছে ভাস্কোর মনে। নিদেনপক্ষে সমুদ্রে ভাসার নিরাপদ কোনও পথ।

ভোরের সোনালি আলো ছড়িয়ে পড়েছে নদীর জলে। নদীর দু-পাশে সবুজ ধানের খেত, আম-কাঠালের বন। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে শণের চালঅলা মেটে বাড়ি, নদীর পাড়ে বাংলার শান্ত পল্লীগ্রাম। মাঝে-মাঝে মোরগের অস্পষ্ট ডাক ভেসে আসছে সেখান থেকে। দুইতলা পালতোলা জেলে নৌকা ভাসছে নদীর কূল ঘেঁষে। ডেকে দাঁড়িয়ে এসব দেখতে দেখতে এগোচ্ছিল এস্তাদিও। এই পর্তুগিজ বাণিজ্যতরীর সর্বাধিনায়ক সে। তাকে যুবকই বলা যায়। বয়স মাত্র তিরিশ। বংশগরিয়াত ভাস্কোর আত্মীয় সে। তবে এস্তাদিও জানে তার এ-পরিচয় দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তার এখন একমাত্র পরিচয় হবে, সে একজন পর্তুগিজ বণিক। এদেশের তমালিকা বন্দরে প্রথম বারের জন্য সে পা রাখছে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে।

বেশ লাগছিল এস্তাদিওর। এদেশে সম্বন্ধে সে যতটুকু শুনেছে তা মূলত কালিকট বন্দর এবং সংলগ্ন অঞ্চলের ব্যাপার-স্যাপার। গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত এই জায়গা সম্বন্ধে তার স্বদেশিরা খুব বেশি তথ্য দিতে পারেনি তাকে। কাজেই একেবারে অচেনা অজানা ভিনদেশি বন্দরে পদার্পণ করার আগে একটা উৎকণ্ঠা জাগা স্বাভাবিক। ডেকে দাঁড়িয়ে নিজের দেশের কথাও মনে পড়ছিল তরুন এস্তাদিওর। বার কয়েক জাহাজ নিয়ে মোম্বাসা বন্দরে গেলেও এতদূরে কখনও সে আসেনি। অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন 'জেনোয়ার কাঁটা' অর্থাৎ কম্পাসের ওপর নির্ভর করে এতটা পথ পাড়ি দিয়েছে। এক-এক সময় মনে হচ্ছিল, জেনোয়ার কাঁটা ঠিক পথ নির্দেশ করেছিল তো? সে ঠিক জায়গাতে পৌঁছেছে তো?

BanglaBook.org

নানা কথা ভাবছিল এস্তাদিও। একসময় মাস্তুলে বসে থাকা নজরদার হাঁক দিল, 'বন্দর! বন্দর দেখা যাচ্ছে!' সঙ্গে সঙ্গে এস্তাদিও আতসকাচ লাগানো পিতলের নলটা নিয়ে তাকাল সেদিকে। তার চোখে অস্পষ্টভাবে ভেসে উঠল তমালিকা বন্দর। নজরদারের হাঁক শুনে নিজের কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন পেরো, নলটা চোখে দিয়ে দেখে নিয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অবশেষে আমরা পৌঁছে গেছি!'

এস্তাদিও ক্যাপ্টেনকে বলল, 'সব নাবিকদের ডেকে উপস্থিত হতে বলুন। তাদের উদ্দেশ্যে কিছু নির্দেশ দিতে হবে বন্দরে পৌঁছোবার আগে।'

এস্তাদিওর নির্দেশমতো ক্যাপ্টেন পেরো কিছুক্ষণের মধ্যেই সার বেঁধে সবাইকে দাঁড় করালেন জাহাজের ডেকে। যেখানে নোঙরের শিকল বাঁধা থাকে সেই ক্যাপস্টেনের ওপর উঠে দাঁড়াল এস্তাদিও। তারপর সমবেত নাবিকদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নতুন দেশের মাটিতে পদার্পণ করতে যাচ্ছি। ওই যে বন্দর দেখা যাচ্ছে। এ জায়গা সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নেই। আশা করি তারা আমাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য পূর্ণ আচরণ না করলেও দুর্ব্যবহার করবে না। যদি তা করেও তবে আমাদের সবাইকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ বন্দরে কিছুকাল অবস্থান করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। যদি বন্দরে আমরা পা রাখতে পারি তবে সেখানে অবস্থানকালে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কোনও বিতর্ক বিবাদে জড়ানো চলবে না। বিশেষত, পানশালা বা গণিকালয়গুলোতে যতদিন অনুমতি না দেব ততদিন যাওয়া চলবে না। জুয়ার আড্ডা এড়িয়ে চলাই বাঞ্ছনীয়, কারণ সেখান থেকে গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। আমাদের জাহাজের অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্বন্ধে কোনও আলোচনা স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে করা চলবে না। কোনও সন্দেহজনক ব্যাপার দেখলে বা ঘটনা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে তা আমাকে বা ক্যাপ্টেনকে জানাতে হবে। প্রয়োজনবোধে আমাকে হয়তো বন্দরেই আশ্রয় নিতে হবে। ক্যাপ্টেন জাহাজেই থাকবেন। সূর্যাস্তের পূর্বে সব নাবিককে জাহাজে ফিরে আসতে হবে। ক্যাপ্টেন গুনতি করবেন। স্থানীয় কোনও লোককে সঙ্গী করে জাহাজে আনা চলবে না। কোনও দেহোপজীবিনীকে নয়ই। এ নির্দেশ অমান্য করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। যা বললাম সবাই মনে রাখবে। আশা করি মাতা মেরির আশীর্বাদে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। মাতা মেরি আমাদের আশীর্বাদ করুন। জয় পর্তুগালের জয়। জয় পর্তুগাল সম্রাট তৃতীয় জনের জয়।'

BanglaBook.org

এস্তাদিও সঙ্গে গলা মেলাল নাবিকরা—'জয় মাতা মেরির জয়, জয় পর্তুগাল সম্রাটের জয়!' এরপর তারা লেগে গেল যে-যার কাজে—ক্যাপস্টেনের থেকে নোঙরের শিকল খোলার কাজে, জাহাজ থেকে নৌকা নামাবার প্রস্তুতিতে।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে তাম্রলিপ্তি—তমালিকা বন্দর।

এস্তাদিও-ও তার কেবিনে গিয়ে ঢুকল। পোশাক পাল্টে নিল সে। গায়ে লাল সাদা ডোরাকাটা পিতলের বোতাম আঁটা, কাঁধে রঙিন পটি আঁটা লম্বা পোশাক, মাথায় নীল রঙের বাঁকানো জাহাজি টুপি, হাঁটু পর্যন্ত ঝকঝকে চামড়ার জুতো, রুপোর গুলআঁটা চওড়া কোমরবন্ধে তলোয়ার ঝুলিয়ে জাহাজের ডেকে বেরিয়ে এল সে! জাহাজের ক্যাপ্টেনসহ বেশ কিছু উচ্চপদস্থ কর্মীও তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী নিজেদের পোশাকে সজ্জিত হয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

নদীর পাড় বরাবর বেশ কয়েক মাইল বিস্তৃত তমালিকা বন্দর। তবে তার অধিকাংশই এখন পরিত্যক্ত।

বাংলার প্রধান বন্দরের মর্যাদা সে হারিয়েছে অন্তত চারশো বছর আগে। সাতগাঁও আর চট্টগ্রাম এখন বাংলার দুই প্রধান বন্দর। শ্বেতাঙ্গ জাহাজ এখন আর এ বন্দরে বেশি আসে না। বিদেশি জাহাজ বলতে এখানে আসে কিছু সিংহলী জাহাজ, আরব ধাও আর চীনা জাঙ্ক। বন্দরে মালতে আর স্থানীয় বড় বড় নৌকার ভিড়ই বেশি। তবুও আজও টিকে আছে এ-বন্দর। বর্তমান জাহাজঘাট আর বন্দর একটা ছোট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পণ্যমজুতের গুদামঘর, নাবিকদের খোলার ঘর, সব মিলিয়ে জায়গাটা বেশ ঘিঞ্জি। বন্দরের কাছে পৌঁছে মাঝনদীতে নোঙর করল পর্তুগিজ জাহাজ। বেশ কয়েকবার শঙ্খধ্বনি শোনা গেল বন্দর থেকে। এ শঙ্খধ্বনির অর্থ হল, বন্দরে নতুন জাহাজের আগমন ঘটল, তা আশেপাশের সবাইকে জানিয়ে দেওয়া। পর্তুগালের লিসবন বন্দরে যখন কোনও জাহাজ ভেড়ে তখন ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে সে সংবাদ বন্দরবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হয়। আর আফ্রিকার মোম্বাসা বন্দরে এ-কাজ করা হয় শিঙা অর্থাৎ মহিষের শিং-এর ভেঁপু বাজিয়ে।

এস্তাদিওর জাহাজ নোঙর ফেলার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছইঅলা ছোট-বড় নৌকা এসে ঘিরে ধরল জাহাজটাকে। যেমন অন্য জাহাজ বন্দরে ভিড়লে ঘিরে ধরে নৌকার দল। এইসব নৌকাগুলো কিছু পণ্য ব্যবসায়ীদের দালালদের, আর কিছু নৌকা আসে জাহাজের নাবিকদের পাড়ে পৌঁছে দেবার জন্য।

BanglaBook.org

এস্তাদিওর জাহাজে পাঁচটা ছোট নৌকা আছে। সেগুলো জলে নামানো হল। এস্তাদিও কিন্তু সে নৌকাগুলোতে না চেপে জনা সাতেক সঙ্গীকে নিয়ে চেপে বসল স্থানীয় এক নৌকাতে। উদ্দেশ্য, পাড়ে ওঠার পথে স্থানীয় মাঝির থেকে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া। চারজন মাঝি দাঁড় টানছে নৌকার। তাদের মধ্যে বয়সে যে প্রবীন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল এস্তাদিও। বড় বড় বন্দরগুলোতে বিভিন্ন দেশের নাবিকরা আসে বলে সেখানে এক ধরনের মিশ্র ভাষা গড়ে ওঠে। সে ভাষা আর আকার ইঙ্গিতে মোটামুটি কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। আর বড় বন্দরগুলোতে এক-আধজন স্বদেশীয়র দেখা মিলেই যায়, যে স্থানীয় ভাষা জানে। তখন তাকে দিয়ে দোভাষীর কাজ করানো হয়। এস্তাদিও প্রথমে জানতে চাইল, 'এ বন্দর থেকে কী কী মাল ওঠে?'

মাঝি জবাব দিল, 'প্রধানত কাপড়, রেশম, চাল, দারুচিনি, গোলমরিচসহ বিভিন্ন ধরনের মশলা। মল্লাকা থেকেও এখানে মশলা এসে জমা হয়, তারপর বিভিন্ন দেশে যায়।

জবাব দিয়ে লোকটা জানতে চাইল, 'তোমাদের জাহাজে কী আছে? কী কিনতে এসেছ তোমরা? দরকার হলে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি।'

এস্তাদিও বুঝতে পারল, এ লোকটারও দালালী করে দু-পয়সা কামিয়ে নেবার ইচ্ছা আছে।'

এস্তাদিও বলল, 'কাচ আর রুপোর বাসনপত্র। হাতির দাঁত আর মোষের সিং-এর লণ্ঠন সঙ্গে এনেছি। ইচ্ছা আছে এখান থেকে রেশম কেনার।'

লোকটা আবারও বলল, 'স্থানীয় বণিকদের সঙ্গে আমি তোমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি।'

এস্তাদিও বলল, 'সে প্রয়োজন যখন হবে তখন তোমাকে নিশ্চই বলব। আচ্ছা, এখানে বাণিজ্য করতে হলে শুল্ক দিতে হয় নিশ্চই? কাকে দিতে হয়?'

মাঝি জবাব দিল, জমিদারকে। বন্দরে শুল্ক-দারোগার দপ্তর আছে। সেখানে গিয়ে আগে জাহাজের নাম, নায়কের নাম এসব নথিভুক্ত করে বন্দর-বাণিজ্যের অনুমতি নিতে হবে। তারপর সেই অনুমতিপত্র দেখিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কাজ শুরু করা যাবে।'

এস্তাদিও জানতে চাইল, 'বন্দরে চোর-ডাকাতের উপদ্রব নেই তো?'

লোকটা বলল, 'ডাকাতের উপদ্রব নেই, তবে চোর-জোচ্চোর মাতালের উপদ্রব তো সব বন্দরেই থাকে। এখানেও কিছুটা আছে। তবে তেমন ভয়ের

BanglaBook.org

কিছু নেই। জমিদারের একদল রক্ষীবাহিনী বন্দর অঞ্চলে টহল দেয়। তাদের একটা চৌকিও আছে বন্দরে।'

'তোমাদের জমিদারের নাম কী?' জানতে চাইল এস্তাদিও।

'মহারাজ যদুনাথ ভুইঞ্যা রায়। বন্দর থেকে কিছুটা ভিতরে জমিদার-বাড়ি'—জানাল মাঝি।

'তোমাদের এই তমালিকা বন্দরে কী কী দর্শনীয় স্থান আছে? প্রশ্ন করল পর্তুগিজ যুবক।

দাঁড় টানতে টানতে বৃদ্ধ মাঝি বলল, 'জমিদারবাড়ি, বর্গভীমার মন্দির। আর একটা প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ। মন্দির আর মঠ এ-দুটোই অবশ্য ঠিক বন্দরে নয়, বেশ খানিকটা ভিতর দিকে। তবে বন্দর এলাকাতে অন্য একটা জিনিস আছে যার জন্য বহু জাহাজ এসে ভেড়ে এই বন্দরে।'—এই বলে থেমে গেল লোকটা।

'কি জিনিস?' জানতে চাইল এস্তাদিও।

মুহূর্তখানেক চুপ করে রইল। তারপর আবছা হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধের ঠোঁটের কোণে। সে বলল, 'মৎস্যগন্ধার কোঠাবাড়ি। বেশ্যালয়। সব জাতের, সব ধরনের মেয়ে পাবে সেখানে। তুমি যেমনটা চাও। বিরাট বাড়ি সেটা। একসঙ্গে তিনশ জন পুরুষ সেখানে রাত কাটাতে পারে।'

'মৎস্যগন্ধা' শব্দটা বুঝতে না পেরে এস্তাদিও বলল, 'মৎস্যগন্ধা কী?'

মাঝি জবাব দিল 'ওই বেশ্যালয়ের পরিচালিকার নাম 'মৎস্যগন্ধা।'

কথাটা শুনে একটু আশ্চর্য হল এস্তাদিও। তার নিজের দেশে কয়েকজন নারী পানশালার ছোট গণিকালয়ের দায়িত্বে থাকে ঠিকই, কিন্তু এ-দেশের মতো কোন জায়গাতে কোনও নারী বন্দর অঞ্চলে বেশ্যালয় চালাতে পারে তা তার ধারনার মধ্যে ছিল না। আরও সামান্য কিছু কথা বলতে বলতেই নৌকা তীরে এসে ভিড়ল। তমালিকা বন্দরের মাটিতে পা রাখল পর্তুগিজ যুবক।

বন্দর অঞ্চলটা বাজারের মতো। বড় বড় গুদাম তো আছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে আছে কাঠ অথবা খড়ের ছাউনিঅলা ছোট-বড় দোকান। রাস্তার ধারে বসে টাটকা ফল-শাকসবজি-মাছ বিক্রি করছে কেউ কেউ। নানা জাতের নানা মানুষের ভিড় লেগে আছে। জোব্বা-পরা আরব বণিক, সিল্কের রঙিন পোশাক, মাথার সামনের অংশ কামানো কিন্তু পিছনে লম্বা বেণিঅলা চীনা জাঙ্কের নাবিক, কৃষ্ণবর্ণের সিংহলি শ্রমিক বা পণ্য ওঠানো-নামানোর কাজে নিয়োজিত

BanglaBook.org

আফ্রিকান মানুষের সংখ্যাই তাদের মধ্যে বেশি। আর আছে স্থানীয় মানুষেরা। তাদের পরনে সুতির কাপড়, গায়ে উড়নি বা সুতির কাপড়ের ঢিলা জামা, কার মাথায় কাপড়ের পাগড়িও আছে। এছাড়া অন্য সব বন্দরের মতো এখানেও ঘুরে বেড়াচ্ছে নোংরা-ছিন্ন বসন পরা ভিখারি আর ভবঘুরে নাবিকের দল। নানা মানুষের চিৎকার চেঁচামেচিতে সরগরম জায়গাটা।

এই নতুন শ্বেতাঙ্গ আগন্তুক বন্দরে পা রাখতেই আবার তাকে ঘিরে ধরল একদল ফড়ে-দালাল। সে কী পণ্য কিনতে চায়, কী পন্য বেচতে চায়, নানা প্রশ্ন তাদের। এস্তাদিওকে প্রথমে ব্যবসার জন্য অনুমতিপত্র নিতে হবে। তাই একজনকে জিগ্যেস করে সে চলল শুল্ক দারোগার দপ্তরের দিকে। স্থানীয় লোকগুলোও তাকে ঘিরে চলতে লাগল। তাদের নানা প্রশ্নের জবাবে এস্তাদিও এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন তাদের কথা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তবে দারোগার দপ্তরের কাছাকাছি এসে থেমে গেল তারা।

ইটের দেওয়ালের একটা লম্বা বাড়ি। মাথায় খড়ের চাল। বাড়িটার সামনে কয়েকজন রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় পাগড়ি, পরনে সুতির কাপড় চওড়া কোমর বন্ধ দিয়ে বাঁধা। হাতে বল্লম। এ-বাড়িটাই দারোগার দপ্তর। রক্ষীরা এই ভিনদেশীকে দেখে পথ ছেড়ে দিল। একজন সঙ্গীকে নিয়ে বাড়িটার ভিতর প্রবেশ করল এস্তাদিও। দলিল দস্তাবেজ ঠাসা বেশ অনেকক'টা ঘর বাড়িটার ভিতরে। জনা কুড়ি লোক বসে কাজ করছে। তাদের মধ্যে একজন এস্তাদিওকে নিয়ে হাজির করাল দারোগার সামনে। বিশাল বপু একটা লোক। মাথায় পাগড়ি, গায়ে সুতির পোশাক। তার বুকের কাছে সোনার বোতাম বসানো, ঝোলা গুম্ফ। লোকটা সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি কোন দেশের লোক? কোথা থেকে আসছ?'

এস্তাদিও জবাব দিল, 'পর্তুগাল থেকে। আমি এস্তাদিও। বণিক এস্তাদিও। সান্টা মারিয়া নামের বাণিজ্যপোতের মালিক। কিছুক্ষণ আগেই সান্টা মারিয়া নোঙর ফেলেছে এখানে। এ বন্দরে আমি বাণিজ্য করতে চাই।'

লোকটা শুনে বলল, 'পর্তুগিজ! তারা তো শুনেছি যেখানে যায় সেখানেই ঝামেলা বাঁধে। এখানে আবার ঘাঁটি গেড়ে বসার ইচ্ছা নেই তো তোমার?'

দারোগার কথা শুনে এস্তাদিও বুঝতে পারল যে, এদেশের লোকেরা পর্তুগিজদের সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করে! লোকটাকে খুশি রাখতে হবে। এস্তাদিও তাই বলল, 'আমি সাধারণ বণিকমাত্র। ব্যবসা করতে এসেছি। ওসবের

BanglaBook.org

পরিকল্পনা বা ক্ষমতা আমার নেই।' এ কথা বলার পর সে তার পোশাকের ভিতর থেকে একটা ছোট ভেলভেটের কৌটো বের করল। তার মধ্যে রাখা আছে লাল চুনীপাথর বসানো একটা সোনার আংটি। বাক্সটা খুলে শুল্ক দারোগার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে এস্তাদিও বলল, 'পর্তুগিজ বণিক তোমাকে এই ছোট উপহারটা দিচ্ছে। গ্রহণ করলে খুশি হব।'

জিনিসটা হাতে নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল শুল্ক দারোগার মুখ। বেশ কিছুক্ষণ জিনিসটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বাক্সটা পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল লোকটা। তারপর সোজা হয়ে বসে বলল, 'ঠিক আছে, ব্যবসা করতে এসেছ যখন তখন করো। তবে বিক্রিত মালের ওপর তিন শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। আগামী একমাসের জন্য এ-বন্দরে তোমাকে বাণিজ্যের অনুমতি দেওয়া হবে। তোমার সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ জমা না পড়লে ভবিষ্যতে সেই সময়সীমা বাড়ানোর কথা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু এসময়কালের মধ্যে শুল্ক ফাঁকি বা অন্য কোনও নালিশ এলে এবং তা প্রমাণিত হলে তৎক্ষণাৎ অনুমতিপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। তাছাড়া অগ্রিম পঞ্চাশ টাকা অথবা সমমূল্যের সোনা বা রুপো জমা রাখতে হবে। জাহাজের সমস্ত লোকের নামের তালিকা, আর পণ্যর ব্যাপার নথিভুক্ত করতে হবে।' এস্তাদিও বলল, 'তোমার শর্তে আমি রাজি।'

দারোগা এবার একজন লোককে নির্দেশ দিলেন প্রধান করনিকের কাছে এস্তাদিওকে নিয়ে যাবার জন্য। তাঁর কাছে কাজ সারতে অনেকটা সময় লেগে গেল এস্তাদিওর। নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করাতে হল সেখানে। এখনও স্থানীয় টাকা বাট্টা করা হয়নি এস্তাদিওর। কাজেই সে পঞ্চাশ টাকা মূল্যের সোনা জমা রাখল সেখানে। অবশেষে জমিদার আর শুল্ক বিভাগের ছাপ দেওয়া অনুমতিপত্র হাতে এল এস্তাদিওর। সেটা হাতে নিয়ে সে যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন মাঝদুপুর। মাথার ওপর চড়া রোদ। বেশ খিদেও পেয়ে গেছে এস্তাদিও আর তার সঙ্গীদের। বন্দর অঞ্চলে বেশ বড় একটা সরাইখানা নজরে পড়ল এস্তাদিওর। সঙ্গীদের নিয়ে ঢুকল সেখানে। লম্বা লাম্বা কেঠো টেবিল। তাতে বসে নানা জাতের মানুষ খাচ্ছে। গরম ভাত অথবা আটার রুটি। তবে এ-রুটি দেখতে এস্তাদিওর দেশের রুটির মতো নয়। গোল গোল পাতলা রুটি। বিশাল উনোনের পাশে বসে একদল লোক হাতে বানানো রুটি সেঁকছে। ঘরের এক জায়গায় দেওয়ালের হুক থেকে ঝুলছে ঝলসানো মুরগি, ভেড়ার ঠ্যাং।

BanglaBook.org

মোটা সোটা চেহারার একজন আরব পয়সার বাক্স নিয়ে বসে আছে সরাইখানার প্রবেশ মুখের দরজার পাশে। সেই সম্ভবত সরাইয়ের মালিক। সে পয়সার হিসাব নিচ্ছে খদ্দেরদের কাছ থেকে। ঘরের ঠিক মাঝখানে বেশ বড় একটা মাটির জালা রাখা। তার ভিতর থেকে ফেনা-ওঠা মিষ্টি পানীয় মাটির ভাড়ে নিয়ে খাচ্ছে অনেকে। একজনকে জিনিসটা সম্বন্ধে জিগ্যেস করাতে সে বলল, ওটা এক প্রকার স্থানীয় মদ, খেজুরের রস থেকে তৈরি হয়। ওকে বলে তাড়ি। খেলে পেট ঠান্ডা থাকে আবার নেশাও হয়। এ দেশের সস্তা মদ। যারা এখানে খেতে আসে তাদের বিনাপয়সায় তা পরিবেশন করা হয়। সরাইখানার মালিকের সামনে গোটা একটা রুপোর টাকা রাখতেই মালিকের নির্দেশে কর্মচারীরা একটা টেবিলে বেশ সমাদর করে বসাল এস্তাদিওদের।

আশেপাশের টেবিলগুলোতে যারা বসে খাচ্ছে তারা অধিকাংশই সাধারণ মাল্লা শ্রেণির লোক। দলবেঁধে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছে তারা। বন্দর অঞ্চলের এই সরাইখানাগুলো হল নানা ধরনের খবরের আড্ডা। এস্তাদিওদের সামনে পরিবেশিত হল কাঠের পাত্রে হাত রুটি আর ভেড়ার ঠ্যাং। খেতে খেতে আশেপাশের লোকদের কথাবার্তা শোনা, বোঝার চেষ্টা করতে লাগল এস্তাদিও। বন্দর থেকে পরদিন একটা বড় দেশী জাহাজ পণ্য নিয়ে রওনা হবে, তা নিয়েই আলোচনা করছে লোকজন। শুধু একবার অন্য ধরনের একটা আলোচনা কানে এল এস্তাদিওর। কয়েকদিনের মধ্যেই একটা জাহাজ আসবে বন্দরে। দিল্লি থেকে নাকি একদল নারী আনা হচ্ছে সে জাহাজে। দিল্লি জায়গাটার নাম শোনা এস্তাদিওর। এদেশের সবচেয়ে বড় সুলতান নাকি সেখানে থাকেন। তবে সে-জায়গা কোথায় তার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নেই এস্তাদিওর। চারপাশের লোকেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেও নবাগত পর্তুগিজদের দিকে। নিশ্চুপভাবে উদরপূর্তি করে চলেছিল এস্তাদিওরা। হঠাৎ তাদের উদ্দেশ্যে কে-একজন পর্তুগিজ ভাষায় বলে উঠল, 'মাতা মেরির জয় হোক। পর্তুগাল সম্রাটের জয় হোক।'

কথাটা কানে যেতেই বিস্মিত এস্তাদিও মাথা তুলে তাকিয়েই দেখতে পেল তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ভবঘুরে চেহারার একজন মাঝবয়সি লোক। তার পরনে নাবিকের জীর্ণ পোশাক, মাথায় ছেঁড়া, কান-ভাঙা জাহাজি টুপি। এদেশের প্রখর সূর্য তার গায়ের রংকে কিছুটা পুড়িয়ে দিলেও লোকটা যে একজন শ্বেতাঙ্গ, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

BanglaBook.org

লোকটার দিকে এস্তাদিও তাকাতেই সে টুপি খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে এস্তাদিওকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, 'আমি পেড্রো পর্তুগালের লোক। জাহাজঘাটায় খবর পেলাম পর্তুগাল থেকে জাহাজ এসেছে। দেখতেও পেলাম জাহাজটাকে। তারপর আপনাদের খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এলাম।' কথাগুলো বলে লোকটা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাল ভেড়ার মাংসের অবশিষ্টাংশের দিকে।

এস্তাদিও লোকটাকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাদের টেবিলে বসতে বলল।

বসল লোকটা। এস্তাদিও তার দিকে কয়েকটা মাংসের টুকরো আর রুটি এগিয়ে দিয়ে জানতে চাইল, 'তুমি এখানে কবে থেকে আছ? কী করো?'

পেড্রো নামের লোকটা ক্ষুধার্তভাবে মাংসের টুকরোতে কামড় বসিয়ে বলল, 'দু বছর হল আমি এই তাম্রলিপ্তি বন্দরেই আছি। আমার বাড়ি পর্তুগালের টেগাস নদীর মোহনার কাছে এক গ্রামে। দু-বছর আগে। 'ইভোরা' নামের ছোট এক পণ্যবাহী জাহাজে এদেশে এসেছিলাম আমি এখানে এসে আমার সিফিলিস ধরা পড়ল। জাহাজ থেকে নামিয়ে বন্দরের এক জায়গায় আমার থাকার ব্যবস্থা করা হল। তারপর একদিন রাতে ইভোরা আমাকে এখানে ফেলে রেখেই রওনা হয়ে গেল পর্তুগালের দিকে। তখন থেকে আমি এখানেই আছি।' কথাগুলো বলে মাংস চিবোতে শুরু করল লোকটা।

সিফিলিস রোগটা পর্তুগাল থেকেই ভারতসহ অন্যদেশে ছড়িয়েছে, এদেশে যত পর্তুগিজ এসেছে তাদের মধ্যে দশ শতাংশ মানুষকে পর্তুগিজরা এ দেশেই ছেড়ে রেখে গেছিল সিফিলিস রোগের কারণে। ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে এই যৌন রোগ। সেই ছেড়ে যাওয়া মানুষগুলোর অধিকাংশ মারা পড়ত। ভাগ্যক্রমে দু-চারজন হয়তো বেঁচে যেত। পেড্রো বলে লোকটা তাদেরই একজন।

এস্তাদিও প্রশ্ন করল, 'তোমার রোগ এখন কেমন?'

পেড্রো জবাব দিল, 'সিফিলিস সেরে গেছে স্থানীয় এক বৈদ্যর চিকিৎসাতে। তবে শরীরে বল পাই না। তাই ভারী কাজ করতে পারি না। পেটে খাবার থাকে না তো।'

'তুমি দেশে ফেরার চেষ্টা করোনি?' জানতে চাইল এস্তাদিওর এক সঙ্গী ফ্রান্সিস। পেশায় সে জাহাজের চিকিৎসক। ভারতীয় জাহাজে চিকিৎসক না থাকলেও প্রতিটা ইওরোপীয় জাহাজে একজন চিকিৎসক থাকা আবশ্যিক। নইলে সে জাহাজকে বন্দর ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হয় না।

BanglaBook.org

ফ্রান্সিসের কথার জবাবে লোকটা বলল, 'গত দু-বছরে কোনও পর্তুগিজ জাহাজ ভেড়েনি এ বন্দরে। দূরে সাতগাঁও বলে একটা বড় বন্দর আছে। সেখানে একটা পর্তুগিজ জাহাজ এসেছিল। কিন্তু আমি সে খবর পাবার আগেই সে জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে যায়।'

এস্তাদিও বলল, 'তুমি এখানকার স্থানীয় ভাষা জানো?'

পেড্রো বলল, 'মোটামুটি জানি। এখানকার ভাষার নাম বেঙ্গালা বা বাংলা।'

'এখানকার লোকরা পর্তুগিজ শব্দ বুঝতে পারে?'

পেড্রো বলল, 'কিছু খাঁটি পর্তুগিজ শব্দ এরা বুঝতে পারে। যেমন বারান্দা, ছবি, পেরেক, বালতি, ইস্ত্রি, আলমারি, সাবান, বোতাম এসব শব্দ। আর আমাদের দেশ থেকে আসা যেসব ফল-ফসল এদেশে জনপ্রিয় হয়েছে, ইদানীং যাদের চাষও হচ্ছে এখানে, তাদেরকে এরা পর্তুগিজ নামেই ডাকে। যেমন পেঁপে, পেয়ারা, কামরাঙা, আলু...।'

এস্তাদিও একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তোমাকে আমরা কাজ দিতে পারি। তোমার কাজ ভালো হলে পর্তুগালেও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি। করবে? তবে তার আগে তোমাকে পরীক্ষা করে দেখে নেব যে তুমি সিফিলিস থেকে মুক্ত হয়েছ কিনা?'

এস্তাদিওর কথা শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পেড্রোর মুখ। উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে ধরে বলল, 'করব হুজুর, করব। খ্রিস্টের অসীম কৃপা যে আপনারা এখানে এসেছেন। আমাকে পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন যে আমি রোগমুক্ত কিনা।'

এস্তাদিও বলল, 'আচ্ছা। আপাতত তুমি খাওয়া শেষ করো।'

সবার খাওয়া শেষ হবার পর ফ্রান্সিস লোকটাকে সরাইখানার পিছনে নিয়ে গেল। সেখানে পেড্রোর যৌনাঙ্গ ভালো করে পরীক্ষা করে তাকে নিয়ে ফিরে এসে এস্তাদিওকে জানাল যে লোকটা বর্তমানে সিফিলিস মুক্ত। এদিনের মতো কাজ শেষ হয়েছে এস্তাদিওর। পরদিন সকাল থেকেই অবশ্য কাজে নেমে পড়তে হবে এস্তাদিওকে। প্রথমে থাকার জন্য একটা বাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। খোঁজখবর নিতে হবে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের থেকে। সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই পেড্রো সাহায্য করতে পারবে এস্তাদিওকে। সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এস্তাদিওরা এগোল নদীর পাড়ের দিকে। সেখানে যেতে যেতে এস্তাদিও, পেড্রোর মুখ থেকে জানতে পারল যে এ বন্দরের বড় ব্যবসায়ীরা সব ধর্মে

BanglaBook.org

বাঙালি মুসলিম। পর্তুগিজদের তারা খুব একটা পছন্দ করে না। যে কারণে তাদের কাছে কাজ জোটেনি পেড্রোর। তবে মুনাফার সম্ভাবনা থাকলে ব্যবসায়ীধর্ম মেনে পর্তুগিজদের সঙ্গে কারবার করতে তাদের আপত্তি নেই। তমালিকা বন্দর অঞ্চলের সব থেকে ক্ষমতাশালী মানুষ ভূস্বামী মহারাজ যদুনাথ ভুইঞা। তবে তিনি সঙ্গীত আর ধর্মকর্ম নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন। পেড্রো শুনেছে তমালিকার রাজবংশ নাকি এদেশের প্রাচীনতম রাজবংশগুলোর মধ্যে একটা। মহারাজার হয়ে সম্পত্তির দেখভাল করে তাঁর নায়েব গোলকনারায়ণ নামের এক হিন্দু। আর নগরের বন্দরের আইনশৃঙ্খলা দেখার মূল দায়িত্বে আছে কোতোয়াল। তার নাম কোকনদ। সে লোকটা ধর্মে হিন্দু।

এস্তাদিও জানতে চাইল, 'এখানে কোনও গির্জা নেই?'

পেড্রো বলল, 'এখানে মন্দির আছে, আরবদের প্রার্থনাগৃহ মসজিদ আছে, এমনকী "বুদ্ধ" নামের এদেশের এক প্রাচীন সন্ন্যাসীর একটা প্রাচীন মঠও আছে। কিন্তু কোনও গির্জা নেই।

কথা বলতে বলতে তারা যখন নদীর তীরে এসে পৌঁছোল এখন বিকেল হয়ে এসেছে। ভাটা চলছে তখনও। জল সরে গেছে। ঘাটে বেশ ভিড়। বন্দরের কাজ শেষ করে রাত্রিবাসের জন্য নিজেদের জাহাজে ফিরছে অনেকে। এস্তাদিওর নিজেদের নৌকাগুলো কাদায় আটকে ছিল। সেগুলোকে বেশ কিছুটা ঠেলে জলে নামিয়ে তাতে চেপে বসা হল। বড় বড় জাহাজগুলোর ফাঁক গলে সান্টা মারিয়ায় পৌঁছে গেল তারা। দড়ির মই বেয়ে জাহাজের ডেকে উঠে এল এস্তাদিও। সেই পেড্রোকেও জাহাজে উঠিয়ে কয়েকজন নাবিকের হাতে তুলে দেওয়া হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবার জন্য।

এস্তাদিও নিজের কেবিনে ঢুকে কিছু কাজ সেরে পোশাক পরিবর্তন করে যখন ডেকে এসে বসল তখন নদীর জলে আবির ছড়িয়ে সূর্য অস্তাচলে যেতে বসেছে। এস্তাদিওর জাহাজের মাস্তুলে বাতাসে পতপত করে উড়ছে ক্রুশলাঞ্ছিত রক্তবর্ণের পর্তুগাল পতাকা। কিন্তু আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা যেসব নৌকা বা জাহাজে সাদা পাল খাটানো, সেগুলোও রক্তবর্ণ ধারণ করেছে বিদায়ী সূর্যের লাল আলোতে। তা দেখে এস্তাদিও মনে মনে ভাবল, একদিন হয়তো এ দেশের সব পতাকাই লাল হয়ে যাবে। পর্তুগিজরা তার গায়ে এঁকে দেবে পবিত্র ক্রুশ চিহ্ন। কোথায় পর্তুগাল আর কোথায় এই সুদূর ইন্ডিয়া! কিন্তু পর্তুগিজরা নিজেদের বাহুবলে, বুদ্ধিবলে এদেশের গোয়াতে তাদের উপনিবেশ স্থাপন

BanglaBook.org

করতে পেরেছে। একদিন হয়তো বা এদেশের শাসনভার হাতে তুলে নেবে পর্তুগিজরাই। নিজের দেশ, জাতির জন্য বেশ গর্ববোধ হয় এস্তাদিওর।

বেশ মনোরম বাতাস বইছে। সব জাহাজের ডেকগুলোতেই জাহাজিদের ভিড়। সারাদিন অনেক জাহাজের নাবিকরাই পণ্য ওঠানো নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিল। কাজ শেষ করে জাহাজে উঠে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে তারা। দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজগুলো থেকে বাদ্যযন্ত্র, হইহুল্লোড়ের শব্দ ভেসে আসছে। সান্টা মারিয়ার নাবিকরাও সব ডেকের রেলিং-এর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ ছই তোলা একটা বেশ বড় নৌকা এসে দাঁড়াল সান্টা মারিয়ার গা ঘেঁষে। দুজন মাঝি ছাড়াও আরও একজন দেশীয় পোশাক পরা লোক নৌকাতে দাঁড়িয়ে আছে ছইয়ের সামনে পাল খাটাবার দন্ডটা ধরে। তাদের জাহাজের কাছে আসতে দেখেই এস্তাদিও রেলিং-এর ধারে উপস্থিত হল। নৌকার দণ্ড ধরে যে লোকটা দাঁড়িয়ে, সে এস্তাদিওর উদ্দেশ্যে বলল, 'ভালো মাল আছে। লাগবে নাকি?'

লোকটা বার কয়েক কথাটা বলার পর এস্তাদিও প্রশ্নটা বুঝতে পেরে বলল, 'কি মাল? দেখি?'

সে লোকটা ছই-এর দিকে তাকিয়ে দেশীয় ভাষায় কী যেন বলল। তার কথা শুনে ছই-এর পর্দা ঠেলে বাইরে এসে সারি বেঁধে দাঁড়াল কয়েকজন নারী। একটাই সুতির কাপড় হাঁটুর ওপর থেকে বুক পর্যন্ত জড়ানো। বাহুতে গলায় ফুলের সাজ। বন্দরবেশ্যা। মালিক তাদের নিয়ে এসেছে রাতে নাবিকদের মনোরঞ্জনের জন্য। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এস্তাদিও বলল, 'না, আমাদের এ-মালের দরকার নেই।' যদিও তার জাহাজের নাবিকদের বেশ কয়েকজনের চোখ-মুখ চক্‌চক্ করে উঠেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে। এস্তাদিওর কথা শুনে তবুও একবার নৌকার লোকটা বলল, 'কম দামে দেব। সারারাতের জন্য এদের জাহাজে রাখতে পারো তোমরা।'

কিন্তু এস্তাদিও কিছুটা দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দিল,—'না, দরকার নেই। তুমি অন্য জাহাজে যাও।'

আশাহতভাবে অন্য জাহাজের দিকে রওনা হল লোকটা। কিছুক্ষণ পর এস্তাদিও দেখতে পেল, দূরে নোঙর-করা একটা জাহাজে তুলে নেওয়া হল মেয়েদের।

এর কিছু সময়ের পরই সূর্য ডুবে গিয়ে অন্ধকার নামল। এস্তাদিও ডেকেই

BanglaBook.org

বসে রইল। নাবিকরা ডেক ছেড়ে ফিরে গেল যে-যার কাজে। ডেকে বসে এস্তাদিও দেখতে পেল কয়েকটা আলো জ্বলে উঠছে তমালিকা বন্দরে। লম্বা দণ্ডের মাথায় আকাশপ্রদীপও জ্বালানো হচ্ছে, দূর নদীপথে কোথাও কোনও জাহাজ থাকলে তাকে বন্দরের অবস্থান জানানোর জন্য। তবে বন্দরের কাজকর্ম অন্ধকার নামার পর স্তিমিত হয়ে এসেছে বলেই মনে হল এস্তাদিওর। বন্দরে লোকজনের হাঁকডাক অনেকটা ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো শোনায় দূর থেকে। সে-শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে যেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আশেপাশের জাহাজগুলোতে কোথাও একটা-দুটো ক্ষীণ আলো জ্বলছে, আবার কোনও জাহাজ ডুবে আছে অন্ধকারের মধ্যে। অন্ধকার জলের মধ্যে কয়েকটা ছোট দেশী নৌকা জোনাকির মতো মিটমিটে আলো নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওগুলো জেলে-নৌকা অথবা সেই বারবনিতাদের নৌকা।

অন্ধকারের মধ্যে ডেকে বসে এসব দেখতে দেখতে ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা ভাবছিল এস্তাদিও। হঠাৎ একজন লোক তাঁর সামনে এসে টুপি খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। লোকটাকে চিনতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল এস্তাদিওর। কারণ পেড্রো বলে লোকটার চুল-দাড়ি কামিয়ে স্নান করিয়ে নতুন পোশাক জুতো টুপি দেওয়া হয়েছে। তাই তাকে দেখতে অন্যরকম লাগছে। পেড্রো, এস্তাদিওর উদ্দেশ্যে বলল, 'আমায় কী কাজ করতে হবে হুজুর?'

এস্তাদিও বলল, 'মূলত দোভাষীর কাজ। আর বন্দরের খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করে আমার কাছে পৌঁছে দেবে। আমি বন্দর অঞ্চলে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকব। তাতে আমার কাজের সুবিধা হবে। তুমি আমার সঙ্গে সেখানে থাকবে। আর একটা কথা, আমি কী করছি বা না করছি তা নিয়ে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করবে না। বিশ্বাসভঙ্গ হলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করা হবে। দেশে ফেরার পথ তোমার বন্ধ হবে। বাকি জীবনটা তোমাকে এই তমালিকা বন্দরেই আগের মতো কাটাতে হবে।'

এস্তাদিওর কথা শুনে পেড্রো বলল, 'যিশু সহায়। আমার ওপর আপনি ভরসা রাখতে পারেন।'

এস্তাদিও বলল, 'কাল সকালেই আমি বন্দরে যাব। তুমি সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হয়ে থেকো। আপাতত তুমি যাও।'

পেড্রো আবার মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে ফেরার জন্য পা বাড়াতে যাচ্ছিল হঠাৎই প্রায়, ঘুমিয়ে পড়া, বন্দরের মধ্যে বেশ একটা উজ্জ্বল অংশ

BanglaBook.org

চোখে পড়ল এস্তাদিওর। বিন্দু বিন্দু আলো নয়, জেগে আছে এক উজ্জ্বল আলোকরেখা। একসঙ্গে অনেক প্রদীপ জ্বালানো আছে যেন। সেটা চোখে পড়তেই এস্তাদিও কৌতূহলী হয়ে পেড্রোকে বলল 'এই শোনো। বন্দরের অন্ধকারের মধ্যে ওই উজ্জ্বল অংশটা কী? কোন প্রাসাদ বা মন্দির?'

সেদিকে তাকিয়ে পেড্রো জবাব দিল, 'না মালিক, ওটা মন্দির বা প্রাসাদ নয়, বন্দর সুন্দরীরা থাকে ওখানে। ওটা বেশ্যালয়। এত বড় বেশ্যালয় কোথাও নেই। সাতগাঁও বা কালিকট বন্দরেও নেই। সবদেশের মেয়ে পাওয়া যায় ওখানে। ওর টানে বহু জাহাজ নোঙর ফেলে এ-বন্দরে। নাবিকরা ছাড়াও নগরবাসীরাও ওখানে আসা-যাওয়া করে। ধনী ব্যক্তি থেকে সাধারণ মানুষ। পয়সা ফেললে সবার জন্য দরজা উন্মুক্ত।'

কথাটা শুনে এস্তাদিও মনে মনে ভাবল, 'নানা জাতের নানা দেশের মানুষ যেখানে যায় সে-জায়গা, বিশেষত এই বেশ্যালয়, নানা খবরের আখড়া হয়।' যদিও এস্তাদিও অবিবাহিত, তবে স্বদেশে বা বিদেশে এস্তাদিও এখন আড়ায়নি কোনওদিন। এ জন্য দেশের বন্ধুমহলে হাসি-ঠাট্টাও হয়। আবার অনেকটা এ কারণেই অ্যাডমিরাল ভাস্কো তমালিকা বন্দরের খবর সংগ্রহ করার গোপন দায়িত্ব এস্তাদিওর ওপর দিয়েছেন। অনেক নাবিক আবেগের বশে বা অসতর্ক অবস্থায় গোপন খবর দিয়ে ফেলে বারবনিতাদের। যা গুপ্তচরদের মাধ্যমে পৌঁছে যায় শত্রুশিবিরে। এস্তাদিও শুনেছে ভাস্কো অনুমান করেন যে, এদেশে তাঁর দ্বিতীয় অভিযানের সময় কালিকটে তাঁর দুর্গনির্মাণের বাসনার কথা এভাবেই নাকি আগাম পৌঁছে গেছিল কালিকটের শাসকদের কাছে। যে-কারণে এবার ভারত অভিযানে তার নৌবহরে কোনও দেহোপজীবিনী তোলা যাবে না, যতদিন না তাঁর নৌবহর গোয়াতে এসে পৌঁছোবে ততদিন পথমধ্যে কোনও বন্দরে গণিকালয়ে নাবিকরা যেতে পারবে না—এ কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। যাত্রা শুরুর আগে ব্যাপারটা শুনে এসেছে এস্তাদিও।

এস্তাদিও, পেড্রোকে প্রশ্ন করল, 'তুমি ওখানে গেছ কোনওদিন?'

পেড্রো একটু ইতস্তত করে বলল, 'এখানে আসার পর অন্য নাবিকদের মতো আমিও সেখানে কয়েকবার গেছিলাম। অসুখ হবার পর আর যাইনি।'

এস্তাদিও তার জবাব শুনে বলল, 'ঠিক আছে। তুমি এবার যেতে পারো।'

ডেকের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল লোকটা। তমালিকা বন্দরের সেই আলোক- মালার দিকে তাকিয়ে আরও বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর নিজের

BanglaBook.org

কেবিনে ফিরে গেল এস্তাদিও। তার খাস ভৃত্য লণ্ঠন জ্বালিয়ে দাঁড়িয়েছিল কেবিনে। এস্তাদিও কেবিনে প্রবেশ করার পর টেবিলে রাখা বালিঘড়িটা উল্টে দিয়ে এস্তাদিওর জন্য রাতের খাবার আনতে গেল সে। তমালিকা বন্দরে প্রথম দিনটা পর্তুগিজ নাবিক এস্তাদিওর নির্বিঘ্নেই কেটে গেল।

৮

চারদিকে শুধু জল আর জল। তার মধ্যে একটা কাঠের খাঁচায় বসে আছে সে। ঢেউয়ের তালে দুলছে খাঁচাটা। কখনও ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের জলে। দমবন্ধ হয়ে আসছে তার, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে সব কিছু। মনে হচ্ছে এই বুঝি সব শেষ! পরক্ষণেই আবার ঢেউয়ের নীচ থেকে চোখে জ্বালা ধরানো সূর্যের আলোতে ভুস করে ভেসে উঠছে খাঁচাটা। সমুদ্র যেন কোন নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠেছে একটা মেয়েকে নিয়ে। ওই যে ওই! পাহাড়ের মতো একটা ঢেউ এবার এগিয়ে আসছে! নির্ঘাৎ এবার সে খাঁচাটাকে টেনে নিয়ে যাবে সমুদ্রের গভীরে! সব শেষ!

আসছে সে আসছে! সহস্র ফনা তুলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর দুলে উঠল খাঁচাটা। মুহূর্তর জন্য চোখের সামনে হারিয়ে গেল সবকিছু!—আর এরপরই ঘুমটা ভেঙে গেল মৎস্যগন্ধার।

চোখ মেলে ব্যাপারটা বুঝতে, ঘোর কাটতে আরও একটু সময় লাগল। কারণ সে এখন দুলছে। এরপর আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারল সে। তার বিশাল পালঙ্কের ছত্রী ধরে দোল খাচ্ছে রানি। খাটটা তাই দুলছে।

মৎস্যগন্ধা উঠে বসল পালঙ্কে। ব্যাপারটা তবে স্বপ্নই ছিল! এ স্বপ্ন অবশ্য ছোটবেলা থেকে বহুবার দেখে এসেছে। তবে এবার দেখল বহু দিন পর। উঠে বসার পর মৎস্যগন্ধা বুঝতে পারল তার সারা শরীর ভিজে গেছে। না, সমুদ্রের জলে নয়, ঘামে। সে উঠে বসতেই বুড়ি শিম্পাঞ্জিটা তার কাছে এসে গলা জড়িয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। মৎস্যগন্ধার মনে হয় এই একটা মাত্র প্রাণী হয়তো পৃথিবীতে আছে, যে তাকে ভালোবাসে, বোঝে। বোবাদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে। মৎস্যগন্ধা ঘুম ভেঙে উঠে বসার পর তার মুখ চোখ দেখে হয়তো সে কিছু অনুমান করতে পেরেছে। তাই সে মৎস্যগন্ধাকে ভরসা

BanglaBook.org

দেবার জন্য এত ঘনিষ্ঠভাবে তার কাছে এসে বসল। তার মনের ভাবটা এই— ভয় কী? আমি তো আছি।'

হ্যাঁ, গত কুড়ি বছর ধরে ছায়ার মতো সে সঙ্গে রয়েছে মৎস্যগন্ধার। দুজন দুজনকে আত্মার মতো আগলে রাখে সুখে-দুঃখে। একবার দানবীয় চেহারার মাতাল নাবিক মৎস্যগন্ধার ঘরে ঢুকে তাকে জাপটে ধরে চিৎ করে ফেলেছিল পালঙ্কে। বাঘের মতো হাতের থাবা দিয়ে মুখ চেপে ধরেছিল মৎস্যগন্ধার, যাতে মাঝরাতে সে চিৎকার করে কাউকে ডাকতে না পারে। সেই অসহায় মুহূর্তে রানি এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মৎস্যগন্ধার শরীরের ওপর চেপে বসা লোকটার ওপর। পিছন থেকে কামড় বসিয়েছিল লোকটার ঘাড়ে। ধারালো নখ দিয়ে ফালাফালা করে দিয়েছিল মুরটার শরীর। রক্ষা পেয়েছিল মৎস্যগন্ধা। আবার একবার জীবন সংকট হয়েছিল রানিরও। বিশাল এ বাড়িটার সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় রানি। এখানে আসা খদ্দেরদের নানারকম কসরতও দেখায় সে। খদ্দেররাও মাঝে মাঝে মশকরা করে তাকে নিয়ে। নানা ধরনের ফলের ওপর লোভ আছে রানির। এটা তার স্বাভাবিক জন্মগত প্রবৃত্তি। কসরত দেখালে তাকে অনেক সময় ফল খেতে দিত খদ্দেররা। তেমনই একবার এক ভিনদেশি নাবিক একটা লাল টুকটুকে পেয়ারার মতো ফল খেতে দিয়েছিল রানিকে। মাত্র একদিনের জন্য তমালিকা বন্দরে এসে ভিড়েছিল সেই জাহাজ। সে-ফলটা ছিল বিষফল। নাবিক জেনে বুঝেই বিষফলটা রানিকে খেতে দিয়েছিল কিনা তা জানা নেই মৎস্যগন্ধার। কারণ, ফলটা খেয়ে রানি অসুস্থ হয়ে পড়ার আগেই সেই নাবিকের জাহাজ বন্দর ছেড়ে যায়। লোকটাকে আর ধরতে পারেনি মৎস্যগন্ধা।

যাই হোক, সেই বিষফল খেয়ে সাতদিন সাতরাত মড়ার মতো পড়ে ছিল রানি। বুকের ধুকপুকানিও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল তার। নেহাত মোটা অর্থের বিনিময়ে রাজবৈদ্যকে ডেকে আনা হয়েছিল বলে শেষ পর্যন্ত রানি বেঁচে যায়। রানিকে বাঁচাবার জন্য তার সব সম্পত্তি রাজবৈদ্যর হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত ছিল মৎস্যগন্ধা। এমনকী তার সেই সম্পত্তিও যার খোঁজ সে আর একজন লোক ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। ওই সাত দিন সাত রাত সবকিছু ছেড়ে রানির কাছে বসে ছিল মৎস্যগন্ধা। ওই ক'দিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছিল এই গণিকালয়ের দরজা। দেশি-বিদেশি বহু খদ্দের ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গেছিল এখান থেকে। হাজার প্রলোভনেও কেউ দরজা খোলার জন্য টলাতে পারেনি

BanglaBook.org

মৎস্যগন্ধাকে। 'বেশ্যালয়ের দরজা কোনওদিন বন্ধ হয় না' বলে একটা প্রবাদ আছে। কিন্তু রানির জন্য এ-দরজাও বন্ধ হয়েছিল সেদিন।

বিধাতার অসীম করুণা যে, শেষ পর্যন্ত প্রাণ ফিরে পেয়েছিল রানি। সেই ঘটনার পর থেকে অবশ্য খদ্দেরদের রানিকে খাবার দেবার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা আছে। আর সেই মর্মে একটা বিজ্ঞপ্তিও লেখা আছে গণিকালয়ের প্রধান প্রবেশপথের গায়ে। ইদানীং অবশ্য রানিও আর খদ্দেরদের কাছে বিশেষ যায়না। বাড়ির দ্বিতলে একপাশে মৎস্যগন্ধার যে-তিনটে কক্ষ আছে সেখানে নদীর দিকে কক্ষসংলগ্ন অলিন্দেই ঘোরাফেরা করে। বাড়ির অন্যত্র যায় না।

এই নিষ্ঠুর পরিজনহীন পৃথিবীতে রানি ছাড়া আর শুধু দুজন মানুষের কাছে মৎস্যগন্ধার কৃতজ্ঞতার কোনও শেষ নেই। তাদের একজন এখনও জীবিত। সেই বৃদ্ধ বৌদ্ধ মঠাধ্যক্ষ নিশাদপাদ। তাঁর মতো নির্লোভ মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ আছেন কিনা তা মৎস্যগন্ধার জানা নেই। আর দ্বিতীয় জন কয়েকবছর আগে প্রয়াত হয়েছে। স্বয়ম্ভুনাথ যার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন মৎস্যগন্ধাকে। মৃচ্ছকটিক ময়ূরপঙ্খির গণিকা ভর্তিকা। স্বয়ম্ভুনাথের কথা রেখেছিল ভর্তিকা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে আগলে রেখেছিল মৎস্যগন্ধাকে। আজ এই যে বিশাল গণিকালয়, যার টানে ছুটে আসে দেশ বিদেশের নাবিকরা, তার পত্তন তো মাত্র দুটো ঘর নিয়ে শুরু করেছিল ভর্তিকাই। অন্য ব্যবসায় সে যায়নি কারণ এ ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনও ব্যবসার কৌশল জানা ছিল না সেই নারীর। শিশু মৎস্যগন্ধাকে, কিশোরী মৎস্যগন্ধাকে কতবার, কত সময়ে সে আড়াল করেছে খদ্দেরদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে। মৎস্যগন্ধার নিজের মা থাকলে তিনিও হয়তো এতটা করতেন না তার জন্য। শেষ ক'টা বছর অবশ্য মাথাটা খারাপ হয়ে গেছিল বুড়ির। পুরুষ দেখলেই প্রচণ্ড আক্রোশে খেপে উঠত সে। পোশাক ছিঁড়ে ফেলে নগ্ন হয়ে চিৎকার করে উঠত, 'আয়, আয়, আমাকে খাবি আয়।' আর তার সঙ্গে সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ করত খদ্দেরদের প্রতি। খদ্দেররা বিচলিত হত তাতে। বাধ্য হয়ে তাকে দোতলার অলিন্দ সংলগ্ন ঘরে আটকে রাখতে হয়েছিল মৎস্যগন্ধাকে। আজকাল এক-এক সময় মৎস্যগন্ধার মনে হয়, কাজটা সে না করলেই পারত। তাহলে হয়তো আরও কয়েকটা দিন না হয় পাগল হয়েই বেঁচে থাকত সে-নারী।

ভর্তিকার মৃত্যুর ঘটনাটা বেশ অদ্ভুত। সেদিন ভোরবেলাই শ্যামদেশ থেকে

BanglaBook.org

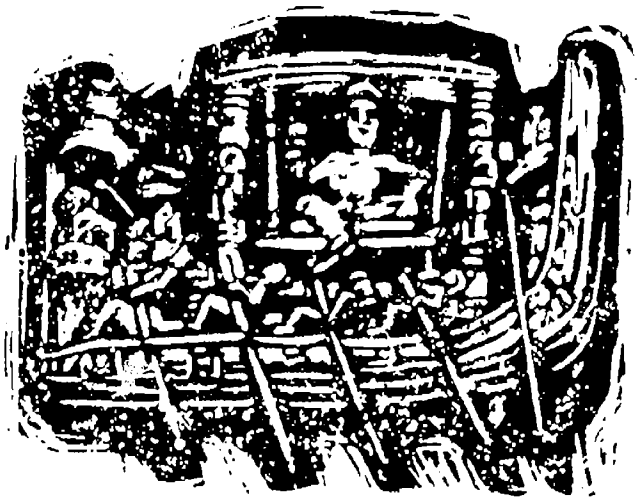

একটা জাহাজ এসে ভিড়েছিল তমালিকা বন্দরে। ভর্তিকা যে-কক্ষে আটক থাকত তার অলিন্দের নীচেই জোয়ারের সময় নদীর জল এসে ছুঁয়ে যায়। অলিন্দে দাঁড়ালে বন্দরের অনেকাংশ দেখা যায় সেখান থেকে। হয়তো বা মাস্তুলে টাঙানো পতাকা দেখে সে চিনতে পেরেছিল ওই শ্যামদেশের জাহাজটাকে। জাহাজটাকে দেখে ভর্তিকা বার বার তার ঘরের ভিতর থেকে বলছিল, শ্যামদেশ থেকে জাহাজ এসেছে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। দরজা খোল। যেতে দে আমাকে।'

ভর্তিকা কোন দেশের মেয়ে ছিল তা জানা নেই মৎস্যগন্ধার। সে একবার তাকে প্রশ্নটা করায় ভর্তিকা জবাব দিয়েছিল, 'আমার কোনও দেশ নেই। আমার একটাই পরিচয় আমি নারী, আমি রূপজীবীনী-বারবনিতা। পুরুষকে তৃপ্ত করার জন্য আমার যোনী আছে। এটাই আমার পরিচয়। মৃচ্ছকটিক ময়ূরপঙ্খিই আমার দেশ ছিল।'

সে কি তবে শ্যামদেশের মেয়ে ছিল? নইলে সে অমন কাণ্ড ঘটাল কেন?'

যাই হোক, বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে বলা বুড়ি ভর্তিকার কথাগুলোকে পাগলের প্রলাপ বলেই ধরে নিয়েছিল মৎস্যগন্ধা। এমন কত কথাই তো বুড়ি আজকাল বলে। তাই ব্যাপারটাতে আমল দেয়নি সে। সেদিন ছিল পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণিমা তিথিতে খদ্দেরের আসা-যাওয়া বেশি হয় এ বাড়িতে। চাঁদের মধ্যে একটা আদিমতা আছে। সেই চাঁদ পুরুষের আদিম প্রবৃত্তিকে আরও জাগিয়ে তোলে কিনা তা জানা নেই মৎস্যগন্ধার। তবে ব্যাপারটা সে খেয়াল করে দেখেছে।

সেদিনও খদ্দেরদের ভিড় আছড়ে পড়েছিল এই গণিকালয়ে, তার মধ্যে

BanglaBook.org

শ্যামদেশের জাহাজের কিছু নাবিকও ছিল। সন্ধ্যা থেকে তাদের সামলাতে সামলাতে মৎস্যগন্ধার রাত কেটে গেছিল। পূর্ণিমাতে জোয়ারের জলও বাড়ে। তা এসে ছুঁয়ে যায় বাড়ির একটা অংশকে, সেই অলিন্দের নীচের অংশকে। সেদিন মাঝরাতে আকাশে যখন গোল সোনার থালার মতো চাঁদ তখন নাকি বাড়ির ওই অলিন্দের অংশ থেকে ঝপ করে জলে কিছু একটা পড়ার শব্দ শুনেছিল এক গণিকা। তার ঘরে তখন খদ্দের। কাজেই ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যাপারটা কী ঘটেছে তা দেখার সুযোগ ছিল না তার। যাই হোক, পরদিন ভোরবেলা মৎস্যগন্ধা, ভর্তিকার ঘরের দরজা খুলে দেখেছিল, সে ঘরে নেই। জোয়ারে জল তখন দূরে সরে গেছে। মৎস্যগন্ধা তখনই তাকে খোঁজার জন্য লোক পাঠিয়েছিল চারদিকে। খবর অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই পাওয়া গেল। ভর্তিকার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার দেহটা নাকি জড়িয়ে ছিল শ্যামদেশের সেই জাহাজটার নোঙরের কাছির সঙ্গে। তবে কি সে সত্যিই চলে যেতে চেয়েছিল শ্যামদেশে? ভর্তিকা কোন দেশের কোন ধর্মের মেয়ে ছিল, তা জানা ছিল না মৎস্যগন্ধার। তাকে দাহ করা হবে, না গোর দেওয়া হবে তা বুঝে উঠতে না পেরে শেষে মৎস্যগন্ধা একটা কাজ করেছিল। ভর্তিকার দেহসমেত একটা ছোট নৌকাকে ফুল-মালায় সাজিয়ে মোহনায় নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিল সেই নৌকাটাকে। সে মনে মনে বলেছিল, 'এই সমুদ্র যেন তোমাকে তোমার দেশে, শান্তির দেশে পৌঁছে দেয়।' আর সঙ্গীদের উদ্দেশে মৎস্যগন্ধা বলেছিল, 'আমি মারা গেলে আমার দেহটাও তোরা এমনভাবে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিস।'

একটু ধাতস্থ হবার পর রানির দিকে তাকিয়ে মৎস্যগন্ধা তার উদ্দেশ্যে বলল, 'আচ্ছা, আমরা দুজন কোথা থেকে এসেছিলাম রে? ভর্তিকা তো বলত, একটা কাঠের খাঁচায় সমুদ্রর বুক থেকে ভাসতে ভাসতে নাকি আমরা দুজন এসেছিলাম। মৃচ্ছকটিক উদ্ধার করে আমাদের। কিন্তু আমরা কোথা থেকে এলাম তুই জানিস? আমি আজও সেই স্বপ্নটা দেখলাম!'

বোবা প্রাণী কোনও কথা বলতে পারে না। মৎস্যগন্ধার কথায় সে কী বুঝল কে জানে! গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে রানি তার গলা জড়িয়ে ধরল। রানিকেও জড়িয়ে ধরল মৎস্যগন্ধা।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল তারা দুজন। খোলা গবাক্ষ দিয়ে বাইরের আলো আসছে। বেশ বেলা হয়েছে। সূর্য ঠিক মাথার ওপর। ধীরে ধীরে জেগে

BanglaBook.org

উঠতে শুরু করেছে বাড়িটা। নানারকম শব্দ কানে যাচ্ছে। ভোর নয়, সূর্য মাথার ওপর উঠলে তবে এ-বাড়ির ঘুম ভাঙে। কারণ, রাতটাই এ বাড়ির দিন, আর দিনটাই রাত। কারণ সারা রাত-ই তো এবাড়িতে খদ্দেরের আনাগোনা চলে। শেষরাতে বাইরের পৃথিবীতে যখন দিনারম্ভের প্রস্তুতি শুরু হয়, নদীর জলে চাঁদের ছায়া মুছে গিয়ে আকাশে শুকতারা ফুটে ওঠে, জমিদারবাড়ির দিক থেকে বাতাসে বয়ে আসে সানাইয়ের আশাবরী রাগ, ঠিক সেই সময় খদ্দেরদের বিদায় দিয়ে ঘুমাতে যায় এ বাড়ির বাসিন্দারা। দ্বিপ্রহরের কিছুটা সময় শুধু এ বাড়ির মানুষদের নিজেদের জন্য বরাদ্দ থাকে। এসময়ে তারা তাদের ব্যক্তিগত কাজ সারে, ঘরদোর পরিষ্কার করে। তারপর মেয়েরা দল বেঁধে স্নান সারে এ বাড়ির সংলগ্ন নদীর ঘাটে। সে-ঘাট তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। মৎস্যগন্ধাই বানিয়েছে সে ঘাট। স্নান সেরে ফিরে এসে গণিকার দল খাওয়া সেরে সামান্য বিশ্রাম নেয়। তারপর বিকাল হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় তাদের অঙ্গসজ্জার প্রস্তুতি।

নদীর বুকে সূর্য যখন ডুবতে শুরু করে তখন এ বাড়িতে একটা- একটা করে জ্বলে উঠতে থাকে প্রদীপের আলো। বিশাল এ বাড়ির প্রতিটা কক্ষ, অলিন্দ, গবাক্ষ, ছাদের খিলান সেজে ওঠে আলোকমালায়। দুজন বিগত যৌবনা গণিকা আছে, যাদের কাজই হল শুধু প্রদীপের সলতে পাকানো, তেল ঢালা, প্রদীপ জ্বালানো। বহুদূর থেকে দেখা যায় সেই প্রদীপমালা। একবার এক ক্যাপ্টেন, মৎস্যগন্ধাকে বলেছিল, বন্দরে বিরাট উঁচু দণ্ডের মাথায় যেখানে আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়ে জাহাজদের বন্দরের উপস্থিতি জানান দেওয়া হয়, সেটা দেখে নয়, ক্যাপ্টেন এই তমালিকা বন্দরের অবস্থান বুঝতে পেরেছিল মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ের প্রদীপমালা দেখে। ঝড়-বৃষ্টিতে লম্বা দন্ডের মাথায় বসানো আকাশদীপ অর্থাৎ তেলের মশালের আলো অনেক সময় নিভে যায় কিন্তু নদীতীরে অবস্থিত মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ের আলো কোনদিন নেভে না, যা আকৃষ্ট করে, প্রলুব্ধ করে জাহাজিদের।

খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল মৎস্যগন্ধা। তার ঘরের জানলা দিয়েও বন্দরের অনেকটা দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে নদীবক্ষে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা নৌকাজাহাজগুলোর মধ্যে পর্তুগিজদের জাহাজটাও দেখতে পেল। জাহাজটার সামনের মাস্তুল অর্থাৎ 'ফোর মাস্টের' মাথায় উড়তে থাকা উজ্জ্বল লাল পতাকাটার মাস্তুলের দঙ্গলের মাঝে আলাদা করে চিনিয়ে দিল সে-জাহাজকে।

BanglaBook.org

দু-দিন আগে জাহাজটা এসে নোঙর করেছে তমালিকা বন্দরে। তবে সে জাহাজ থেকে এখনও কোন নাবিক পদার্পণ করেনি মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ে। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লেগেছে মৎস্যগন্ধার কাছে। সে খবর পেয়েছে, এক শ্বেতাঙ্গ যুবক সওদাগর নাকি পর্তুগাল থেকে ওই বাণিজ্যতরী নিয়ে এসেছে।

রানির বন্ধনমুক্ত হয়ে পালঙ্ক ছেড়ে নেমে উন্মুক্ত গবাক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল মৎস্যগন্ধা। পর্তুগিজ জাহাজটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে সে ভাবল, 'তেমন হলে তার গণিকালয়ে আমার আমন্ত্রণ জানিয়ে লোক পাঠাতে হবে ওই জাহাজটাতে। অনেক দূর দেশ থেকে জাহাজটা এসেছে। হয়তো নাবিকরা পণ্য ওঠানো-নামানোর কাজে খুব ব্যস্ত। তাই তারা খবর সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ের ব্যাপারে। খবরটা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

আর এরপর মৎস্যগন্ধা নদীতীরের ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজের ভিড়ে অন্য নতুন কোনও জাহাজ চোখে পড়ছে কিনা, অথবা মোহনার দিক থেকে কোনও জাহাজ ভেসে আসছে কিনা। দিল্লিদেশের একদল মেয়েকে নিয়ে বারানসী থেকে একটা বজরা আসার কথা। তারা কেউ কেউ নাকি সুলতানের হারেমেরও বাসিন্দা ছিল। এক ব্যবসায়ী তাদের কিনেছে। তার ব্যবসা হল গণিকালয়ে নারী সরবরাহ করা। তার থেকে মেয়েগুলোকে কেনার কথা মৎস্যগন্ধার। তার এই গণিকালয়ে নারীদের বয়স চল্লিশ অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তাদের আর এখানে রাখে না মৎস্যগন্ধা। তাদের সে অন্য কোনও গণিকালয়ের মালিকদের মতো বিক্রি করে না। মুক্তি দিয়ে দেয়। তারা কেউ কেউ বন্দরের কিছুটা তফাতে নদীর ধারে খোলার ঘরে কোনও লোকের উপপত্নী হয়ে জীবন কাটায়। সাধারণত বন্দরের নিম্নশ্রেণির লোকেরাই তাদের গ্রহণ করে। কেউ কেউ স্থানীয়ভাবে বেশ্যাবৃত্তিও করে। আবার কেউ কেউ হয়তো প্রলোভনে বা অন্য কোনও বিশ্বাসে চড়ে বসে বন্দরে ছেড়ে যাওয়া কোনও জাহাজে। তাদের কাউকে আর কোনওদিন এই তমালিকা বন্দরে ফিরে আসতে দেখেনি মৎস্যগন্ধা। চল্লিশবছর বয়সি বেশ কয়েকজন গণিকাকে ক'দিন আগে মুক্তি দিয়েছে। দিল্লির নারীদের দিয়ে মৎস্যগন্ধা সেই শূন্যস্থান পূরণ করবে। মৎস্যগন্ধা অবশ্য দুজন লোককে বন্দরে নিয়োজিত করেছে যারা সেই বজরা এলেই সংবাদ দেবে মৎস্যগন্ধাকে।

তার চিন্তার কিছু নেই। তবুও সে একবার দেখে নিল, নারী-পণ্যবাহী বজরা

BanglaBook.org

বন্দরে এসেছে কিনা। আরও একটা জিনিস খেয়াল হল তার। ওই নারীদের মূল্য চোকাবার জন্য বনিককে সোনা দিতে হবে। সোনা বা অর্থের অবশ্য কোনও অভাব নেই মৎস্যগন্ধার। শুধু নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তা সংগ্রহ করে আনতে হবে তাকে। এই বন্দরনগরীতে কেউ কেউ এমন কথাও বলে যে জমিদারের থেকেও নাকি বেশি বিত্তশালী মৎস্যগন্ধা। নইলে সে বছরখানেকের মধ্যে বানিয়ে ফেলেছিল ইটের তৈরি বিশাল এই গণিকালয়? তখনও তার গণিকালয়ের এত রমরমা হয়নি? কী ভাবে সে দেশবিদেশের জাহাজ থেকে চড়া দামে সংগ্রহ করেছিল বন্দর সুন্দরীদের? তবে মৎস্যগন্ধার সম্পদের উৎস সত্যিই এই গণিকালয় নাকি অন্যকিছু, তা সঠিকভাবে বলতে পারে না কেউ।

মৎস্যগন্ধা অবশ্য নদীতে স্নান করতে যায় না। তার দ্বিতল শয়নকক্ষ সংলগ্ন এক কক্ষেই তার স্নানের ব্যবস্থা। জল, চন্দন, সুগন্ধী আর প্রসাধনের যাবতীয় সামগ্রী মজুত থাকে সেখানে। মৎস্যগন্ধা তো আর সামান্য গণিকা নয়, এই গণিকালয়ের কর্ত্রী। তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা তো থাকবেই।

সে-কক্ষের দিকেই পা বাড়াতে যাচ্ছিল মৎস্যগন্ধা। কিন্তু সে কক্ষ ত্যাগ করতে চলেছে অনুমান করে কক্ষে প্রবেশ করল একজন। শ্যামা তার নাম। কৃষ্ণাঙ্গ বন্দর সুন্দরী। খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সে মৎস্যগন্ধার পরিচারিকার দায়িত্বও সামলায়। বছর বাইশ বয়স তার। জাতে সিংহলি, তবে স্থানীয় বাঙালা ভাষা সে খুব ভালো শিখে নিয়েছে বছরখানেকের মধ্যেই। নিজের দেশের সমুদ্র উপকূলে সঙ্গিনীদের সঙ্গে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল সে। জলদস্যুরা তাদের ধরে বেচে দেয় এক আরব জাহাজে। তারপর এ-জাহাজ সে-জাহাজ ঘুরে বেশ ক'বার হাতবদল হবার পর তমালিকা বন্দরে আসা এক জাহাজ থেকে তাকে কিনে নেয় মৎস্যগন্ধা। মেয়েটার গাত্রবর্ণের জন্য মৎস্যগন্ধা তার নাম রাখে শ্যামা। মেয়েটা বেশ চালাক আর বুদ্ধি সম্পন্নও। এবং একইসঙ্গে বিশ্বস্তও। এই গণিকালয়তে হাতে-গোনা যে-ক'জন গণিকার গণিকালয়ের বাইরে বেরবার অনুমতি আছে তার মধ্যে শ্যামা একজন। বিভিন্ন কার্যপলক্ষ্যে বন্দরের নানা স্থানে তো বটেই, এমনকী নগরীর ভিতরেও তাকে পাঠায় মৎস্যগন্ধা।

শ্যামা ঘরে ঢুকে মৎস্যগন্ধাকে বলল, 'আপনার স্নানের জন্য যা প্রয়োজন তা সব আমি সাজিয়ে রেখেছি। কাপড়, জলপাইয়ের তেল, চন্দনচূর্ণ—প্রসাধনের সব কিছু। তাছাড়া অন্য কোনও দ্রব্যের প্রয়োজন আছে?'

BanglaBook.org

মৎস্যগন্ধা বলল, 'না, প্রয়োজন নেই।' তারপর প্রশ্ন করল, 'ভিনদেশি যে জাহাজটা বন্দরে নোঙর করেছে তার সম্বন্ধে কোন খোঁজ পেলি?'

শ্যামা জবাব দিল, 'ওই পর্তুগিজ বণিকটা শুনলাম বন্দরে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। পেড্রো নামে যে সাদা চামড়ার ভিখারিটা এখানে থাকে, সে এখন নাকি নতুন জামাকাপড়-গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই বণিকের সঙ্গে। তবে জাহাজের নাবিকরা এখনও বন্দর অঞ্চলে তেমনভাবে ঘোরাফেরা শুরু করেনি।'

কথাটা শুনে মৎস্যগন্ধা বলল, 'তেমন হলে ওই বণিককে, নাবিকদের এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আসতে হবে। ওদের ব্যাপারে খোঁজ রাখিস। এখন তুই যা। প্রয়োজন হলে ডেকে নেব।'

কিন্তু কথাটা শুনেও দাঁড়িয়ে রইল শ্যামা। তাই দেখে মৎস্যগন্ধা বলল, 'তুই কিছু বলবি?'

শ্যামা একটু ইতস্তত করে বলল, 'একটা আর্জি ছিল।'

'কী আর্জি?'

শ্যামা জবাব দিল, 'সন্ধ্যাবেলায় জমিদারবাড়িতে একটা নাটকের পালা হবে। আপনি অনুমতি দিলে দেখতে যেতে পারি।'

জমিদার বাড়িতে নামসংকীর্তন, নাটক, পালাগান এসব লেগেই থাকে। মাঝে মাঝে মৎস্যগন্ধার থেকে অনুমতি নিয়ে সেসব দেখতে যায় শ্যামা। আসলে শ্যামার ঘরে এক নাগর আসে। হংসরাজ তার নাম। জমিদারের সেরেস্তায় কাজ করে আর পালায় অভিনয়ও করে। তার আমন্ত্রণেই মাঝে মাঝে নাটক পালা দেখতে যায় শ্যামা। মৎস্যগন্ধা ব্যাপারটা সম্বন্ধে অবগত। সে হেসে বলল, 'তোর ওই হংসরাজ নিশ্চই অভিনয় করবে নাটকে?'

শ্যামা মৃদু লজ্জিতভাবে বলল 'হ্যাঁ, চারুদত্ত নামের এক বণিকের চরিত্রে সে অভিনয় করবে। নাটকের নাম নাকি "মৃচ্ছকটিকম্"।'

'মৃচ্ছকটিকম!'—'মৃচ্ছকটিক'! এ শব্দদুটো তো খুব কাছাকাছি! শব্দটা শুনেই মৃদু চমকে উঠল মৎস্যগন্ধা। তাকে যে ময়ূরপঙ্খি উদ্ধার করেছিল তার নাম ছিল মৃচ্ছকটিক!

সে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'নাটকটা কী নিয়ে রে?'

শ্যামা বলল, 'হংসরাজ বলেছে এ-নাটক নাকি আমাদের নিয়ে। বসন্তসেনা নামের এক নগরনটী এ নাটকের নায়িকা।

BanglaBook.org

কথাটা শুনে আরও চমকে গেল মৎস্যগন্ধা। স্বয়ম্ভুনাথের মৃচ্ছকটিক তো ভ্রাম্যমান গণিকালয় ছিল! এমন নয়তো, সেই মৃচ্ছকটিককে নিয়ে এ নাটক রচিত হয়েছে? হয়তো বা তার কাহিনিও আছে এ নাটকে! মৎস্যগন্ধা কোথা থেকে এল, তার আসল পরিচয়ও বলা হয়েছে এ-নাটকে?

মৎস্যগন্ধা জমিদারবাড়িতে পা রাখে বছরে দু-বার। একবার বৎসরান্তে জমিদারের সেরেস্তায় সে খাজনা দিতে যায়। আর একবার যায় দুর্গাপূজার আগে একটা রুপোর ঘটে করে এখানকার মাটি দিতে। বেশ্যারা সমাজ থেকে ব্রাত্য হলেও বেশ্যালয়ের মাটি দুর্গাপূজার উপচার। তবে সে জমিদারবাড়িতে কোনও দিন কোনও উৎসবে যায়নি। যাবার কথাও নয়। কিন্তু 'মৃচ্ছকটিকম্' শব্দটা আর তার প্রধানা নায়িকা একজন নটী-গণিকা—এই ব্যাপারটা মৎস্যগন্ধাকে আকৃষ্ট করে ফেলল। যদি মিলে যায় তার অজানা প্রশ্নর উত্তর? আজ-ই তো আবার সে সেই স্বপ্নটা দেখল! আর সেই স্বপ্নটা দেখলে খালি তার মনে হয় 'আমি কোথা থেকে এলাম?'

শ্যামা তার মুখের দিকে চেয়ে অনুমতির প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে। একটু ভেবে নিয়ে শ্যামাকে অবাক করে দিয়ে মৎস্যগন্ধা বলল, 'হ্যাঁ রে, আমি যদি যাই তবে সে নাটক দেখতে পাব? আমাকে ওরা মহলে ঢুকতে দেবে?'

তার কথা শুনে শ্যামা উৎফুল্লভাবে বলল, 'আপনি যাবেন? নাটক তো মহলের ভিতর হয় না। হয় দেউড়ি পেরিয়ে মহলের গায়ে মাঠের মধ্যে। বাইরের অনেক লোক দেখতে যায়। কিছু মেয়েও থাকে। তাদের সঙ্গে বসেই আমি পালা দেখি। যদি মহলের ভিতরে হত তবে আমি কি দেখতে পারতাম?'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'যদি আমাকে কেউ চিনে ফেলে?'

শ্যামা তাকে আশ্বস্ত করে বলল, 'কীভাবে চিনবে? আমাদের মুখ তো কাপড়ে ঢাকা থাকবে। যেখানে আমরা বসি সে-জায়গাটাও অন্ধকার থাকে। তাছাড়া আমি তো আপনার সঙ্গে থাকছি। চিন্তার কোনও কারণ নেই।'

তার যাওয়াটা সমীচীন হবে কিনা তা বুঝে উঠতে পারল না মৎস্যগন্ধা। সে বলল, 'ঠিক আছে, আমি ভেবে দেখি। আর আমি যদি না-ও যাই, তুই নাটক দেখে এসে সঙ্গে সঙ্গে গল্পটা বলবি।'

মৎস্যগন্ধার কথা শুনে, 'আচ্ছা' বলে চলে গেল শ্যামা।

মৎস্যগন্ধা প্রবেশ করল স্নানঘরে। এঘরে দারুকাঠ দিয়ে বাঁধানো বিশাল এক আয়না আছে। মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দেখা যায় তাতে। ভিনদেশি

BanglaBook.org

এক শ্বেতাঙ্গ বণিক দারুকাঠের এই মুকুর উপহার দিয়েছিল মৎস্যগন্ধাকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চন্দন লেপনের জন্য প্রতিদিনের মতো ধীরে ধীরে পোশাক খসাতে শুরু করল মৎস্যগন্ধা। আয়নায় ধরা দিতে লাগল তার প্রতিচ্ছবি। শঙ্খের মতো উন্নত তার ধবল স্তনযুগল, জামফলের মতো বাদামি স্তনবৃন্ত, ক্ষীণ কটিদেশের মাঝখানে তৈলকূপের মতো গভীর নাভি, কদলীকান্ডর মতো ঊরু, গোলাপের পাপড়ির ভাঁজের মতো যোনীদেশ সবকিছুই উন্মুক্ত হয়ে গেল আয়নার সামনে। লোকে বলে এ গণিকালয়ের সেরা সুন্দরী নাকি মৎস্যগন্ধা। সে মনে মনে নিজেও বিশ্বাস করে কথাটা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেই অবাক হয়ে যায় নিজের অঙ্গরূপ দেখে। স্নানের আগে প্রত্যেকদিন আয়নার সামনে বেশ কিছুক্ষণ নিজের শরীরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মৎস্যগন্ধা। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা তার বৃন্তযুগল কি মৃদু আনত হল, দেহের চামড়ায় কোথাও কুঞ্চন জাগেনি তো? কোথাও জেগে ওঠেনিতো বাড়তি মেদ? শরীর-ই তো শ্রেষ্ঠ সম্পদ, মৎস্যগন্ধার মতো নারীর কাছে। যার টানে পতঙ্গের মতো ছুটে আছে পুরুষের দল। মৎস্যগন্ধা অবশ্য সবার সঙ্গে পালঙ্কে যায় না। জাহাজের নায়ক, ক্যাপ্টেন বা নগরীর সম্ভ্রান্ত বণিকরা উপযুক্ত কাঞ্চনমূল্য দিলে তবে মৎস্যগন্ধকে পায়। সেক্ষেত্রেও কিছু শর্ত রাখে মৎস্যগন্ধা। তার শরীরে কোথাও সামান্য কোনও ত্রুটি যাতে না হয় তার জন্য সর্বদা সজাগ থাকে মৎস্যগন্ধা। যে-কারণে বয়স তার তিরিশ হতে চললেও শরীর তার অষ্টাদশী নারীর মতোই।

আজও নগ্নিকা হয়ে আয়নার সামনে নানা ভঙ্গিতে নিজের শরীরের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল সে। কিন্তু একসময় সে বুঝতে পারল, এ-ব্যাপারটাতে অন্যদিনের মতো মনোসংযোগ করতে পারছে না। তার মাথায় শুধু ঘুরপাকে খাচ্ছে 'মৃচ্ছকটিকম্', 'মৃচ্ছকটিক'—এ-শব্দগুলো। তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল সেই দৃশ্য। অকূল পাথারে সে খালি ভাসছে! ভাসছে! আর তার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে খালি উঁকি দিতে লাগল সেই প্রশ্নগুলো—'আমি কে? কোথা থেকে এলাম? কোন নর-নারী সৃষ্টি করেছিল আমার এই শরীরটাকে?'

'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকে কি এ প্রশ্নের কোনও উত্তর মিলতে পারে? মৎস্যগন্ধা এক সময় সিদ্ধান্ত নিল, নাটকটা সে দেখতে যাবে। এই সিদ্ধান্ত নেবার পর অন্যদিনের মতোই শরীরে চন্দনচূর্ণ-লেপন শুরু করল মৎস্যগন্ধা।

BanglaBook.org

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল এক সময়। তমালিকা বন্দরে দাঁড়িয়ে আজ জাহাজগুলোর ডেকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল বেলাশেষের আলো। পণ্যবাহী জাহাজগুলোর ডেকে এ সময়টাতে নাবিকরা নানা আমোদে মেতে উঠলেও কেমন যেন এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে ক্ষয়িষ্ণু এই বন্দরের বুকে। একটা সময় ছিল যখন সারারাত জেগে থাকত এই বন্দর। সে অবশ্য বহু যুগ আগের কথা। কয়েক শত বছর তো হবেই। আর এখন বিকেল গড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দর ফাঁকা হতে শুরু করে। একটা জায়গাতেই শুধু ভিড় জমে, মৎস্যগন্ধার বেশ্যালয়ের সামনে।

অন্ধকার নামা শুরু হতেই একটা-একটা করে প্রদীপ জ্বালানো শুরু হল গণিকালয়ে। নীচ থেকে ভেসে আসতে লাগল মৃদু শোরগোলের শব্দ। খদ্দেরদের আগমন শুরু হয়েছে। নিজের ঘরেই প্রস্তুত হয়ে বসেছিল মৎস্যগন্ধা। ছদ্মবেশ ধারণের জন্য পুরানো জেল্লাহীন পোশাক তার পরনে। অলঙ্কারও সব খুলে রেখেছে সে। শুধু ছুরিটা গোঁজা আছে তার কোমরে। শ্যামা এসে ঘরে প্রবেশ করতেই পালঙ্কে রাখা কালো চাদরটা তুলে নিল সে। সদর দরজায় খদ্দেরদের ভিড়। তাই নীচে নেমে কালো চাদরে নিজেকে মুড়ে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে শ্যামার সঙ্গে সে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল।

লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচিতে যে-জায়গাগুলো একসময় মুখরিত ছিল সে- জায়গাগুলো এখন শুনশান। মালটানা গো-শকটের বলদগুলো অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে। অন্ধকার গুদামঘর সংলগ্ন দু-একটা গদিঘরে শুধু টিম টিম করে আলো জ্বলছে। দিনশেষে ঘরে ফেরার আগে ব্যবসার হিসেব নিকেশ মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে সেখানে। সে আলোগুলোও আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিভে যাবে। বন্দর অঞ্চলের সর্পিল গলিপথ বেয়ে প্রধান সড়কে উঠে এল মৎস্যগন্ধা। সে রাস্তা সোজা চলে গেছে রাজবাড়ির দিকে। যে রাস্তায় সামান্য কিছু লোকজন থাকলেও দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। তমালিকা বন্দর-কেন্দ্রিক এই নগর। বন্দরের কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নগরীও আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে। তবে মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ছোট-বড়

BanglaBook.org

নানা মন্দির আছে এ নগরীতে। সন্ধ্যারতি হচ্ছে সেখানে। বেশ কিছুটা এগোবার পর জমিদারবাড়ির সিংহতোরণের মাথার মশালের আলো দেখতে পেল তারা। সেখানে পৌঁছে মৎস্যগন্ধা দেখতে পেল দেউড়ির সামনে ছোটখাটো একটা ভিড় জমেছে। জমিদারের দুজন পাইক সেখানে মাথায় পাগড়ি এঁটে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকলেও ফটক উন্মুক্ত। বাইরের লোককে তারা ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে না। লোকজন যাওয়া-আসা করছে। দু-চারজন নারীও আছে তার মধ্যে। মৎস্যগন্ধা ব্যাপারটা দেখে আশ্বস্ত হল। তার আর শ্যামার, দুজনেরই মুখ চাদরে ঢাকা। ভিড়ের সঙ্গে মিশে সিংহদুয়ার অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করল তারা।

বিশাল রাজবাড়ি প্রদীপের আলোয় আলোকিত। বিশেষত, দ্বিতল রাজবাড়ির একতলার যে অলিন্দে বসে জমিদার পালা দেখবেন সে-জায়গা ঝাড়বাতির আলোতে ঝলমল করছে। মখমলের গালিচা পেতে ফুল-মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে সে-জায়গা। আর তার ঠিক মাথার ওপরের অলিন্দ ঘেরা হয়েছে স্বচ্ছ কাপড়ের পর্দা দিয়ে। যেখানে বসে পালা দেখবে অন্তঃপুরবাসীরা। শামিয়ানার নীচে কাঠের মঞ্চ বানানো হয়েছে জমিদার যেখানে বসবেন সেদিকে মুখ করে। আর মঞ্চর দুপাশে কিছুটা তফাতে বাঁখারির বেড়াটোপের মধ্যে মাটিতে বহিরাগত সাধারণ মানুষদের বসার স্থান। এক পাশে পুরুষ, অন্যপাশ মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। রাজবাড়ি আর মঞ্চটা প্রদীপের আলোতে আলোকিত হলেও মঞ্চের দুপাশে আমজনতার বসার স্থান অন্ধকারই বলা চলে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জনসমাগম হয়েছে সেখানে। শ্যামার সঙ্গে গিয়ে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাতে ঘাসের ওপর বসল মৎস্যগন্ধা। সে খেয়াল করে দেখল, আগেপাশে যারা বসে আছে পালা দেখার জন্য তারা সবাই নিম্ন শ্রেণির শ্রমজীবী মহিলা। এটাই স্বাভাবিক। গৃহস্থবাড়ির নারীরা এভাবে বসে পালা দেখে না।

সময় এগিয়ে চলল। লোক সমাগমও বেড়ে চলল। তার সঙ্গে শুরু হল জমিদার বাড়ির কর্মচারীদের ব্যস্ততা। দুটো পালকি এসে সোজা চলে গেল জমিদারবাড়ির ভিতর। নিশ্চই কোনও সম্ভ্রান্ত বণিক পরিবারের নারীরা আছে পালকির ভিতর! রাজপরিবারের নারীদের সঙ্গে পর্দার আড়ালে বসে নাটক দেখবে তারা। অন্ধকারে বসে চারপাশের সবকিছু লক্ষ করতে লাগল মৎস্যগন্ধা। বুকের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছে তার।

BanglaBook.org

অবশেষে একসময় নির্দিষ্ট ক্ষণ উপস্থিত হল। মঞ্চের ঠিক নিচে বসা বাদ্যকরের দল বাজনা বাজাতে শুরু করল। একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হল—'জমিদার আসছেন! জমিদার আসছেন!'

আর তারপরই উঠে দাঁড়াল সবাই। মৎস্যগন্ধাও উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতল জমিদারবাড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে পাত্র-মিত্র-সভাসদ-পরিবৃত হয়ে অলিন্দে আসন গ্রহণের জন্য উপস্থিত হলেন জমিদার যদুনাথ রায়। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে একবার তিনি হাত নাড়লেন। জনতাও যে-যেখানে দাঁড়িয়েছিল তারাও হাতজোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানাল তাঁকে। তাকিয়াতে ঠেস দিয়ে বসলেন তিনি। একজন রুপোর গড়গড়ার নল তুলে দিল তাঁর হাতে।

ঢং করে নাটক শুরুর ঘণ্টা বাজল। প্রথমে মঞ্চে উঠে কুশীলবরা সার বেঁধে দাঁড়াল। বসন্তসেনাসহ বেশ কিছু নারীচরিত্রও আছে নাটকে। বেলা বাহুল্য পুরুষরাই নারীর পোশাকে সেসব চরিত্রে অভিনয় করবে। প্রথমে তারা সমবেত হয়ে জমিদারকে প্রণাম জানিয়ে মঞ্চ ছেড়ে নেমে গেল। শুধু রয়ে গেলেন সূত্রধর। তিনি জানালেন, 'মৃচ্ছকটিকম' নামের এই সংস্থা নাটকের রচয়িতা হলেন শূদ্রক। মৃচ্ছকটিকম্ এই সংস্কৃত শব্দের অর্থ হল মৃৎ শকট—মাটির তৈরি গাড়ি।

BanglaBook.org

শুরু হয়ে গেল নাটক মৃচ্ছকটিকম্। মৎস্যগন্ধা উত্তেজিত ভাবে চেয়ে রইল মঞ্চর দিকে। গল্পের মূল বিষয় হল বণিক চারুদত্তের সঙ্গে নগরনটী বসন্তসেনার প্রেমকাহিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য মৎস্যগন্ধা বুঝতে পারল, এ-নাটক স্বয়ম্ভুনাথের মৃচ্ছকটিককে নিয়ে নয়। এ এক সম্পূর্ণ অন্য কাহিনি। ব্যাপারটাতে মৎস্যগন্ধা আশাহত হলেও মজে গেল নাটকের মধ্যে।

এগিয়ে চলল নাটক। ভাগ্য বিপর্যয়ে প্রায় নিঃস্ব বণিক চারুদত্ত ও তার স্ত্রী ধূতা। নগরনটী বসন্তসেনা ভালোবাসে চারুদত্তকে। একদিন চারুদত্তর শিশুপুত্র প্রতিবেশী এক বালকের কাছে একটা স্বর্ণ শকট দেখে পিতার কাছে তেমন একটা স্বর্ণ শকট দাবি করে বসে। স্বর্ণ শকট দিতে অক্ষম চারুদত্ত তাকে একটা মৃৎশকট 'মৃচ্ছকটিকম' এনে দেয়। মাটির তৈরি শকটের কোনও মূল্য নেই। কাজেই সেই শকট উপহার দিয়ে চারুদত্ত পুত্রকে শান্ত করতে পারে না। এ-সংবাদ জানতে পেরে বসন্তসেনা তার সব স্বর্ণালঙ্কার খুলে তুলে দেয় চারুদত্তর হাতে। যাতে সে স্বর্ণ শকট গড়ে দিতে পারে তার পুত্রকে। নিজের

স্বর্ণালঙ্কারের থেকে প্রেমিকের মুখে ফুটে ওঠা হাসিকেই বেশি দামি মনে করে গণিকা বসন্তসেনা। কিন্তু বণিক চারুদত্তর সঙ্গে বসন্তসেনার প্রেম মেনে নেয় না সমাজ। কারণ, বসন্তসেনা যে নগরনটী—গণিকা। পুরুষ তার শরীর স্পর্শ করতে পারে কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সে অচ্ছুত। রাজার শ্যালক কামাতুর কোটাল 'শকার' বসন্তসেনার থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে চক্রান্ত শুরু করে বসন্তসেনার বিরুদ্ধে। বিপর্যয় নেমে আসে বসন্তসেনার জীবনে। এক সময় বসন্তসেনার জীবনটাই, তার ভালোবাসা-আত্মত্যাগ-প্রেম—সব কিছুই মৃচ্ছকটিকমের মতোই মূল্যহীন হয়ে গেল। নাটকের শেষ দৃশ্যে যখন বাঁশির সুরে বসন্তসেনার হাহাকার বেদনা ছড়িয়ে পড়ছে নাট্যমঞ্চে, তখন আর নিজের চোখের জল ধরে রাখতে পারল না মৎস্যগন্ধা। নাটক দেখতে দেখতে কখন যেন সে একাত্ম হয়ে গেছিল বসন্তসেনার সঙ্গে। আর সত্যিই তো, যুগে যুগে বসন্তসেনাদের মতোই তো আজকের মৎস্যগন্ধাদেরও জীবন। সমাজের চোখে মৎস্যগন্ধাদের কোনও মন নেই, শুধু দেহ আছে। সমাজের কাছে তারা ব্রাত্য। দুর্গাপুজোতে গণিকালয়ের মাটি পুজোর উপচার হিসাবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তাদের পায়ের স্পর্শে নাটমন্দির অপবিত্র হবে বলে মৎস্যগন্ধাদের প্রবেশাধিকার থাকে না সেখানে।

নাটক ভেঙে গেল। জমিদার গাত্রোত্থান করে অন্দরমহলে চলে যাবার পর সমবেত জনতাও জমিদারবাড়ি পরিত্যাগ করল। মৎস্যগন্ধাও রাজবাড়ির সিংহতোরণের বাইরে এসে শ্যামাকে নিয়ে ফেরার পথ ধরল।

চাঁদ উঠেছে আকাশে। পথ চলতে অসুবিধা নেই। চলতে চলতে শ্যামা বেশ উৎফুল্লভাবে জানতে চাইল, 'নাটক কেমন দেখলেন? হংসরাজের অভিনয় কেমন লাগল?'

শ্যামা যে তার নাগরের অভিনয়ের ব্যাপারে জানতে চাইবে সেটাই স্বাভাবিক। মৎস্যগন্ধা জবাব দিল, 'ভালো। তবে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে বসন্তসেনার চরিত্রে যে অভিনয় করেছে তাকে। কী অপূর্ব অভিনয়! সে যে নারী নয়, তা বোঝাই যাচ্ছিল না!'

একথা বলার পর একটু চুপ করে থেকে মৎস্যগন্ধা শ্যামাকে প্রশ্ন করল 'তুই ওই হংসরাজ বলে লোকটাকে খুব ভালোবাসিস, তাই না? যে কারণে উপার্জন ফেলে তার পালা দেখতে ছুটে আসিস?'

শ্যামা মৃদু লজ্জিতভাবে জবাব দিল, 'হ্যাঁ। তাকে শরীর দিয়ে কোনও অর্থ

BanglaBook.org

আমি নিই না। আপনার হাতে যা তুলে দিই তা অন্য খদ্দেরদের থেকে পাওয়া আমার সঞ্চিত অর্থ।'

কথাটা শুনে মৎস্যগন্ধা বলল, 'ঠিক আছে, ওই লোকটা তোর ঘরে এলে এরপর থেকে তার জন্য কোনও পয়সা দিতে হবে না তোকে। ওর জন্যেই তো এত চমৎকার পালাটা দেখতে পেলাম।'

মৎস্যগন্ধার কথায় চাঁদের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল শ্যামার মুখ। সে বলে উঠল, 'জমিদারবাড়িতে তো মাঝে মাঝেই এমন পালা হয়। হংসরাজ অভিনয় করে। আপনি আবার দেখতে আসবেন?'

শ্যামার এ-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মৎস্যগন্ধা অন্য একটা প্রশ্ন করল তাকে। মৎস্যগন্ধা বলল, 'আচ্ছা, তুই তো লোকটাকে ভালোবাসিস, নিশ্চই লোকটার কাছে তোর সর্বস্ব দিতে পারিস। ধর, আমি তোকে মুক্তি দিলাম। হংসরাজকে যদি তুই বিয়ে করতে চাস তবে কি সে রাজি হবে?'

প্রশ্নটা শুনেই উজ্জ্বলতা মুছে গেল শ্যামার চোখ থেকে। শ্যামা জবাব দিল, 'না করবে না। শুনেছি তার স্ত্রী কলহপ্রিয়, লোভী চরিত্রা। যৌবনও অতিক্রান্ত হয়েছে তার। কিন্তু হংসরাজ আমার সঙ্গে রাত কাটালেও, আমি তাকে ভালোবাসলেও, সে আমাকে বিবাহ করবে না। কারণ সমাজ তা মেনে নেবে না। আমি তো বারবনিতা।'

মৎস্যগন্ধা আর কোনও কথা বলল না তাকে। নাটকটা দেখার পর থেকেই বিষণ্ণতা গ্রাস করেছে তার মনকে।

চাঁদের আলোতে পথ চলতে চলতে সে ভাবতে লাগল সত্যি তো বারবনিতার জীবন মাটির শকটের মতোই মূল্যহীন। আর সেজন্যই কি স্বয়ম্ভুনাথ তাঁর গণিকাবাহী সমুদ্র-শকটের নাম রেখেছিলেন 'মৃচ্ছকটিক?' সে ময়ূরপঙ্খীর নারীরাও তো ছিল মাটির ঢেলার মতো মূল্যহীন।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনশূন্য হয়ে গেছে পথ। আসার পথে যে দু-চারজন লোকের দেখা মিলছিল এখন তা-ও নেই। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিও আর শোনা যাচ্ছে না। শুধু পথের পাশে যে বড় বড় আম-কাঠালের বাগান আছে তার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে শিয়ালের ডাক। সে শব্দ রাত্রির নির্জনতাকে আরও যেন বাড়িয়ে তুলছে।

নিশ্চুপ ভাবে চলতে চলতে একসময় তারা পৌঁছে গেল বন্দর অঞ্চলে। ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে জায়গাটা। বড় বড় গুদামঘরগুলো থাকায় চাঁদের

BanglaBook.org

আলো প্রবেশ করছে না সর্পিল পথে। তবে মৎস্যগন্ধাদের তেমন অসুবিধা নেই। চেনা রাস্তা, চেনা গলি। দুজন প্রবেশ করল অন্ধকার গলিপথে।

তারা তখন গণিকালয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। বড় বড় বাড়িগুলোর আড়াল থেকে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছে মৎস্যগন্ধার বনিতাগৃহের ছাদে বসানো প্রদীপ মালা। সেদিক থেকে লোকজনের অস্পষ্ট শব্দও ভেসে আসছে। আগের মতোই বাড়িটার পিছন দিয়ে সেখানে প্রবেশ করার জন্য যে-পথে তারা আসছিল সে-পথ ছেড়ে অন্য একটা গলিতে বাঁক নিল তারা। আর বাঁক নিতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল তাদের। গুদামঘরগুলোর ফাঁক গলে কীভাবে যেন একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে পথের মাঝে। সেই আলোতে মৎস্যগন্ধারা দেখতে পেল, রাস্তার পাশের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে দুজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল একজন লোকের ওপর। একটা ঝটাপটি শুরু হল। যে লোকটা আক্রান্ত হল তার কোমরে একটা তলোয়ার থাকলেও আকস্মিক আক্রমণে সেই তলোয়ার খোলার সুযোগ পেল না সে। একটা লোক পিছন থেকে কাষ্ঠদন্ডর ঘা বসিয়ে দিল তার মাথায়। বিজাতীয় ভাষায় আর্তনাদ করে মাটিতে ছিটকে পড়ল লোকটা। তার কোমরের গেঁজ থেকে একটা থলে পথের মাঝে পড়ে ঝনঝন শব্দে প্রথমে বেজে উঠল, তারপর তার থেকে মুদ্রা ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। আক্রান্ত লোকটা সম্ভবত জ্ঞান হারাল। আর আক্রমণকারীরা উদ্যত হল সেই থলে আর মুদ্রাগুলো সংগ্রহ করার জন্য।

ব্যাপারটা মৎস্যগন্ধাদের চোখের সামনে ঘটে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। ব্যাপারটা কী ঘটল, বুঝতে অসুবিধা হল না তাদের। নির্জন পথে সম্ভবত কোনও বিদেশিকে একলা পেয়ে আক্রমণ করেছে বন্দর-তস্করদের দল। বন্দর অঞ্চলে জমিদারের পেয়াদারা টহল দিলেও মাঝে মাঝে এ ঘটনা ঘটে। ব্যাপারটা বুঝে ওঠামাত্রই মৎস্যগন্ধা চিৎকার করে ছুটল সেদিকে। এমনওতো হতে পারে, যে-লোকটা মাটিতে পড়ে গেল, সে তাদের খদ্দের? টাকার থলি নিয়ে সে তার গণিকালয়েই যাচ্ছিল আনন্দলাভের জন্য? এ-ঘটনা প্রচারিত হলে ক্ষতি হবে মৎস্যগন্ধার। তস্করলুটেরাদের ভয়ে রাতে অনেকে এ পথ মাড়াতে চাইবে না। এসময় হঠাৎ মৎস্যগন্ধাদের উপস্থিতি আশা করেনি লুঠেরারা। তাই প্রাথমিক অবস্থায় একটু চমকে উঠল তারা। কিন্তু যে-দুজন তাদের দিকে ছুটে আসছে, তারা নারী, দেখে কাষ্ঠদণ্ডধারী এগিয়ে এল তাদের দিকে। কিন্তু লোকটা দণ্ড দিয়ে মৎস্যগন্ধাকে আঘাত করার আগেই সে কোমর

BanglaBook.org

থেকে ছুরিটা খুলে নিয়ে চালিয়ে দিল লোকটার বাহু লক্ষ্য করে। লুঠেরা আর্তনাদ করে উঠল। দণ্ড খসে পড়ল তার হাত থেকে। দ্বিতীয় তস্কর-লুঠেরা প্রথমজনকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই চাদরটা খসে গেল মৎস্যগন্ধার গা থেকে। মৎস্যগন্ধাকে বন্দর অঞ্চলে সবাই চেনে। মৎস্যগন্ধা তস্কর দুজনকে না চিনলেও দ্বিতীয় আক্রমণকারী চিনে ফেলল তাকে। আহত সঙ্গীর উদ্দেশ্যে সে বলে উঠল, 'আরে, এ যে গণিকা মৎস্যগন্ধা! পালাও!'

আর এর পরক্ষণেই ভোজবাজির মতো রাস্তার পাশের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল লুঠেরারা। মৎস্যগন্ধা আর তাদের পিছু ধাওয়া না করে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার কাছে গিয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল। অজ্ঞান হয়ে গেছে লোকটা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাথা। তার চামড়ার রং আর পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছে, লোকটা এদেশের লোক নয়। শ্যামা বলল, 'সম্ভবত এ-লোক ওই পর্তুগিজ জাহাজেরই কেউ হবে।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। এ লোকটাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। তুই একটা কাজ কর তাড়াতাড়ি গিয়ে কয়েকজন লোক ডেকে নিয়ে আয়।'

মৎস্যগন্ধার নির্দেশ পালন করে শ্যামা ছুটল গণিকালয়ের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজন লোককে নিয়ে ফিরে এল সে। ততক্ষণে মৎস্যগন্ধা মাটি থেকে রুপোর টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আবার থলেতে ভরে ফেলেছে। আহত লোকটাকে তুলে নিয়ে সবাই এগোল গণিকালয়ের দিকে। পিছনের দরজা দিয়েই সেখানে তারা প্রবেশ করল। খদ্দেরদের ভিড়ে জমজমাট গণিকালয়। একতলার এক-একটা অংশে এক এক জাতের গণিকারা থাকে। খদ্দেররা নিজেদের পছন্দমতো নির্বাচন করে তাদের। দোতলার একটা অংশতেও তারা থাকে। তবে মৎস্যগন্ধা যে-অংশে থাকে সে-জায়গাটা পৃথক। সেখানে ওঠার জন্য পৃথক একটা সিঁড়িও আছে। আহত-রক্তাক্ত লোকটাকে দেখলে খদ্দেরদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে ভেবে মৎস্যগন্ধা নির্দেশ দিল সংজ্ঞাহীন লোকটাকে সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠাবার জন্য। লোকটাকে তুলে এনে শোয়ানো হল মৎস্যগন্ধার শয়নকক্ষ সংলগ্ন এক কক্ষে। এ কক্ষগুলো অনেক সময় তার নিজের খদ্দেরদের জন্য ব্যবহার করে থাকে মৎস্যগন্ধা। তাকে পালঙ্কে শোয়ানোর পর প্রদীপের আলোতে ভালো করে দেখল মৎস্যগন্ধা। আহতব্যক্তি

BanglaBook.org

যে ভিনদেশি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সুপুরষ চেহারা, গাত্রবর্ণ রক্তাভ, মাথার চুল, গোঁফের রংও লালচে। যদিও তার চোখের পাতা বন্ধ, তবুও লোকটার মুখমণ্ডলে একটা সম্ভ্রান্ত ভাব আছে। মৎস্যগন্ধা অনুমান করল, এ যুবকের বয়স সম্ভবত বছর তিরিশ হবে।

রক্তপাত এখনও কমেনি। মৎস্যগন্ধার নির্দেশে এরপর লোকটার পরিচর্যা শুরু করল শ্যামা আর একজন গণিকা। প্রাথমিক চিকিৎসার নানা উপকরণ মজুত থাকে এই গণিকালয়ে। খোলে জড়িবুটি আর পাথরকুচি পাতা থেঁতো করে ক্ষতস্থানে তার পুরু প্রলেপ দিতেই রক্তপাত বন্ধ হল। তারপর পরিষ্কার কাপড়ের পটি জড়ানো হল লোকটার মাথায়। এসব [illegible] তই মধ্যরাত অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

তবে যুবকের জ্ঞান ফিরল না। তাকে সেই ঘরে রেখে ঘর ছাড়ল সবাই। মৎস্যগন্ধাও ফিরে এল তার নিজের কক্ষে। সেই রেশমের থলেটা মৎস্যগন্ধার কাছেই ছিল। পালঙ্কের ওপর থলেটা উপুড় করে মুদ্রাগুলো ঢালল মৎস্যগন্ধা। গুনে দেখল একশো মুদ্রা আছে সেখানে। মৎস্যগন্ধা যদি এ মুদ্রাগুলো সরিয়ে ফেলে তবে তার দায় পড়বে সেই লুঠেরাদের ওপর। অন্য কেউ হলে হয়তো অর্থ লাভের এ সুযোগ হাতছাড়া করত না। নিদেন পক্ষে কিছু মুদ্রা সরিয়ে রাখত। কিন্তু মৎস্যগন্ধা বারবনিতা হলেও শঠ-প্রতারক-তস্কর নয়। পরদ্রব্যে তার কোনও লোভ নেই। আর এ শিক্ষা যে ও পেয়েছে সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নিশাদপাদের কাছ থেকে। ইচ্ছা করলেই তো তিনি...।

মুদ্রাগুলো আবার সেই রেশমের থলের মধ্যে ভরে ফেলল মৎস্যগন্ধা। রানি পালঙ্কের একপাশে শুয়ে চোখ পিটপিট করে দেখছে আর লম্বা লম্বা হাত দিয়ে পেট চুলকাচ্ছে। এর একটা ইঙ্গিত আছে। বাচ্চা শিশুদের যেমন গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে হয় তেমনই মৎস্যগন্ধাকেও হাত বুলিয়ে দিতে হয় রানির পেটে। তাতে আরাম পায় প্রাণীটা। এক অর্থে রানিও তো শিশু। সে তো শিশুর মতোই সরল। সে কি বলতে চাইছে বুঝতে পেরে মৎস্যগন্ধা তার দিকে তাকিয়ে হাসল তারপর তেলের প্রদীপটা নিভিয়ে রানির পাশে শুয়ে তার পেট চুলকে দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরাম পেয়ে রানি ঘুমিয়ে পড়ল। সাপের মতো ফোঁস ফোঁস শব্দ হতে শুরু করল তার স্ফীত নাসারন্ধ্র দিয়ে।

কিন্তু মৎস্যগন্ধার ঘুম আসছে না। তার চোখে আবার ভেসে উঠতে লাগল

BanglaBook.org

নাটকের দৃশ্যগুলো। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আবারও এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা গ্রাস করতে লাগল তাকে। খালি মনে হতে লাগল, তার জীবনটাও কি 'মৃচ্ছকটিকম' হয়ে থাকবে? তার জীবনের শেষ পরিণতিও কি তবে ভর্তিকার মতো অজানা সমুদ্রে ভেসে যাওয়া? বসন্তসেনার মতো সে-ও কি তবে কোনওদিন ঘর পাবে না?

অর্থের অভাব নেই মৎস্যগন্ধার। একটা জাহাজ কিনে নেবার মতো সম্পদ তার আছে। অন্য কোথাও চলে গিয়ে মহল বানিয়ে বাকি জীবনটা সেখানে অতিবাহিত করার মতো টাকাও তার আছে। এক-এক সময় মনে হয়, এই গণিকালয় ছেড়ে, এই তমালিকা বন্দর ছেড়ে সে চলে যাবে অন্য কোনও দেশে। যেখানে সে ঘর বাঁধবে অন্য কারও সঙ্গে। সে লোক যেকোনও বর্ণের যে-কোনও ধর্মের মানুষ হলেও আপত্তি নেই মৎস্যগন্ধার। সে একটাই শুধু দাবি জানাবে সেই পুরুষের কাছে। লোকটা যেন মৎস্যগন্ধার শরীরটাকেই শুধু ভালো না বাসে। মনটাকেও যেন ভালোবাসে।

রাত এগিয়ে চলল। আর তার সঙ্গে বিষণ্ণতা যেন আরও ঘিরে ধরতে লাগল তাকে। না ঘুমিয়ে সে নানা কথা ভাবতে ভাবতে পালঙ্কে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। রাত যত ভোরের দিকে এগোতে লাগল ততই স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল বাড়িটার একতলা থেকে ভেসে আসা খদ্দেরদের আনাগোনার, মেয়েদের চপল রঙ্গতামাশার শব্দ। একসময় নীচ থেকে গণিকালয়ে প্রবেশের ভারী দরজাটা বন্ধ হবার পরিচিত শব্দ কানে এল মৎস্যগন্ধার। অর্থাৎ শেষ খদ্দের গণিকালয় ত্যাগ করল।

মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে। পালঙ্কে আর শুয়ে থাকতে ভালো লাগল না মৎস্যগন্ধার। উঠে গিয়ে সে দাঁড়াল গবাক্ষের সামনে। বাইরে এখন বুড়ি চাঁদ মরে গেছে। তার আবছা আলোতে নদীর মাঝখানে সার বেঁধে নোঙর করে আছে ঘুমন্ত জাহাজগুলো। কোথাও কোনও শব্দ নেই। বন্দর এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জেগে উঠবে বন্দর। নদীর দিক থেকে মৃদু ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। সেই বাতাসে আরামবোধ হল মৎস্যগন্ধার। একসময় পুব আকাশে শুকতারা ফুটে উঠল। ভোরের সংকেতধ্বনি। সেই শুকতারার দিকে তাকিয়ে শীতল বাতাসের স্পর্শে ধীরে ধীরে মৎস্যগন্ধার মনের বিষণ্ণতা কেটে গেল। পুবের আকাশ লাল হতে শুরু করল তারপর। এই তমালিকা বা তাম্রলিপ্তি বন্দরের নামের পিছনে যে ভিন্ন ভিন্ন গল্পগুলো

BanglaBook.org

আছে তার মধ্যে একটা হল, পূর্ব ভারতের এই বন্দরেই নাকি প্রথম সূর্যালোক এসে পড়ে। তাম্রবর্ণের প্রথম সূর্যালোক লেপিত হয় এই বন্দরে। আর তার থেকেই এ বন্দরের নাম তাম্রলিপ্তি। 'লিপ্তি' শব্দের অর্থ লেপন।

আলো ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর বুকে। নদীবক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সারসার নৌকা জাহাজগুলোর বুকে। এবার শুরু হবে বন্দরের কর্মব্যস্ততা। যদিও এই গণিকালয়ের ঘুম দুপুরের আগে ভাঙবে না। নদীর দিকে তাকিয়ে মৎস্যগন্ধা ভাবল, আজ নিশ্চই বারানসী থেকে আসা সেই বজরা বন্দরে ভিড়বে।'

আর এর পরই মৎস্যগন্ধার খেয়াল হল, গত রাতে তুলে আনা সেই লোকটার কথা। তার জ্ঞান ফিরল কি? যদি না ফেরে তবে পর্তুগিজ জাহাজে খবর পাঠাতে হবে, লোকটা যদি তাদের হয় তবে তাকে নিয়ে যাবার জন্য।

কথাটা মনে হতেই মৎস্যগন্ধা তার ঘর ছেড়ে অলিন্দ দিয়ে প্রবেশ করল পাশের সেই ঘরে।

খোলা জানলা দিয়ে সে-ঘরেও আলো প্রবেশ করেছে। অন্ধকার কেটে গেছে। ঘরে পা দিয়েই মৎস্যগন্ধা দেখতে পেল মৃদুমৃদু নড়ছে লোকটা। জ্ঞান ফিরেছে কি তবে? মৎস্যগন্ধা তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়াল তার পালঙ্কের সামনে। ভোরের প্রথম আলো এসে পড়েছে যুবকের মুখমণ্ডলে। বন্ধ চোখের পাতা মৃদু মৃদু কাঁপছে। আর এরপরই চোখের পাতা খুলল সেই যুবক। চোখের দৃষ্টি ছাদ, ঘরের দেওয়ালগুলো ছুঁয়ে স্থির হল মৎস্যগন্ধার চোখের দিকে। মৎস্যগন্ধা স্থির দৃষ্টিতে তাকাল যুবকের চোখের দিকে। মৃদু বিস্মিতও হল মৎসগন্ধা। এত সুন্দর ঘন নীল চোখ এর আগে কোনওদিন কারও দেখেনি মৎস্যগন্ধা। ঠিক যেন সমুদ্রর মতো ঘন নীল চোখ তার!

কয়েক মুহূর্ত এভাবেই কেটে গেল। তারপর যুবকের চোখেও বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। ঈষৎ যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে সে বলল, 'এ কোন জায়গা? আমি এখানে এলাম কী ভাবে?'

পর্তুগিজ ভাষাটা বন্দরে থাকার সুবাদে একটু-আধটু বলতে ও বুঝতে পারে মৎস্যগন্ধা। যেমন সে আরও বেশ কয়েকটা ভাষা কিছুটা বলতে ও বুঝতে পারে।

যুবকের কথার জবাবে মৎস্যগন্ধা মৃদু হেসে জবাব দিল, 'এটা একটা গণিকালয়।'

''গনিকালয়!' শব্দটা শুনে আরও বিস্মিত হল সেই পর্তুগিজ যুবক। হাতে

BanglaBook.org

ভর দিয়ে সে পালঙ্কে উঠে বসে জানতে চাইল, 'আমি এখানে কীভাবে এলাম?'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'গত রাতে তস্করের দল তোমাকে আক্রমণ করেছিল। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলে তুমি। ভাগ্যিস আমরা সেসময় উপস্থিত হই সেখানে! সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে তোমাকে এখানে তুলে আনা হয়েছে।'

এবার সব মনে পড়ে গেল পর্তুগিজের। সে বলে উঠল, 'আমার টাকা? সেগুলো কি তারা নিয়ে গেছে?'

মৎস্যগন্ধা তাকে আশ্বস্ত করে প্রথমে বলল, 'না, নিতে পারেনি। সেগুলো আমার কাছেই আছে।'

এ কথা বলার পর মৎস্যগন্ধা জানতে চাইল, 'তুমি নিশ্চই নতুন আসা পর্তুগিজ জাহাজটার নাবিক?'

মৎস্যগন্ধাকে বিস্মিত করে পর্তুগিজ বলল, 'আমার নাম এস্তাদিও। ওই জাহাজটা আমারই। আমি পর্তুগিজ বণিক। ক'দিন হল বন্দরে এসেছি।'

খবরটা শুনে বেশ খুশি হল মৎস্যগন্ধা। সে যার খোঁজ করেছিল ঘটনাচক্রে লোকটা নিজেই এখন উপস্থিত এঘরে! মৎস্যগন্ধা হাতজোড়ে করে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'মৎস্যগন্ধা তার গণিকালয়ে বণিককে স্বাগত জানাচ্ছে।'

এই তবে সেই মৎস্যগন্ধা! যুবক তাকিয়ে রইল মৎস্যগন্ধার মুখের দিকে। সত্যি এ-নারী অপরূপা! এত সুন্দর নারী এর আগে বিশেষ দেখেনি এস্তাদিও।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মৎস্যগন্ধা চপল হেসে বলল, 'ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে তুমি কী দেখছ?'

প্রশ্নটা শুনে যেন মৃদু লজ্জা পেল যুবক। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে সে বলল, 'কিছু না।'

'কিছু না?' হেসে ফেলল মৎস্যগন্ধা।

এস্তাদিও এবার অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা কাটাবার জন্য বলল, 'ব্যাপারটা এমন ঘটবে আমি ভাবিনি। বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধার জন্য কাছেই একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি আমি। সেখানে একটা রাতও কাটিয়েছি। এক বণিককে কিছু পণ্য বিক্রি করেছি। তার গুদাম সংলগ্ন বাড়ি। লোকটার কাছে সেসময় টাকা মজুত ছিল না। বলেছিল রাতে এসে টাকা নিয়ে যেতে। তাই তার বাড়ি গেছিলাম। সে আমাকে সেখানে রাতের খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। তার সঙ্গে আমার আরও কিছু ব্যবসায়িক আলোচনাও ছিল। সেসব মিটিয়ে টাকা নিয়ে পথে নামতে বেশ রাত হয়ে গেছিল। তারপর এই ঘটনা।'

BanglaBook.org

মৎস্যগন্ধা বলল, 'নতুন জায়গা। তোমার একটু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল।'

এস্তাদিও সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, তবে আমি শুনেছিলাম তমালিকা বন্দর খুব শান্ত জায়গা।'

মৎস্যগন্ধা হেসে বলল, 'হ্যাঁ, অন্য বন্দরের তুলনায় এ বন্দর শান্ত ঠিকই। তবে কিছু তস্কর-লুঠেরা তো সব জায়গাতেই থাকে।'

একথা বলার পর মৎস্যগন্ধা একটা ব্যবসায়িক প্রশ্ন করল তাকে—'এ বন্দরে যেসব জাহাজ আসে তাদের নাবিকরা অন্তত একবার হলেও আমার এই গণিকালয়ে পা রাখে। কিন্তু তোমার জাহাজ থেকে কোনও নাবিক আসেনি কেন? তোমার কোনও নিষেধ আছে?'

এস্তাদিও বলল, 'না, নিষেধ ঠিক নয়। তবে নতুন জায়গা তো, এখানকার সব খবর আমি এখনও সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। অনেক সময় গণিকালয়ে নাবিকদের সঙ্গে নানা ঝঞ্ঝাট হয় টাকা নিয়ে। তাই এ-জায়গা সম্বন্ধে আমার কাছে কোনও খবর ছিল না বলে আমি তাদের এখানে আসার অনুমতি দিইনি। অবশ্য কেউ এখনও সে অনুমতি চায়ওনি। জাহাজের নাবিকরা নিজেরাও এখন পণ্য নামাবার কাজে খুব ব্যস্ত।'

মৎস্যগন্ধা হেসে বলল, 'এখন নিশ্চই বুঝতে পারছ এ জায়গাটা খারাপ নয়? ইচ্ছুক নাবিকদের তুমি নিশ্চিন্তে আসতে দিতে পারো।'

তার কথা শুনে এবার এস্তাদিও-ও হাসল।

জানলার বাইরে তাকাল এস্তাদিও। দূরে নদীবক্ষে নৌকা-জাহাজগুলোর ভিড়ে পর্তুগালের পতাকাটা দেখতে পেল সে। তার মনে পড়ে গেল, এক ব্যবসায়ীকে তার জাহাজে পণ্য দেখাতে নিয়ে যাবার কথা এস্তাদিওর। লোকটার বন্দরে আসার কথা। সকালে অনেক কাজ আছে এস্তাদিওর। যদিও শরীরটা বেশ দুর্বল লাগছে তবুও এখানে থাকলে চলবে না তার। তাই পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়িয়ে এস্তাদিও এরপর বলল, 'এবার আমাকে যেতে হবে।'

মৎস্যগন্ধা তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বলল, 'এত তাড়া কীসের? তোমার শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। এখানে অন্তত দিনের বেলাটা বিশ্রাম নিয়ে, শরীরটা সুস্থ করে বিকেলে বেরিও। ভয় নেই, এখানে থাকার জন্য কোনও পয়সা দিতে হবে না।'

এস্তাদিও হেসে ফেলে বলল, 'না, ব্যাপারটা তা নয়। কয়েকজন বণিক

BanglaBook.org

আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। তাছাড়া গতরাতে আমি ঘরে না ফেরায় আমার সঙ্গীরা নিশ্চই দুশ্চিন্তা করছে।'

এ কথা শোনার পর মৎস্যগন্ধা আর তাকে বাধা দিল না। পাশের ঘর থেকে সেই টাকাভর্তি রেশমের থলেটা এনে এস্তাদিওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে হেসে বলল, 'এই নাও। একশোটা রুপোর টাকা আছে। রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি কুড়িয়ে গুনে-গেঁথে রেখেছি। গুনে নাও। আমাদের, বেশ্যাদের তো কেউ বিশ্বাস করে না। টাকার জন্য আমরা শরীর বিক্রি করি।'

মৎস্যগন্ধা কথাগুলো হেসে বললেও এস্তাদিওর মনে হল মৎস্যগন্ধার কথার মধ্যে মুহূর্তের জন্য একটা বেদনার অনুভূতিও যেন উঁকি দিয়ে গেল।

এস্তাদিও হেসে বলল, 'তার কোনও প্রয়োজন নেই। একশো মুদ্রাই ছিল। আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি।'

কথাটা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল মৎস্যগন্ধা। তা দেখে এস্তাদিও অবাক হয়ে বলল, 'তুমি হাসলে কেন?'

মৎস্যগন্ধা হেসেই জবাব দিল, 'ওই যে বললে, 'বিশ্বাস করছি!' বারবনিতাদের আবার কেউ বিশ্বাস করে নাকি? তোমার এই কথা শুনে মজা পেলাম, তাই হাসলাম।' মৎস্যগন্ধা পালঙ্কের পাশে রাখা এস্তাদিওর তলোয়ারটা তুলে দিল তার হাতে।

বাইরের পৃথিবী জেগে উঠলেও এবাড়ি এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এস্তাদিওকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার অলিন্দ, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল মৎস্যগন্ধা। সদর দরজা খুলল সে। এস্তাদিও পথে নামার মুহূর্তে মৎস্যগন্ধা শুধু বলল, 'আবার এসো।'

কথাটা শুনে পথে পা রেখে এস্তাদিও শেষবারের জন্য ফিরে তাকাল তার দিকে। গণিকালয়ের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে মৎস্যগন্ধা। তার পিছনে গাঢ় অন্ধকার হলেও সকালের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। অপরূপ সৌন্দর্য যেন ঝরে পড়ছে মৎস্যগন্ধার মুখমণ্ডল থেকে। সে দিকে তাকিয়ে এস্তাদিওর মনে হল তার সামনে যেন দাঁড়িয়ে আছে বাইবেলবর্ণিত কোনও পরি। তার মুখে কোনও পাপ, ক্লেদের চিহ্ন নেই। এস্তাদিও এরপর সে-জায়গা ছেড়ে এগোতে শুরু করল।

জেগে উঠছে বন্দর। লোকজনের হাঁকডাক ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। গদিঘরগুলোর ঝাঁপ খুলছে, গুদাম-ঘরগুলোর সামনে মাল নেবার জন্য

BanglaBook.org

উপস্থিত হচ্ছে বলদে-টানা গাড়িগুলো। কিছুটা এগিয়ে এস্তাদিও দেখা পেয়ে গেল পেড্রোর। এস্তাদিওকে খুঁজতে বেরিয়েছিল সে। দুজনের সাক্ষাতের পর তাকে গতরাতের কাহিনি বলতে বলতে এস্তাদিও এগোল জাহাজঘাটার দিকে।

এস্তাদিওকে বিদায় দিয়ে ওপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে একটা জিনিস দেখতে পেল মৎস্যগন্ধা। রানি একটা টুপি নিয়ে লোফালুফি খেলছে। এস্তাদিওর জাহাজি টুপি। জিনিসটা ফেরত দেওয়া হয়নি তাকে। এস্তাদিও-ও নিতে ভুলে গেছে। হয়তো সে সেটা ফেরত নিতে আসবে, অথবা টুপিটা তাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। রানি অবলা প্রাণী। সে নষ্ট করে দিতে পারে টুপিটা। মৎস্যগন্ধা তাই টুপিটা নিয়ে নিল রানির কাছ থেকে। ঘন নীল রঙের একটা জাহাজি টুপি। নানা রঙের ছোট একটা পতাকার ছবিও আঁকা আছে কান উঁচু চামড়ার টুপিটাতে। টুপিটার রং দেখে মৎস্যগন্ধার মুহূর্তের জন্য মনে পড়ে গেল পর্তুগিজ নাবিকের ঘন নীল চোখের কথা। টুপিটাকে সযত্নে একটা দেরাজের মধ্যে তুলে রেখে জানলার সামনে এসে দাঁড়াল সে। চোখে পড়ল বিরাট একটা বজরা পাল তুলে রাজহংসীর মতো এগিয়ে আসছে বন্দরের দিকে। বজরাটা চেনা মৎস্যগন্ধার। তারা এসে গেছে।

১০

সেদিন ভোরবেলা জাহাজে নিজের কেবিনে ঘুম ভাঙল এস্তাদিওর। আগের দিন সূর্যডোবার পর অনেক সময় পর্যন্ত জাহাজ থেকে মাল খালাসের কাজ হয়েছে। বলতে গেলে খোল প্রায় ফাঁকাই হয়ে গেছে। সেই কাজ সেটার পর ক্লান্ত লাগছিল এস্তাদিওর। তার আর ইচ্ছা করছিল না বন্দরে ফিরে যেতে। কাজেই সে জাহাজেই রয়ে গেছিল। বন্দরে আক্রান্ত হবার সেই ঘটনার পর আরও সাতটা দিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে বন্দর অঞ্চলটা বেশ কিছুটা চিনে নিয়েছে সে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয়ও হয়েছে। হিন্দু হোক বা আরব, এখানকার লোকজনকে মোটামুটি শান্তিপ্রিয় বলেই মনে হয়েছে। ধর্মীয় ভেদাভেদও নেই হিন্দু আর আরবদের মধ্যে। বেশ কিছু প্রাচীন বৌদ্ধ মঠও আছে এ অঞ্চলে। একসময় নাকি বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান স্থান ছিল এই তমালিকা বন্দর। তবে এখন বৌদ্ধমঠগুলো নাকি অধিকাংশই জীর্ণ

BanglaBook.org

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সিংহলে পাড়ি দিয়েছে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। দু-একটা মঠে শুধু কয়েকজন সন্ন্যাসী থাকেন। জাহাজঘাটায় তাঁরা বড় একটা আসেন না। নিজেরা নিজেদের মতো মঠেই আবদ্ধ থাকেন। তবে অনেক অনুসন্ধান করেও এস্তাদিও কোনও খ্রিস্ট উপসনাগৃহ অর্থাৎ চার্চের সন্ধান পায়নি। এ ব্যাপারটা একটু হতাশ করেছে তাকে। তবে একটা ব্যাপারে তার মন বেশ খুশি। উচিত মূল্যে প্রায় সমস্ত পণ্যই বিক্রি হতে চলেছে।

ঘুম ভাঙার পর এস্তাদিওর চোখ পড়ল তার কেবিনের দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো 'দিন সারণী'র দিকে। বারোটা মাসসহ তিনশো পয়ষট্টি দিনের হিসেব ধরা আছে ওতে। খোলগুলোতে রোজ একজন দাগ কেটে দিয়ে যায়। এভাবেই দিনের হিসাব রাখা হয়। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে এস্তাদিও হিসেব করে দেখল আজ সেপ্টেম্বরের পনেরো তারিখ। হয়তো বা ভাস্কোর জাহাজ এদেশের মাটি ছুতে চলেছে। ভাস্কো যে-কাজের দায়িত্ব তাকে দিয়েছেন সে-কাজ এবার শুরু করতে হবে তাকে। তমালিকা বন্দরের একটা মানচিত্র তৈরি করতে হবে। লিপিবদ্ধ করতে হবে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বিন্যাস। এ বন্দরের আনুমানিক আয়, কত জাহাজ এখন এই ক্ষয়িষ্ণু বন্দরে যাওয়া-আসা করে সে তথ্য এবং আবশ্যিকভাবে স্থানীয় শাসকদের সামরিক ক্ষমতার পরিমাপ সম্বন্ধে খবর সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এস্তাদিওকে। এবং এই খবরগুলো কৌশলে সংগ্রহ করার জন্য স্থানীয় বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে এস্তাদিওকে কথাও বলতে হবে। আজ তার বিশেষ কোনও কাজ নেই বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে। এস্তাদিও তাই ভেবে নিল, দিনটা সে খবর সংগ্রহের ব্যাপারে কাজে লাগাবে।

বিছানা থেকে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়াল এস্তাদিও। চারপাশে বেশ ঝলমলে পরিবেশ। এস্তাদিও দেখতে পেল কাছেই একটা ছোট জাহাজ থেকে দড়ির মই বেয়ে নৌকাতে নামছে কয়েকজন লোক। তারা কৃষ্ণবর্ণের। মুণ্ডিত মস্তক। গলা থেকে পা পর্যন্ত পীত বস্ত্র জড়ানো। সম্ভবত তারা সিংহলি বৌদ্ধ। জাহাজটা ভোরবেলা এসে নোঙর করেছে। এস্তাদিও গতকালও এ জাহাজটাকে দেখেনি। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে এখানে পা রাখার আগে কিছুই জানা ছিল না এস্তাদিওর। এমনকী এইনামে যে একটা ধর্ম আছে তাও তার অজানা ছিল। তমালিকা বন্দরে একজন বণিক আছে। সে নিজে বৌদ্ধ না হলেও তার কাছে কয়েকজন সিংহলি শ্রমিক কাজ করে। ধর্মে তারা বৌদ্ধ। কর্মোপলক্ষ্যে এস্তাদিও ক'দিন আগে সেই বণিকের

BanglaBook.org

সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেছিল। সেই বাঙালী বনিকের থেকেই কথাপ্রসঙ্গে এ-ধর্মের ব্যাপারে কিছুটা জেনেছে এস্তাদিও। হাজার বছরেরও আগে এদেশে সম্রাট অশোক নামে নাকি এক সম্রাট ছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ। সেই বৌদ্ধ সম্রাট নাকি এই তমালিকা বন্দর থেকেই সিংহলে লোক পাঠিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। সেই বাঙালি বণিক গর্ব ভরে আরও একটা কথা বলেছে তাকে। বহু শতাব্দী আগে বিজয় সিংহ নামের এক বাঙালি নাকি সিংহল জয় করেছিলেন। সেই বিজয় সিংহও নাকি সিংহল যাত্রা করেছিলেন এ-বন্দর থেকেই। সিংহলের সঙ্গে এই তমালিকা বন্দরের সম্পর্ক কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন।

এস্তাদিওকে ডেকে এসে দাঁড়াতে দেখে ক্যাপ্টেন তার কেবিন ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন এস্তাদিওর কাছে। দুজনের মধ্যে 'সুপ্রভাত' বিনিময়ের পর ক্যাপ্টেন পেরো বলল, 'সান্টা মারিয়ার খোল তো কাল প্রায় খালি হয়ে গেল। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হল মাতা মেরির কৃপায়। জাহাজে নতুন কী মাল তুলবেন?'

এস্তাদিও হেসে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বিক্রি ভালোই হয়েছে। কয়েকজন বস্ত্র-ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলোচনা চলছে সুতিবস্ত্র কিনে জাহাজে তোলার জন্য। তবে দরকষাকষি করে সিদ্ধান্তে আসতে আরও দুটো-তিনটে দিন সময় লাগবে।'

পেরো জানতে চাইল 'আজ আপনার কাজ কী?'

এস্তাদিও বলল, 'আজ তেমন কাজ নেই আমার। তবে কিছু স্থানীয় লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলব ভাবছি। কিছু খোঁজখবর নেব এ-জায়গা সম্বন্ধে।'

এস্তাদিওর কথা শুনে ক্যাপ্টেন পেরো বললেন, 'একটা কথা বলার ছিল আপনাকে। এ-দশ দিন ধরে নাবিকরা প্রচুর পরিশ্রম করেছে। আজ কাজ না থাকলে ডাঙায় নামতে দেবার অনুমতি দেব? ডাঙায় নামতে চাচ্ছে তারা।'

এস্তাদিও কথাটা শুনে বলল, 'আমি তো নাবিকদের ডাঙায় নামতে নিষেধ করিনি? তারা তো নেমেওছে!'

ক্যাপ্টেন পেরো হেসে বললেন, 'এ-নামা, সে-নামা নয়, ওরা 'নামা' বলতে বোঝাচ্ছে গণিকালয়। একসঙ্গে কাজ করার সময় স্থানীয় শ্রমিকদের কাছে তারা শুনেছে সেই গণিকালয়ের ব্যাপারে। তাছাড়া ওই যে দূরে কাঠের ঘরঅলা পালতোলা বিরাট নৌকাটা দিন সাতেক আগে উপস্থিত হয়েছে সেখান থেকেও ওই গণিকালয়ের জন্য নারীদের নামিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছে ওরা।'

BanglaBook.org

নাবিকদের ওপর এবার আর নিষেধ বজায় রাখার কোনও কারণ নেই। এস্তাদিও তাই বলল, 'ঠিক আছে, ওদের ডাঙায় নামতে দিন।'

এস্তাদিওর কথা শুনে ক্যাপ্টেন পেরো তার থেকে বিদায় নিয়ে খবরটা দিতে চলে গেল নাবিকদের। কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজের খোলের ভিতর থেকে নাবিকদের উল্লাসধ্বনি কানে এল এস্তাদিওর।

গণিকালয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কথা হবার ফলে এস্তাদিওর মনে পড়ে গেল মৎস্যগন্ধার কথা। সে গণিকা হলেও তার ব্যবহারে, কথাবার্তায় তাকে কেমন যেন একটু অন্যরকম মনে হয়েছে এস্তাদিওর। তার আচরণও যেন ঠিক গণিকাসুলভ নয়। নিজে গণিকালয়ে না গেলেও বন্ধুদের কাছে, নাবিকদের কাছে গণিকাদের সম্বন্ধে নানা গল্প শুনে তাদের সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল এস্তাদিওর মনে। গনিকা মানেই শঠ, চাতুরী করে, অভিনয় করে কীভাবে তারা মানুষের গাঁট কাটবে, সে ফিকির নাকি তারা সবসময় খুঁজে বেড়ায়। মৎস্যগন্ধাকে দেখে কিন্তু এসব কিছু মনে হয়নি এস্তাদিওর। বরং মৎস্যগন্ধার ব্যবহারে এই স্বল্পপরিচিত নাবিকের প্রতি কর্তব্যবোধই প্রকাশ পেয়েছে, যে ব্যবহার আশা করা যায় ভদ্র নারীদের কাছ থেকে। মৎস্যগন্ধার ব্যবহারে, আচরণে এস্তাদিও কৃতজ্ঞ তার কাছে।

আরও সাত দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বেশ কয়েকবার মৎস্যগন্ধার কথা মনে পড়েছে এস্তাদিওর। বিশেষত, সেদিন ভোরে বিদায়বেলায় প্রথম সূর্যের আলো-লাগা মৎস্যগন্ধার অপাপবিদ্ধ মুখটা।

জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সে-মুখটা আবার ভেসে উঠল এস্তাদিওর চোখে।

এস্তাদিওর মনে হল, 'আচ্ছা, মেয়েটার থেকেও তো এই বন্দর-এলাকার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা যায়? গণিকালয় তো খবরের আখড়া হয়। নানা ধরনের মানুষ যায় ওখানে। এ বন্দরের খুঁটিনাটি সব খবরই নিশ্চই ওই গণিকার কাছে আছে।'

তাছাড়া এস্তাদিওর মনে হল, মৎস্যগন্ধার সঙ্গে একবার দেখা করে কৃতজ্ঞতাও জানিয়ে আসা উচিত। অতগুলো টাকা তার জন্যই ফিরে পেয়েছে সে। বারবনিতা হলেও টাকাটা ফেরত দেবার সময় সে কোনও কিছু দাবিও করেনি। সে-দাবিটা অস্বাভাবিক ছিল না। কাজেই তাকে কিছু উপহারও দেওয়া উচিত।

ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল এস্তাদিও। তারপর সে সিদ্ধান্ত নিল, জাহাজ

BanglaBook.org

থেকে নেমে সে প্রথমে যাবে শুল্ক দারোগার দপ্তরে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যদি কোনও খবর সংগ্রহ করা যায়, সেজন্য। আর তারপর সে দেখা করতে যাবে মৎস্যগন্ধার সঙ্গে, তার জন্য ছোট একটা উপহার নিয়ে।

ডেক ছেড়ে আবার নিজের কেবিনে ফিরে এল এস্তাদিও। আলমারি খুলে তার মধ্যে থেকে বের করে আনল হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা খাপে বসানো একটা 'বালি ঘড়ি'। খুব সুন্দর দেখতে জিনিসটা। সেটাকে যত্ন করে রেশমের থলেতে নিয়ে কেবিন থেকে বেরোল এস্তাদিও। পেড্রো তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে। দড়ির মই বেয়ে জাহাজ থেকে নেমে ছোট একটা নৌকাতে তারা এগোল বন্দরের দিকে।

বন্দরের একটা অংশে আজ বেশ ভিড়। আজ একটা জাহাজ রওনা হচ্ছে সেখান থেকে। ক'দিন ধরেই মাঝে মাঝে ভেঁপু বাজছিল সেজন্য। এস্তাদিওরা শুনেছে সে শব্দ। এ অঞ্চলে এটাই রীতি। কোনও বাণিজ্যতরী যখন বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে তখন তা লোকজনকে জানাবার জন্য দিন সাতেক আগে থেকে ভেঁপু বাজানো হয়, নদীতটে আগুন জ্বালানো হয়। নানারকম দেবদেবীর ছবি আঁকা পতাকা জাহাজে টাঙিয়ে পূজা-অর্চনা করা হয়। যাত্রা শুরু করার জন্য মাঝারি আকৃতির যে জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে, সে জাহাজটাও নানা পতাকাশোভিত। জাহাজের ডেকে, নীচে ছোট ছোট নৌকাতে অনেক লোকের ভিড়। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় ব্যাপারটা দেখার জন্য একটু থামল এস্তাদিও। জাহাজ থেকে কলসি কলসি দুধ, দই, চাল, মালা নিবেদন করা হচ্ছে নদীবক্ষে। পেড্রো এ-বন্দরে দীর্ঘদিন থাকার কারণে এসব ধর্মীয় উপচার সম্বন্ধে কিছু জানে। সে বলল, 'জাহাজ সমুদ্রযাত্রা শুরু করার আগে আবশ্যিকভাবে নদী বা সমুদ্রবক্ষে নিবেদন করা হয় এসব জিনিস। জলদেবীকে তুষ্ট করা হয় এভাবে। আর ওই দেখুন কিছু লোক নৌকাতে দাঁড়িয়ে বা দড়ির মই বেয়ে জাহাজের গায়ে, খোলের গায়ে, জোড়াগুলোতে হাতের ছাপ দিচ্ছে। এটাও একটা ধর্মীয় প্রথা বা বিশ্বাস। জোড়গুলোতে হাতের ছাপ দিলে নাকি সমুদ্রযাত্রার সময় জোড় খুলে জাহাজডুবি হয় না।'

এস্তাদিও বলল, 'জাহাজটার সামনের দিকে একটা 'ফেরানো চোখ'-এর ছবি আঁকা দেখছি! শুধু জাহাজে নয়, অনেক নৌকার গায়েতেও ওই ফেরানো চোখের' ছবি আঁকা দেখেছি! এর অর্থ তুমি জানো?'

পেড্রো বলল, 'জানি মালিক। ওই চোখকে জাহাজের বা নৌকার পথপ্রদর্শক

BanglaBook.org

ও রক্ষাকর্তা বলে মনে করা হয়। চোখ আঁকার পর পুরোহিতরা মন্ত্র পড়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। মাল্লারা ওই চোখকে জীবন্ত বলে মনে করে। তারা সবসময় সতর্ক থাকে যাতে ওই চোখের গায়ে কখনও পা না লাগে। দৈবাৎ যদি এ-অঘটন ঘটে তবে সেই মাঝি বা মাল্লাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়।

পেড্রোর কথা শুনে এস্তাদিও মনে মনে তারিফ করল তাঁর। এদেশ সম্বন্ধে সত্যিই অনেক কিছু জানে পেড্রো। জাহাজ-নৌকার ভিড় কাটিয়ে এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকা নিয়ে ডাঙায় পৌঁছে গেল তারা।

কাদামাটি পেরিয়ে ডাঙায় উঠেই এস্তাদিও দেখতে পেল সামনেই ফুলমালা দিয়ে সাজানো একটা মণ্ডপ রচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে বিরাট বিরাট পিতলের জালা রাখা। কয়েকজন লোক মাটির ভাঁড়ে জালা থেকে জল নিয়ে পথচারীদের দিচ্ছে, আর পথচারীরাও সেই ভাঁড় প্রথমে মাথায় ঠেকিয়ে সে জল পান করছে। ব্যাপারটা দেখে এস্তাদিও, পেড্রোর দিকে তাকাতেই সে বলল, 'এখানে হিন্দুদের দেবী বর্গভীমার এক প্রাচীন মন্দির আছে। এ হল সেই মন্দিরের পবিত্র জল। তমালিকা বন্দর থেকে যখন কোনও জাহাজ যাত্রা শুরু করে তখন জাহাজের মঙ্গল কামনায় এই পবিত্র জল পান করানো হয়।'

পেড্রোর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন লোক জলপূর্ণ মাটির ভাঁড় এনে দাঁড়াল তাদের সামনে। যদিও এস্তাদিও হিন্দুদেবীর উপাসক নয়, তারা আরাধ্যা দেবী মেরি। শুধু স্থানীয় ধর্ম সংস্কারকে সম্মান দিয়ে লোকটার হাত থেকে ভাঁড় নিয়ে জলপান করল এস্তাদিও। কর্পূর মেশানো ঠান্ডা জল পান করে বেশ তৃপ্তিবোধও হল তার। স্থানীয় লোকটাও খুশি হল ব্যাপারটাতে। জলপানের পর পেড্রোকে নিয়ে এস্তাদিও চলল শুল্ক দারোগার দফতরে।

জায়গাটাতে আজ বেশ ভিড়। কয়েকজন স্থানীয় পরিচিত বণিকের সঙ্গেও সেখানে দেখা হয়ে গেল এস্তাদিওর। তাদের কাছে এস্তাদিও জানতে পারল, জম্বুদ্বীপ থেকে আসা 'বনবিবি' নামের একটা ছোট জাহাজের মালপত্র নাকি শুল্ক ফাঁকি দেবার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সে ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য সেখানে হাজির হয়েছে বণিকেরা। বেশ অনেকটা সময় এস্তাদিওকে সেখানে অপেক্ষা করতে হল। কারণ, বণিকদলের সঙ্গে আগে কথাবার্তা সারলেন শুল্ক দারোগা। এস্তাদিওর যখন ডাক এল তখন প্রায় দুপুর হতে চলেছে। পেড্রোকে বাইরে রেখে দারোগার দপ্তরে প্রবেশ করল সে। নিজের

BanglaBook.org

আসনেই বসেছিলেন দারোগা। এস্তাদিওকে দেখে তিনি গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন 'কী দরকার?'

এস্তাদিও মাথার টুপি খুলে তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, 'দরকার তেমন কিছু নেই। তোমার সঙ্গে এমনি সাক্ষাৎ করতে এলাম। সেদিনতো কথা বলার তেমন সুযোগ ঘটেনি।'

'এমনি?' ইশারায় এস্তাদিওকে আসন গ্রহণ করতে বললেন দারোগা।

তারপর একটু চুপ করে থেকে দারোগা বললেন ব্যবসা তো ভালোই হচ্ছে শুনলাম। বিশেষত, ওই সিংঅলা লণ্ঠনটা। মানে মোষের সিং-এর ছাউনি অলা মোমবাতি। জিনিসটা এর আগে এখানে আসেনি।'

এস্তাদিও বলল, 'হ্যাঁ, তা হচ্ছে। ওই লণ্ঠন প্রায় পুরোটাই বিক্রি হয়ে গেছে।'

দারোগা একটা পালক দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'জিনিসটা বেশ সুন্দর আর কাজেরও। আমাকে অনেক সময় দপ্তরে বা বাড়িতে রাত জেগে কাজ করতে হয়। আমাকে অমন লণ্ঠন একটা দিও তো।'

এস্তাদিও হেসে বলল, 'একটা কেন, বেশ কয়েকটা পাঠিয়ে দেব।'

কথাটা শুনে খুশি হলো দারোগা। তিনি বললেন, 'এক সময় কত বিদেশি জাহাজ কত নতুন নতুন পণ্য নিয়ে আসত এখানে। কোথায় গেল সেসব দিন! আর পাঁচশো বছর আগেও এ-বন্দরই ছিল প্রধান বন্দর। তখন অবশ্য মোহনা অনেক কাছে ছিল। রোজই বিদেশি জাহাজ নানারকম পণ্য নিয়ে ভিড় জমাত তমালিকা বন্দরে। এত জাহাজ আসতো যে বেশ কিছু জাহাজকে নাকি সমুদ্রে অপেক্ষা করতে হত বন্দরে নোঙর করার জায়গা খালি পাবার জন্য। এখন তো সাতগাঁও-ই প্রধান বন্দর। সেখানেই জাহাজ ভিড় করে। সেখানকার শুল্ক দারোগাকে দেখলে ব্যাপারটা তুমি বুঝবে। সারা দেহে তাঁর সোনার গহনা!' শেষ কথাটায় মৃদু আক্ষেপের সুর শোনা গেল তাঁর গলায়।

তবে দারোগা এ-কথা বলাতে তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে গেল এস্তাদিও। সে বলল, 'এ বন্দরে এখন আর তেমন জাহাজ আসে না বলছ? বছরে কত জাহাজ ভেড়ে এ বন্দরে?'

দারোগা বললেন, 'না, আসে না। সবই তো সাতগাঁও বন্দরে চলে যায়। খুব বেশি হলে বছরে ছোট আর মাঝারি মিলিয়ে গোটা পঞ্চাশেক দিশি জাহাজ, আর গোটা পাঁচেক বিদেশি জাহাজ আর চীনা জাঙ্ক। আরবদের ধাও-ও আসে হাতে-গোনা। তোমাদের মতো শ্বেতাঙ্গদের জাহাজ আসে না বললেই চলে।

BanglaBook.org

তার মধ্যে এখানে বেশ কিছু জাহাজ নোঙর করে বাণিজ্য করার জন্য নয়। তারা আসে বন্দরের বেশ্যালয়ের টানে। সেখান থেকে তো আর আমরা শুল্ক সংগ্রহ করতে পারি না।'

এস্তাদিও প্রশ্ন করে বসল, 'এ বন্দর থেকে কেমন শুল্ক আয় হয়?'

প্রশ্নটা শুনে কিন্তু সতর্ক হয়ে গেল শুল্ক দারোগা। সোজা হয়ে বসে এস্তাদিওর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'তুমি এ-খবর জানতে চাচ্ছ কেন?'

এস্তাদিও বুঝতে পারল, লোকটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'না, এ প্রশ্নের পিছনে তেমন কোনও কারণ নেই। নিতান্ত কৌতূহলবশত জানতে চাইলাম।'

শুল্ক দারোগা বললেন, 'আচ্ছা। এবার আমাকে বেরোতে হবে। একটা গুদাম পরিদর্শনে যেতে হবে। পরে একদিন এসো। আর লণ্ঠনগুলো পাঠিয়ে দিও।'

এস্তাদিও তাঁকে লণ্ঠন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দপ্তর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বন্দর থেকে কত শুল্ক আয় হয় তা না জানতে পারলেও কত জাহাজ এ বন্দরে আসা-যাওয়া করে সে তথ্যটা সংগ্রহ করতে পারল সে। যে কোনও বন্দর সম্পর্কে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। দারোগার দপ্তর থেকে বাইরে বেরোবার পর পেড্রো জানতে চাইল, 'এবার কোথায় যাবেন?'

মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ে যাবার কথা পেড্রোর জানা নেই। এস্তাদিও ভেবেছিল সে দুপুরের মধ্যেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে নেবে। কিন্তু এখানেই অনেক দেরি হয়ে গেছে তার। মাথার ওপর চড়া রোদ, তার ওপর খিদেও পাচ্ছে। এস্তাদিও সিদ্ধান্ত নিল, বন্দরস্থিত ঘরে ফিরে খাওয়া সেরে তারপর মৎস্যগন্ধার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবে। সেইমতো সে পেড্রোকে বলল, এখন ঘরে ফিরে খাওয়া সেরে তারপর একলা আমি একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব।

এস্তাদিও আর পেড্রো এগোল ঘরে ফেরার জন্য। শুল্ক দারোগা তার ঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়েছিলেন তাদের দিকে। এস্তাদিওরা দূরে চলে যাবার পর দারোগা তাঁর এক কর্মচারীকে ডাকলেন। লোকটার কাজ হল বন্দর অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে নানা খবর সংগ্রহ করা। শুল্ক দারোগা তাকে বললেন, 'এস্তাদিও নামের ওই পর্তুগিজ বণিকটার ওপর একটু নজর রাখবে। বিনা কারণে কেন সে হঠাৎ দেখা করতে এল বুঝলাম না! তার ওপর বন্দরের ব্যাপারে নানারকম

BanglaBook.org

খোঁজখবর নিচ্ছিল!

এস্তাদিও যখন দুপুরবেলায় ঘরে ফেরার পথ ধরল ঠিক সেইসময় ঘুম ভাঙল মৎস্যগন্ধার। তার মনে পড়ল, দিল্লি থেকে আসা মেয়েগুলোকে দিয়ে আজ থেকে কাজ শুরু করানো হবে। এই গণিকালয়ে নতুন মেয়ে এলে প্রথম সাতদিন খদ্দেরদের সামনে হাজির করানো হয় না। তাদের নানা ধরনের তালিম দেওয়া হয় এসময়। গর্ভরোধের জন্য, যৌনরোগ যাতে না হয় সেজন্য নানা জড়িবুটি ব্যবহারের তালিম, অঙ্গসজ্জার তালিম, খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্য ছলা-কলা এসব তালিম দেওয়া হয় তাদের। গণিকালয়ের নানা নিয়ম নীতির সঙ্গেও পরিচিতি ঘটানো হয় সদ্য আগত নারীদের। তারপর তাদের উপস্থিত করা হয় খদ্দেরদের সামনে।

মেয়েগুলো আসার পর সাতদিন কেটে গেছে। সেই আরব বজরামালিক, যে মেয়েগুলোকে মৎস্যগন্ধার হাতে তুলে দিয়েছে সে এখনও বন্দরেই আছে। দামদর চূড়ান্ত হলেও এখনও সে মূল্য গ্রহণ করেনি। বলেছে আগামী কাল বজরা ছাড়ার আগে এসে সে তার প্রাপ্য নিয়ে যাবে। ঘুম ভাঙার পর মৎস্যগন্ধার এও খেয়াল হল—মেয়েগুলোর দাম মেটাবার জন্য সোনা আনতে রাতে তাকে এক জায়গায় যেতে হবে। কারণ স্থানীয় রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে সে আরব বণিক দাম নেবে না। সোনা বা স্বর্ণমুদ্রায় তাকে মেয়েগুলোর দাম মেটাতে হবে।

মেয়েগুলোকে খদ্দেরদের হাতে তুলে দেবার আগে তাদের মধ্যে একজনকে তার সামনে হাজির করতে শ্যামাকে বলে রেখেছে মৎস্যগন্ধা। সে মেয়েটা বাঙলা জানে। দলের অন্য মেয়েরা নাকি বেশ মানে তাকে। তাই তার সঙ্গে মৎস্যগন্ধার একটু কথা বলে নেওয়া দরকার।

পালঙ্ক থেকে নেমে চটপট স্নান সেরে নিল মৎস্যগন্ধা। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই নবাগতা সেই মেয়েটাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল শ্যামা। ভিনদেশী মেয়েটার বয়স বছর কুড়ি হবে। পরনে কাঁচুলি আর ঘাগরা, পায়ে রুপোর মল। গাত্রবর্ণ পরিষ্কার। ক্ষীণ কটি, ভারী নিতম্ব, নাভিকূপ গভীর। চোখমুখও বেশ সুন্দর। কাঁচুলি ঢাকা বুকে বেশ যৌন আবেদন আছে।

পালঙ্কে বসেছিল মৎস্যগন্ধা। মেয়েটা তার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ডান হাতটা মাথার কাছে তুলে ধরে আরবদের ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল মৎস্যগন্ধাকে। মেয়েটার চোখে একটা ভয়-ভক্তি মেশানো আছে। মৎস্যগন্ধাই

BanglaBook.org

তো এখন তার মালকিন। একটা জিনিস খেয়াল করল মৎস্যগন্ধা। মেয়েটার সারা বাহুতে মেহেন্দির সূক্ষ্ম নকশা আঁকা।

মৎস্যগন্ধা প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম কী?'

মেয়েটা জবাব দিল, 'আগে নাম ছিল লক্ষ্মী, হারেমে নিয়ে যাবার পর নাম হয়, হুরী।'

হুরী শব্দের অর্থ জানা আছে মৎস্যগন্ধার। শব্দটার অর্থ হল 'পরী'। মৎস্যগন্ধা জানতে চাইলে, 'তুমি তো ভিনদেশী। বাঙলা জানলে কীভাবে?'

হুরী জবাব দিল আমার মা এদেশের মেয়ে ছিল। জলদস্যুরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। দিল্লির এক হিন্দু মণিকারের ক্রীতদাসী ছিল আমার মা।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'কিন্তু তুমি সুলতানের হারেমে পৌঁছোলে কীভাবে?'

হুরী বলল, 'মায়ের এক প্রেমিক ছিল। মনিকারের বাড়িতে আসা-যাওয়া করত সে। মাকে নিয়ে সে পালাল। সঙ্গে আমিও ছিলাম। আমার তো তখন তেরো বছর বয়স। কিন্তু সে লোকটা আমাদের নিয়ে বেচে দিল আগ্রার দাসের হাটে। সেখান থেকে নানা হাত ঘুরে পৌঁছোলাম সুলতানের হারেমে।

হারেম ব্যাপারটা সম্বন্ধে মৎস্যগন্ধার এইটুকুই জানা যে সেখানে সুলতানের ভোগের জন্য অনেক নারী এনে রাখা হয়। ব্যাপারটা সম্বন্ধে সম্যক কোনও ধারণা নেই তার। কৌতূহলী হয়ে মৎস্যগন্ধা জানতে চাইল, 'যেখানে ছিলে সেই হারেম জায়গাটা কেমন দেখতে হয়?'

হুরী জবাব দিল, সে-জায়গা শ্বেতপাথরের তৈরি বিরাট একটা প্রাসাদ। বাগান আর উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বাগানে ফোয়ারা আছে, ময়ূর আছে, হরিণ আছে। হাবশি খোজারা পাহারা দেয় সেই হারেম। মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনও পুরুষ প্রবেশ করতে পারে না সেখানে। ধরা পড়লেই মৃত্যুদণ্ড। সুলতান আর তার ঘনিষ্ঠদের অমন অনেক হারেম আছে দিল্লিতে। নানাদেশের, নানা জাতের মেয়ে থাকে। আমি যেখানে ছিলাম সে-হারেমেই দুশোজন মেয়ে ছিল।'

মৎস্যগন্ধা এবার জানতে চাইল, 'তুমি সুলতানকে দেখেছ? শুয়েছ তার সঙ্গে?'

মৎস্যগন্ধা প্রশ্নটা করল, কারণ, এ মেয়ে যদি স্বয়ং সুলতানের সঙ্গে বিছানায় গিয়ে থাকে তবে ব্যাপারটা খদ্দেরদের কাছে বিজ্ঞাপনের কাজ করবে।

কিন্তু হুরীর কথা শুনে মৃদু হতাশ হল মৎস্যগন্ধা। মেয়েটা জবাব দিল,

BanglaBook.org

'না আমি সুলতানকে চোখে দেখিনি। তাকে দেখা ভাগ্যের ব্যাপার। শুনেছি, আমি সে হারেমে যাবার অনেক আগে তিনি একবার সেখানে পা রেখেছিলেন। তারপর তিনি ওই হারেম দান করে দেন মানি খিলজী নামের এক অনুচরকে। তিনিই আমাদের মালিক ছিলেন। তার সঙ্গে অবশ্য বেশ কয়েকবার বিছানায় গেছি। তার ছেলে আর আত্মীয়দের সঙ্গেও গেছি।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'তা সেই হারেম থেকে তোমাদের বের করা হল কেন?' মেয়েগুলোর পিছনের ইতিহাসটা একটু জেনে রাখতে চায় মৎস্যগন্ধা। কারণ ভবিষ্যতে তা কাজে লাগে। কোনও মেয়ে যদি আগে কোনও গণিকালয় বা হারেম থেকে পালিয়ে থাকে তবে সে প্রবণতা তার এখনও থাকতে পারে।

হুরী বলল, 'দিল্লির অবস্থা ভালো নয়। বাবর নামে এক তুর্কি নাকি দিল্লি দখল করতে চাচ্ছে। সম্রাট লোদীর সঙ্গে নাকি যুদ্ধ হবে তার। সেজন্য সম্রাট ঘোড়া, সৈন্য সংগ্রহ করছেন। আমাদের মালিকের কাছে তিনি দশটা ঘোড়া চেয়েছেন। মালিক তাই তার হারেমের দুশোজন মেয়ের বদলে দশটা আরবি ঘোড়া কিনলেন। যে আমাদের কিনল সে আমাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে বিভিন্ন ডেরাতে পাঠাল আবার বিক্রি করার জন্য। আমরা ছিলাম বেনারসে। তারপর সেখান থেকে...।

হুরীর জবাব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মৎস্যগন্ধা। তারপর সে তাকে বলল, 'তোমাদের এখানে আনা হয়েছে খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্য। এখানে হয়তো তোমরা হারেমের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাবে না। তবে ভাত-কাপড় পাবে। আয়ের একটা অংশও তোমাদের জন্য বরাদ্দ হবে। কিন্তু খদ্দেরদের সঙ্গে আচরণে বা এই এখানকার অন্য মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে যেন কোনও সমস্যা তৈরি না হয়। কলহ আমি মোটেই পছন্দ করি না। তাতে ব্যবসার ক্ষতি হয়। তেমন হলে কিন্তু আমি ঘরে কয়েদ করে শাস্তি দিই। কোনও অভাব-অভিযোগ থাকলে আমার কাছে সরাসরি এসে বলতে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু তোমাদের নিয়ে যেন বিশৃঙ্খলা না ঘটে। আমার এ কথা গুলো তোমরা যারা একসঙ্গে এসেছ তাদেরও সবাইকে জানিয়ে দেবে।'

কথাগুলো শুনে হুরী বলল, 'আচ্ছা মালকিন। আপনি আমাদের মা।'

মৎস্যগন্ধা বলল,'বাকি কথা নিশ্চই তোমাদের শ্যামা আর এখানকার পুরোনো মেয়েরা জানিয়ে দিয়েছে। সেইমতো চলবে।' মৎস্যগন্ধাকে আবারও একবার কুর্নিশ করে শ্যামার সঙ্গে ঘর ছাড়ল হুরী।

BanglaBook.org

এক পরিচারিকা এসে খাবার দিয়ে গেল। খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য মৎস্যগন্ধা পালঙ্কে শুয়ে পড়ল। বিকেল যেতেই খদ্দের আসা শুরু হবে। তাদেরকে তদারকিতে ব্যস্ত থাকতে হবে মৎস্যগন্ধাকে। তার ওপর মধ্যরাত্রে তাকে গণিকালয় ছেড়ে এক জায়গায় যেতে হবে। বেশ কিছুটা দূর সে জায়গা। কাজ সেরে আবার ভোরের মধ্যে ফিরেও আসতে হবে তাকে। সকালবেলা তার প্রাপ্য নিতে আসবে বজরা মালিক। তাকে সোনা দিয়ে বিদায় জানাবার আগে বিশ্রামের আর ফুরসত হবে না তার। কাজেই মৎস্যগন্ধার একটু বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।

মৎস্যগন্ধা পালঙ্কে শুতেই রানি তার পাশে এসে বসে তার গায়ে মাথায় হাত বোলাতে শুরু করল। রানির হাতের স্পর্শে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম নেমে এল তার চোখে। একটু পরেই সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। সেই একই স্বপ্ন আবারও! উত্তাল সমুদ্রে কাঠের খাঁচায় বন্দি হয়ে সে আর রানি ভাসছে। মোচার খোলার মতো ঢেউয়ের দোলায় সে উঠছে আর নামছে। নিষ্ঠুর সমুদ্র লোফালুফি খেলছে তাদের নিয়ে। কখনও আকাশের দিকে ছিটকে উঠছে খাঁচাটা। তার পরমুহূর্তেই আবার হারিয়ে যাচ্ছে জলের নীচে। দমবন্ধ হয়ে আসছে মৎস্যগন্ধার। আর পারছে না সে।

আসছে! আসছে! এগিয়ে আসছে পাহাড়ের মতো ঢেউ! এ ঢেউ নিশ্চই মৎস্যগন্ধাকে টেনে নিয়ে যাবে পাতালের গভীরে! শেষ, সব শেষ! আর কয়েক মুহূর্তের ব্যবধান মাত্র! এসে পড়েছে সে! আতঙ্কে চিৎকার করে চোখ বুজে মৎস্যগন্ধা জড়িয়ে ধরল রানিকে।

কিন্তু ঢেউ তাকে স্পর্শ করল না। সে যাকে জড়িয়ে ধরেছিল সে মানুষের স্বরে বলে উঠল, 'ভয় কী মৎস্যগন্ধা? আমি তো আছি। চোখ খোলো, দেখো তুমি তোমার দেশে পৌঁছে গেছ।'

মৎস্যগন্ধা চোখ মেলল। সে দাঁড়িয়ে আছে এক সোনালি বালুতটে। সামনে সবুজে ছাওয়া এক অজানা দেশ। তার মধ্যে চোখে পড়ছে পাতায় ছাওয়া শান্ত কুটির, ঘর বাড়ি। মৎস্যগন্ধা যাকে ধরে দাঁড়িয়েছিল যে এবার বলল, 'আমি তোমাকে তোমার দেশে ফিরিয়ে আনলাম।'

রানি তো কথা বলতে পারে না। তবে সে কাকে জড়িয়ে আছে! মৎস্যগন্ধা তাকাল তার দিকে। আর তারপরই সে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। সে রানি নয়, সেই পর্তুগিজ নাবিক, এস্তাদিও! সমুদ্রের মতো গভীর নীল চোখে সে

BanglaBook.org

তাকিয়ে আছে মৎস্যগন্ধার দিকে!

এ পর্যন্ত স্বপ্নটা দেখে ঘুম ভেঙে গেল মৎস্যগন্ধার। দেখল নিজের পালঙ্কে রানিকে জড়িয়ে শুয়ে আছে সে। এ-স্বপ্ন তো আগেও দেখেছে মৎস্যগন্ধা বহু বার। কিন্তু স্বপ্নের শেষ অংশটা কোনও দিন দেখেনি। যদিও আজ কখন যেন মনে হয়েছিল সেই পর্তুগিজ যুবকের কথা। টুপিটা রয়ে গেছে তার। সেটা কাউকে দিয়ে তার কাছে ফেরত পাঠাবে বলে ভেবেছিল। কিন্তু তাই বলে সে এভাবে আসবে তার স্বপ্নের মধ্যে!

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে মৎস্যগন্ধা স্বপ্নটার ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করতে লাগল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে। পালঙ্কে উঠে বসল মৎস্যগন্ধা।

ঠিক সেইসময় শ্যামা প্রবেশ করল তার ঘরে। বলল, 'এস্তাদিও নামের সেই পর্তুগিজ বণিক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ওপরে নিয়ে আসব না চলে যেতে বলব? বাড়ির পিছনের দরজায় সে দাঁড়িয়ে আছে।'

শ্যামার কথা শুনে চমকে উঠল মৎস্যগন্ধা। এ কি সমাপতন, নাকি অন্যকিছু! একটু আগেই সে স্বপ্নে দেখল সেই পর্তুগিজ যুবককে। আর সে এসে হাজির!

প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটার পর মৎস্যগন্ধা বলল, 'হ্যাঁ, তাকে আমার ঘরে নিয়ে আয়।

BanglaBook.org

১১

কিছুক্ষণের মধ্যেই মৎস্যগন্ধার কক্ষে শ্যামার সঙ্গে প্রবেশ করল এস্তাদিও। রানিও উঠে বসেছিল খাটের ওপর। এস্তাদিওকে দেখে দাঁত বের করল সে। ভাবখানা এমন যে, এস্তাদিওকে সে যেন বলল, 'খারাপ মতলব থাকলে কিন্তু সাবধান। আমি আছি।' নতুন লোক দেখলেই রানি প্রথমে এমন একবার করে। এস্তাদিও আগে রানিকে দেখেনি। সে বেশ হকচকিয়ে গেল তাকে দেখে। মৎস্যগন্ধা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাকে আশ্বস্ত করে বলল, 'ভয় নেই। ও কিছু বলবে না।'

তারপর সে শ্যামাকে বলল, 'রানিকে তুই অন্যখানে নিয়ে যা।'

রানিকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজার পাল্লাটা ভেজিয়ে দিল শ্যামা। তারা চলে যাবার পর এস্তাদিও মৃদু বিস্মিতভাবে বলল, 'নাবিকরা জাহাজে বাঁদর-শিম্পাঞ্জি পোষে ঠিকই, কিন্তু বাড়িতে খোলা অবস্থায় এত বড় প্রাণী পুষতে দেখিনি।'

কথাটা শুনে মৎস্যগন্ধা বলল, 'ও-ই আমার একমাত্র আপনজন। একসঙ্গে জল থেকে ডাঙায় উঠেছিলাম আমরা।'

এস্তাদিও বলল, 'তার মানে?'

মৎস্যগন্ধা জবাব দিল, 'তখন আমার বয়স খুব কম। আমি কোথা থেকে ভেসে এসেছিলাম জানি না। তবে একটা কাঠের খাঁচায় ভাসছিলাম আমরা। তারপর কালিকট বন্দরের এক ভাসমান গণিকালয়, ময়ূরপঙ্খি মৃচ্ছকটিক আমাদের উদ্ধার করে।'

এস্তাদিও বেশ আশ্চর্য হল মৎস্যগন্ধার কথা শুনে। তারপর সে জানতে চাইল, 'তারপর সেখান থেকে তুমি এখানে এলে কীভাবে? নিছক কৌতূহলবশতই প্রশ্নটা করল এস্তাদিও।

ব্যাপারটার ভিতর বিশেষ এক গোপনীয়তা লুকিয়ে আছে তাই এ-প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব মৎস্যগন্ধা কাউকে দেয় না। সে হেসে বলল, 'কীভাবে এলাম আবার? ভাসতে ভাসতে।'

এস্তাদিও আর এ প্রসঙ্গে গেল না। সঙ্গে আনা রেশমের কাপড় জড়ানো জিনিসটা বাড়িয়ে দিল মৎস্যগন্ধার দিকে। মৎস্যগন্ধা জিনিসটা হাতে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী এটা!'

এস্তাদিও বলল, 'খুলে দেখো। উপহার।'

মোড়কটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল বালিঘড়িটা। এমন একটা বালি ঘড়ির

BanglaBook.org

অনেক দিনের শখ মৎস্যগন্ধার। জমিদারের সেরেস্তায় বালিঘড়ি দেখেছে মৎস্যগন্ধা। তবে তার হাতে যে জিনিসটা রয়েছে সেটা আরও সুন্দর। জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখে মৎস্যগন্ধা মজার ছলে বলল, 'জিনিসটা খুব সুন্দর নিঃসন্দেহে। কিন্তু মৎস্যগন্ধার দেহের বিনিময়মূল্য হল সোনা। আর সেটা দিলেও সবার সঙ্গে যে আমি বিছানায় যাই এমন নয়।'

মৎস্যগন্ধার মশকরা ধরতে না পেরে এস্তাদিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'না, না, সে জন্য নয়, আমি এমনি এই উপহারটা দিলাম।'

মৎস্যগন্ধা মৃদু হেসে বলল, 'আসলে বারবনিতাদের এমনিতে তো কেউ কোনও উপহার দেয় না তাই বললাম।'

এস্তাদিও জবাব দিল, 'তুমি সেদিন আমার জন্য যা করেছ তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

মৎস্যগন্ধা এবার তাকাল এস্তাদিওর চোখের দিকে। কী গভীর সুন্দর নীল চোখ! মৎস্যগন্ধার মনে পড়ে গেল কিছুক্ষণ আগে দেখা স্বপ্নটার কথা। আর এরপরই তার মনে হল, 'আচ্ছা, এ স্বপ্ন কি সত্যি হতে পারে না?'

সে প্রশ্ন করল, 'নাবিক, তোমার বাড়ি কোথায়?'

এস্তাদিও বলল, 'পর্তুগালে টেগাস নামের মোহনার কাছে এক গ্রামে। ছবির মতো সুন্দর এক গ্রাম। খড়ের ছাউনির কাঠের বাড়ি।' জায়গাটার সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই মৎস্যগন্ধার। মনে-মনে সে কল্পনা করার চেষ্টা করল সেই গ্রাম। তারপর জানতে চাইল 'কে আছ তোমার সেখানে?'

'কেউ নেই। বাবা-মা, দুজনেই প্রয়াত। তবে আমাদের একটা বংশগরিমা আছে।' ভাস্কো যে তার সম্পর্কিত কাকা হন, সে-কথা আর একটু হলেই বলে ফেলছিল এস্তাদিও। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে।

'বিয়ে করো নি কেন? অবশ্য নাবিকদের বন্দরে বন্দরে বউ থাকে।'—কথাটা হেসেই বলল মৎস্যগন্ধা।

এস্তাদিও বলল, 'না, আমি কোনও দিন কোনও গণিকালয়ে যাইনি। ঘটনাচক্রে এখানে এলাম।'

কথাটা শুনে মৎস্যগন্ধা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'তুমি বড় অদ্ভুত লোক তো! নাবিক অথচ বেশ্যালয়ে যাওনি!'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল এস্তাদিও। তার কিছু খবর সংগ্রহের প্রয়োজন। সে বলল, 'তুমি যে এই গণিকালয় চালাও, তার জন্য জমিদারকে কর

BanglaBook.org

দিতে হয়?'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'হ্যাঁ, দিতে হয়। আমি জমিদারের সেরেস্তায় গিয়ে কর দিয়ে আসি। রাজবাড়ি শহরের একটু ভিতর দিকে।'

'বিরাট বাড়ি নিশ্চই?'

'হ্যাঁ, বিরাট বাড়ি। অনেক মহল, নাটমন্দির, দেবমন্ডপ সব আছে।'

'পরিখা দিয়ে ঘেরা?'

'প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পরিখা কেন হবে?' হেসে বলল মৎস্যগন্ধা।

এস্তাদিও বুঝে নিল, রাজবাড়িটা তবে দুর্গ ধরনের নয়। সে বলল, 'আমাদের দেশের ধনী ভূস্বামীদের বাড়িগুলো পরিখা ঘেরা হয় তাই বললাম। নিশ্চই সেখানে অনেক সৈন্য, কামান, গোলন্দাজ আছে?'

মৎস্যগন্ধা জবাব দিল, 'লাঠিয়াল আছে জনা পঞ্চাশ। বিসর্জনের শোভাযাত্রায় তারা লাঠিখেলা দেখায়। আর বর্শাধারী কিছু দারোয়ান আছে, তারা দেউড়ি পাহারা দেয়। হ্যাঁ, কামান আছে বটে, তবে একটাই। দুর্গাপুজোর সময় তোপ দাগা সেখান থেকে।'

এস্তাদিও, মৎস্যগন্ধার কথায় মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করল জমিদার বাড়ি সম্পর্কে। এ-সংবাদগুলো তাকে লিখে রাখতে হবে ভাস্কোকে দেবার জন্য।

মৎস্যগন্ধা এরপর প্রশ্ন করল, 'নাবিক, তুমি কতদিন থাকবে এখানে?'

এস্তাদিও বলল, 'সম্ভবত আরও দিন পনেরো। জাহাজে যা মাল এনেছিলাম তা সবই প্রায় বিক্রি হয়ে গেছে। কিছু কাপড় কেনার কথা আছে। সে-কাজ মিটলেই রওনা হব।'

'কোথায় তোমার দেশে?'

গোয়াতে গিয়ে এ অঞ্চলের খবরাখবর ভাস্কোকে দেবার কথা এস্তাদিওর। কিন্তু সে-কথা বলা যাবে না মৎস্যগন্ধাকে। তাই সে বলল 'দেখা যাক। নাবিকের জীবন তো। ঘরে ফিরতে চাইলেও ঘরে ফেরা হয় না অনেক সময়। এ-বন্দর সে-বন্দর করেই জীবন কেটে যায়। তার ওপর নানা বিপদও অপেক্ষা করে থাকে সমুদ্রে।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'আমাদের নারীদের জীবনের সঙ্গে তোমাদের নাবিকদের জীবনের বেশ মিল আছে। খালি ভেসে চলা আর ভেসে চলা। শেষ পর্যন্ত যে কোথায় গিয়ে মাটি পাওয়া যাবে তা কেউ জানে না।'

BanglaBook.org

এ-কথা বলার পর মৎস্যগন্ধা বলে বসল, 'আচ্ছা, তোমার ঘর বাঁধতে ইচ্ছা করে না? এমনভাবে ভেসে বেড়াতে ভালো লাগে তোমার?'

প্রশ্নটা শুনে মৃদু চমকে উঠে এস্তাদিও তাকাল মৎস্যগন্ধার দিকে। এ-প্রশ্ন এস্তাদিওকে আগে কেউ করেনি, কোন নারী তো নয়ই। খোলা জানলা দিয়ে বেলা শেষের আলো এসে পড়েছে মৎস্যগন্ধার মুখে। সেই মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে এস্তাদিওর মনে হল কোনও অপ্সরা যেন বসে আছে তার সামনে। এই প্রথম যেন কোনও নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করল এস্তাদিও।

না সে আকর্ষণ মৎস্যগন্ধার বক্ষ আবরণীর ভিতর থেকে ঈষৎ উঁকি দেওয়া শঙ্খের মতো স্তন বা স্বচ্ছ কাপড়ের আড়ালে দৃশ্যমান গভীর নাভির জন্য যৌন আকর্ষণ নয়, অন্যরকম ভালো লাগার এক আকর্ষণ। বিকেলের সোনারোদ ছুঁয়ে যাচ্ছে মৎস্যগন্ধার দীর্ঘ কেশরাশি, গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট, চিবুক। তবে এক মৃদু বিষণ্ণতা যেন জেগে আছে মৎস্যগন্ধার চোখের পাতায়। বেশ কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে রইল এস্তাদিও। তারপর বলল, 'তোমাকে ঠিক সেরিয়ার মতো দেখতে লাগছে।'

পর্তুগিজ শব্দ, 'সেরিয়া' শব্দটার অর্থ না বুঝতে পেরে মৎস্যগন্ধা বলল, 'তার মানে?'

এস্তাদিও বলল, 'সেরিয়া' মানে হল 'মৎস্যকন্যা'। অপরূপ দেখতে হয় তারা। দেহের ঊর্দ্ধাঙ্গ মানবীর, কোমর থেকে নীচের অংশ মাছের মতো। গভীর সমুদ্রে তাদের দেখতে পায় অনেকে। হাতছানি দিয়ে তারা ডাকে নাবিকদের, কাছে গেলেই তারা দূরে সরে যায়। তাদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে কত যে জাহাজডুবি হয়েছে তার হিসাব নেই।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'এবার বুঝলাম। আমি শুনেছি তাদের গল্প। তবে ভরসা রাখতে পারো, আমি তোমাকে ডোবাব না।' কথাগুলো বলে হাসল সে।

এস্তাদিও হাসল।

মৎস্যগন্ধা এরপর বলল, 'আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু পেলাম না। ইচ্ছা করে না ঘর বাঁধতে?'

একটু চুপ করে থেকে এস্তাদিও বলল, 'করে। কিন্তু কাউকে নিয়ে ভালো করে ঘর বাঁধতে অর্থের প্রয়োজন। সে-অর্থ আমি এখনও সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। আমি খুব সাধারণ বণিক। এই প্রথম এত দূরে বাণিজ্য করতে এসেছি। এই যে জাহাজটা দেখছ সেটা কিন্তু আমার নয়। ভাড়াতে এনেছি। একজনের

BanglaBook.org

সুপারিশে রাজকোষ থেকে কিছু ঋণ দেওয়া হয়েছে আমাকে। এখানে এসে পণ্য বিক্রি করে আমার বেশ কিছু মুনাফা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু জাহাজের ভাড়া মেটাতে আর দেনা শোধ করার পর খুব সামান্যই অবশিষ্ট থাকবে আমার হাতে।'

কথাটা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল মৎস্যগন্ধা। তারপর বলল, 'ধরো, হঠাৎ করে তুমি একসিন্দুক সোনা-ধনরত্ন পেলে। ধনী হয়ে গেলে। তবে কি ঘর বাঁধবে তুমি?'

প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেলে এস্তাদিও বলল, 'তুমি কি জলদস্যুদের গুপ্তধনের কথা বলছ? নির্জন দ্বীপে লুকিয়ে রাখা বা সমুদ্রে ভেসে আসা সিন্দুকের কথা? হ্যাঁ, অমন সিন্দুক কোন কোনও নাবিক পায় বলে শুনেছি। কিন্তু আমার তেমন ভাগ্য নেই।'

মৎস্যগন্ধা আর কথা বলল না এ-প্রসঙ্গে। কী যেন ভাবতে লাগল যে।

বিকাল হয়ে গেছে। দিনশেষের আলো গায়ে মেখে নদীতে দাঁড়িয়ে আছে সার সার জাহাজ-নৌকাগুলো। খোলা জানলা দিয়ে নদীবক্ষের সে জায়গা চোখে পড়ছে এস্তাদিওর।

চুপ করে বসে আছে মৎস্যগন্ধা। এস্তাদিওর মনে হল, 'এবার যাবার সময় হয়েছে। পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল 'এবার চলি।'

মৎস্যগন্ধার চোখে তখন ভাসছিল স্বপ্নে দেখা সেই ছবি। সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত অজানা দ্বীপের সোনালি বালুতটে দাঁড়িয়ে আছে মৎস্যগন্ধা। সামনে ছবির মতো ছোট্ট সুন্দর একটা গ্রাম। সেটা কি মৎস্যগন্ধার দেশ? নাকি এস্তাদিওর ফেলে আসা গ্রাম? সেই স্বপ্নের দেশে মৎস্যগন্ধাকে কি নিয়ে যেতে পারবে এই বণিক?'

এস্তাদিওর কথায় চিন্তাজাল ছিন্ন হল মৎস্যগন্ধার। সে পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমার একটা জিনিস আছে আমার কাছে। ভেবেছিলাম পাঠিয়ে দেব। তুমি যখন এলেই তখন জিনিসটা নিয়ে যাও।'

'কী জিনিস?' জানতে চাইল এস্তাদিও।

মৎস্যগন্ধা বলল, 'তোমার টুপিটা। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। দেওয়া হয়নি।'

এস্তাদিওর নিজের মাথায় এখন একটা নতুন টুপি। সে বলল, 'তাই নাকি? আমার খেয়াল ছিল না। অবশ্য ওটা তোমার কাছে রয়ে গেলেও সমস্যা ছিল

BanglaBook.org

না আমার। বেশ ক'টা টুপি আছে আমার।'

দেরাজটা খুলতে গিয়েও থেমে গেল মৎস্যগন্ধা। সে বলল, 'টুপিটা কি আমি তবে রেখে দিতে পারি?'

কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল এস্তাদিও। মেয়েটা অদ্ভুত তো! তারপর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'রেখে দাও।'

দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছিল এস্তাদিও। মৎস্যগন্ধা তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'আবার এসো।'

এস্তাদিও মৃদু হেসে বলল, 'কিন্তু আমি তো তোমার খদ্দের নই। আমি এলে সময় নষ্ট হবে তোমার। সে-সময়টা অন্য কাউকে সঙ্গ দিলে অর্থ উপার্জন হবে।'

মৎস্যগন্ধা তাকাল নাবিকের চোখের দিকে। কী গভীর নীল চোখ! সে-চোখের মধ্যে যেন সে দেখতে পাচ্ছে সেই অজানা দেশের রোদালি শান্ত বালুতট, যেখানে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে তারা দুজন। যেন একটা ঘোর কাজ করছে মৎস্যগন্ধার মধ্যে। সে হাত ধরল এস্তাদিওর। নাবিকের রুক্ষ হাতে মৎস্যগন্ধার কোমল হাতের স্পর্শে যেন শিহরণ খেলে গেল এস্তাদিওর শরীরে। এ স্পর্শ সে কোনও দিন পায়নি। তার হাত স্পর্শ করে তার দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী। গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁটগুলো যেন উন্মুখ হয়ে আছে এস্তাদিওর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। নিজেকে যেন আর ধরে রাখতে পারল না এস্তাদিও। নিজের অজান্তেই যেন মাথাটা নামিয়ে আনল এস্তাদিও। তার এত দিনের সব সংস্কার যেন মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। এস্তাদিওর ঠোঁট স্পর্শ করল বন্দর সুন্দরীর ঠোঁট। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি! সত্যি শিহরন খেলে যেতে লাগল তার শরীরে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অবশ্য নিজেকে সামলে নিয়ে ঠোঁট সরিয়ে নিল এস্তাদিও। মৎস্যগন্ধা তখনও চেয়ে আছে তার দিকে। অস্পষ্টভাবে কোন এক ঘোরের মধ্যে সে যেন বলল, 'আবার এসো। তুমি এলে কোন ক্ষতি হবে না আমার।'

এস্তাদিও হেসে বলল, 'হ্যাঁ আসব।' তারপর বলল, 'তবে মনে হয় ব্যবসায়িক ক্ষতিটা তোমার কিছুটা পুষিয়ে যাবে।'

মৎস্যগন্ধাও এবার ধীরে ধীরে হুঁশ ফিরে পাচ্ছে। সে বলল, 'এ কথার মানে?'

এস্তাদিও বলল, 'আমার নাবিকদের আজ থেকে এখানে আসার কথা।

BanglaBook.org

হয়তো তারা ইতিমধ্যে ভিড় জমাতে শুরু করেছে তোমার দরজায়।'

কথাটা শুনে একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল মৎস্যগন্ধার ঠোঁটে। এস্তাদিও আর দাঁড়াল না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সে। এস্তাদিও ঘর ছাড়তেই পালঙ্কে শুয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল মৎস্যগন্ধা। সে ভাবতে লাগল, কেন সে এমন করল ওই পর্তুগিজ যুবককে দেখে! তাকে দেখেই কেন সে অন্যরকম হয়ে গেল! মৎস্যগন্ধা যেন নিজেই নিজেকে চিনতে পারছে না। মৎস্যগন্ধার এতদিনের চরিত্রের কাঠিন্য যেন ভেঙেচুরে দুমড়ে- মুচড়ে যাচ্ছে! কেন এমন হল? কেন এমন হচ্ছে?

সূর্য ডুবতে চলেছে। কোনও এক জাহাজ থেকে শিঙা বাজছে। দিনশেষে নাবিকদের বন্দর থেকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে জাহাজ। জাহাজের শিঙা অথবা শঙ্খধ্বনি সাধারণ মানুষের কানে সব জাহাজের ক্ষেত্রে এক মনে হলেও নাবিকরা শব্দের সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরতে পারে। চিনতে পারে নিজ নিজ জাহাজের শিঙার ডাক। জানলা দিয়ে ভেসে আসা সেই শব্দে হুঁশ ফিরল মৎস্যগন্ধার। উঠে বসল সে। তাকে এবার নীচে নামতে হবে। খদ্দেরদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। নতুন মেয়েগুলোর আজ প্রথম দিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে নীচে নেমে এল মৎস্যগন্ধা। অন্য খদ্দেরদের সঙ্গে সে দেখতে পেল পর্তুগিজ নাবিকদের একটা বেশ বড় দলকে। খবরটা তাকে ঠিকই জানিয়ে গেছিল এস্তাদিও। জনাকুড়ি পর্তুগিজ নাবিক। তিন ধরনের মেয়েদের পছন্দ করল তারা। জেপাং নারী, মোম্বাসা কৃষ্ণাঙ্গ নারী, আর কেউ কেউ বেছে নিল নবাগত মেয়েদের। নতুন নাবিকদের থেকে পয়সা আগাম গুনে গেঁথে নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে নির্দিষ্ট কুঠুরির মতো সার সার ঘরগুলোতে ঢুকিয়ে দিল মৎস্যগন্ধা। তার আগে অবশ্য নবাগত নাবিকদের জানিয়ে দিল যে নারীদের সঙ্গে কোনও বিকৃত পীড়াদায়ক যৌন সংস্রব করা চলবে না। কোনও অভিযোগ এর সম্বন্ধে এলে সেই নাবিককে আর গণিকালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। কারণ ভিনদেশি অনেক নাবিকের মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক পায়ুসঙ্গমের প্রবণতা থাকে। আর তা সহ্য করতে না পেরে মেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই এই সাবধানবাণী, পর্তুগিজ নাবিকদের প্রতি।

সন্ধ্যারাত আর তার পরও অনেকটা সময় খদ্দেরদের সামলাতে আর নানা কাজে কেটে গেল মৎস্যগন্ধার। এবার বাইরে বেরোতে হবে তাকে। মৎস্যগন্ধা একাই যায় সেই জায়গাতে। যে কাজে সে যায়, যেখানে সে যায়, তার সাক্ষ্য

BanglaBook.org

প্রমাণ রাখতে চায় না মৎস্যগন্ধা। সঙ্গী বলতে শুধু থাকে তার কোমরে লুকোনো তীক্ষ্ণ ছুরিটা। বাইরে বেরোনোর আগে সে শুধু বলে যায় শ্যামাকে। তবে কোথায়, কী কাজে যাচ্ছে, বলে না। শ্যামার অবশ্য ধারণা, তার মালকিনের কোনও গোপন প্রেমিক আছে। তার অভিসারেই এভাবে বাইরে বেরোয় মৎস্যগন্ধা। এ ধারণাটা থাকা অবশ্য মৎস্যগন্ধার পক্ষে ভালো। সব কাজ সামলে ওঠার পর গণিকালয়ের বাকি রাতের দায়িত্ব শ্যামার কাছে সঁপে দিয়ে কালো চাদরে নিজেকে আবৃত করে পিছনের দরজা দিয়ে গণিকালয় ত্যাগ করল মৎস্যগন্ধা। বন্দর অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এল সে। রাস্তায় কোথাও কোনও জনপ্রাণী নেই। মাথার ওপর জেগে আছে ক্ষীণ চাঁদের আলো। যে জায়গাতে তাকে যেতে হবে তা শহরের বাইরে। দিনের বেলাতেও সাধারণত নগরবাসী সেদিকে বিশেষ যাওয়া-আসা করে না। সে জায়গা বেশ খানিকটা দূরস্থানও বটে। ক্ষীণ চাঁদের আলোতে মৎস্যগন্ধা দ্রুত পায়ে এগোতে লাগল তার গন্তব্যের দিকে। মাঝে মাঝে শুধু সে পিছন ফিরে দেখে নিতে লাগল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা।

এগিয়ে চলল মৎস্যগন্ধা। গন্তব্যস্থল অতিপ্রাচীন এক বৌদ্ধমঠ।

হাজার বছর আগে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র ছিল এই তমালিকা বন্দর। এই বন্দর থেকেই একদিন ভারতসম্রাট অশোক তাঁর পুত্র-কন্যা মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রাকে লঙ্কায় পাঠিয়েছিলেন। এই বন্দর থেকেই রাজা গুহসীব তাঁর কন্যা হেমমালা ও জামাতাকে দিয়ে ভগবানের দন্তধাতু লঙ্কাদেশে পাঠিয়েছিলেন নানা দুর্যোগ উপেক্ষা করে। বলা ভালো, পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর থেকেই এ-অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমতে থাকে। ভাস্কোর ভারত অভিযানের প্রায় ন'শো বছর আগে চৈনিক পরিব্রাজকরা এ দেশের মাটিতে পা রেখেছিলেন। তখনও কিন্তু এ-তল্লাটে বেশ কিছু বৌদ্ধ বিহার টিকে ছিল। তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে লিখে গেছেন—"সমতট থেকে পশ্চিম দিকে ন'শো লি পথ পাড়ি দেওয়ার পর এসে পৌঁছলাম 'তান মো লি তি' বা তাম্রলিপ্তি রাজ্যে। রাজ্যটি আকারে পনেরোশো লির মতো। রাজধানীর আয়তন দশ লি।...নিয়মিত চাষবাস চলে। প্রচুর ফল ও ফুলের ছড়াছড়ি এখানে।...এখানে দশটির মতো বৌদ্ধবিহার আছে, হাজার খানেক ভিক্ষুর বাস।...দেশটির উপকূলভাগ একটি সমুদ্র খাঁড়ি দিয়ে বেষ্টিত। জল ও ভূমি যেন একে অপরকে আলিঙ্গন করেছে এখানে। প্রচুর দামি দামি জিনিস এবং রত্নসামগ্রী এখান থেকে

BanglaBook.org

সংগৃহীত হয়। এজন্য এলাকার অধিবাসীরা বেশ ধনী।...”

সাঙ বর্ণিত সেই সংঘারাম গুলোর অস্তিত্ব আজকের এই তমালিকা বন্দরশহরে নেই বললেই চলে। সময় বড় নিষ্ঠুর। একদিন যে সংঘারাম-মঠগুলো থেকে শোনা যেত ভিক্ষুদের সম্মিলিত ‘বুদ্ধং শরনম্ গচ্ছামি’ ধ্বনি, অন্ধকার নামলেই সার সার প্রদীপমালাতে উদ্ভাসিত হত মঠগুলো, সেসব মঠ আজ ধুলো হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে অথবা তাদের ধ্বংসস্তূপে এখন শেয়াল-কুকুরের বাসস্থান। তবু তারই মাঝে একটা মঠ তার নড়বড়ে চেহারা নিয়ে আজও যেন অকারণে টিকে আছে। মাত্র একজন অতিপ্রাচীন ভিক্ষু সেখানে বাস করেন।

বেশ অনেকটা পথ অতিক্রম করে মৎস্যগন্ধা এক সময় পৌঁছে গেল সে-জায়গাতে। ঝোপঝাড়-জঙ্গলাকীর্ণ একটা জায়গার মাঝখানে ক্ষীণ চাঁদের আলোতে ভৌতিক অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায়-ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীন মঠটা। কয়েকটা কক্ষ কোনওরকমে আজও টিকে আছে। মৎস্যগন্ধা সেই প্রাচীন মঠের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কয়েকটা আলোকবিন্দু তার সামনে দিয়ে ছুটে গেল। শিয়ালের চোখ। অন্য কেউ হলে এ দৃশ্য দেখলে হয়তো ভৌতিক ব্যাপার ভেবে আতঙ্কিত হত। কিন্তু এখানকার পরিবেশ মৎস্যগন্ধার চেনা। এমন রাত্রিতে, এমনকী ঝড়-জলপূর্ণ দুর্যোগের রাত্রিতেও বহুবার এ জায়গাতে এসেছে মৎস্যগন্ধা। তবুও একটু সতর্কভাবে চারপাশে একবার কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে খণ্ডহর মঠের অন্ধকারে প্রবেশ করল মৎস্যগন্ধা।

চেনা পথ। সর্পিল অলিন্দ পেরিয়ে এক কক্ষে উপস্থিত হল সে। একটা প্রদীপ জ্বলছে সেই কক্ষে।

ঘি আর ধূপের মৃদু সুবাস ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। দেওয়ালের একপাশে একটা প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি দণ্ডায়মান। তার পায়ের কাছে ধূপের ছাই জমা হয়ে একটা ঢিপি মতো তৈরি হয়েছে। কত যুগ ধরে যে সেই ছাই জমা হয়ে আছে কে জানে! তার কিছুটা তফাতে ধ্যানস্থ ভঙ্গিতে বসে আছেন মুণ্ডিতমস্তক অস্থিচর্মসার এক অতিপ্রাচীন ভিক্ষু। নিশাদপাদ।

মৎস্যগন্ধা সেই কক্ষে প্রবেশ করতেই সম্ভবত তার পায়ের রিনিরিনি শব্দে চোখ মেললেন নিশাদপাদ। মৎস্যগন্ধা তাঁর সামনে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে প্রণাম জানাল তাঁকে। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে ডান হাত তুললেন প্রাচীন।

মৎস্যগন্ধা তাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু শ্রমণ তাকে থামিয়ে দিয়ে

BanglaBook.org

চাপাস্বরে বললেন, 'সিংহল থেকে কিছু লোক এসেছেন আমার কাছে। পাশের কক্ষে তাঁরা নিদ্রামগ্ন। চলো সে জায়গায় গিয়ে কথা বলি।'

মৎস্যগন্ধা মৃদু আশ্চর্য হল কথাটা শুনে। এখানে কোনও লোক কোনওদিন এসেছে বলে শোনেনি সে।

দুজনেই এরপর উঠে দাঁড়াল। কুলুঙ্গি থেকে একটা প্রদীপ নিয়ে সেটা জ্বালিয়ে নিয়ে কক্ষত্যাগ করলেন শ্রমণ। তাঁকে অনুসরণ করল মৎস্যগন্ধা।

অন্ধকার ধ্বংসস্তূপ, নানা কক্ষ-অলিন্দ অতিক্রম করে তারা প্রথমে উপস্থিত হল মঠের পিছন দিকের এক কক্ষে। তার মেঝের ওপর একটা পাথরের পাটাতন রাখা আছে। শ্রমণ ইশারা করলেন পাটাতনটা সরিয়ে দেবার জন্য। আগে কাজটা তিনি নিজেই করতেন এখন আর বয়সের ভারে পারেন না। মৎসগন্ধা পাটাতনটা সরিয়ে দিতেই তার নীচ থেকে উন্মোচিত হল একটা সিঁড়ি। ধীরে-ধীরে সেই সিঁড়ি বেয়ে ভূগর্ভস্থ সেই গোপন কক্ষে উপস্থিত হল তারা।

ছোট্ট একটা কক্ষ। তার এক কোণে রাখা আছে ছোট্ট একটা পেটিকা বা সিন্দুক। শ্রমণ প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন আর মৎস্যগন্ধা এগিয়ে গিয়ে খুলল সামোরিনের সেই সিন্দুক। অবশ্য ও-সিন্দুক কার ছিল তা মৎস্যগন্ধা বা ভিক্ষু নিশাদপাদের জানা নেই। স্বয়ম্ভুনাথ মৃত্যুর আগে তীর্থযাত্রাফেরত বৌদ্ধ ভিক্ষু নিশাদপাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছিলেন এই পেটিকা আর মৎস্যগন্ধাকে।

মৎস্যগন্ধা পেটিকার ডালা খুলতেই যেন আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। হীরক, মরকতমণি, পান্না, আরও নানা দামি-দামি দুর্মূল্য পাথর আর স্বর্ণখণ্ডে ঠাসা সেই পেটিকা। মৎস্যগন্ধা অতি সামান্য জিনিসই নিয়েছে এই সিন্দুক থেকে। আর তাতেই তার কাজ চলে গেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পেটিকার দিকে। তারপর ছোট একটা স্বর্ণখণ্ড তুলে নিয়ে সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে দিল।

এবার ফেরার পালা। মৎস্যগন্ধা ঘুরে দাঁড়াতেই নিশাদপাদ তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'দীর্ঘদিন তোমার এই রত্নপেটিকা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছি আমি। এবার এ-পেটিকা তুমি নিজের কাছে নিয়ে যাও।'

এমন কথা শুনে বেশ অবাক হয়ে গেল মৎস্যগন্ধা। বিস্মিতভাবে সে বলল, 'কেন? আমি কি কিছু অন্যায় করলাম?'

স্মিত হেসে শ্রমণ বললেন, 'সেকথা নয়। সিংহলের দন্ত মন্দির থেকে লোক

BanglaBook.org

এসেছে আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে। আর ক'দিনের মধ্যেই আমি তাদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করব সিংহলের উদ্দেশ্যে।'

তাঁর কথা শুনে মৎস্যগন্ধা আরও বিস্মিতভাবে বলল, 'আপনি চলে যাবেন? আপনি ছাড়া আমার যে ভরসা করার মতো, বিশ্বাস করার মতো কোনও লোক নেই এ পৃথিবীতে।

বৃদ্ধ শ্রমণ শান্তস্বরে বললেন, 'এ পৃথিবীতে কোনও কিছুই কোনওদিন থেমে থাকে না। আমার জন্যও নয়, তোমার জন্যও নয়। পৃথিবী তার নিজের নিয়মে চলে। জরা আমাকে গ্রাস করেছে। মৃত্যুর পদধ্বনিও আমি শুনতে পাচ্ছি। আমি ভগবানের ডাক শুনতে পাচ্ছি। বাকি যে-ক'টা দিন আমি বাঁচি সে-ক'টা দিন ওই দন্তমন্দিরে রক্ষিত ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দন্তধাতুর পদতলে কাটাতে চাই।'

মৎস্যগন্ধার চোখ বেয়ে এবার টপটপ করে জল পড়তে শুরু করল। তাতে যেন মৃদু বিচলিত হলেন শ্রমণ নিশাদপাদ। তিনি বললেন, 'এ জায়গা ছেড়ে যেতে আমারও বেশ কষ্ট হচ্ছে। বিশেষত, এই ঘরটার জন্য। তবে তা এই ঘরে এই রত্নপেটিকা রক্ষিত আছে বলে নয়। এঘর অত্যন্ত পবিত্র স্থান। তোমাকে কোনওদিন বলিনি, এ গুপ্ত-কক্ষ কেন নির্মাণ করা হয়েছিল তা জানো? ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দাঁত গোপনে তমালিকা বন্দর থেকে সিংহলে নিয়ে যাবার আগে ব্রাহ্মণরা যাতে সে-দাঁত ধ্বংস করতে না পারে সেজন্য দন্তপুর থেকে এনে শেষে ক'দিনের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এই কক্ষে। কোন ছোট বয়সে আমি এখানে এসেছিলাম তা আমার নিজেরই মনে পড়ে না। মারাঠা জীবনটাই তো আমার এখানে কেটে গেল...

শ্রমণ এরপর বললেন, 'হয়তো তোমার সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা। এরপর এই মঠ হয়তো বা তস্কর-ডাকাত-ভবঘুরেদের আস্তানা হবে। তারা হয়তো খুঁজে পাবে এই গুপ্তকক্ষ, তোমার এই পেটিকা। তুমি যত দ্রুত সম্ভব এই রত্নপেটিকা নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখো।'

মৎস্যগন্ধা বুঝতে পারল, শ্রমণ মনস্থির করে নিয়েছেন এই মঠ ত্যাগ করার ব্যাপারে, তাঁকে আর নিবৃত্ত করা যাবে না। চোখের জল মুছে মৎস্যগন্ধা তাঁকে বলল, 'দূর দেশের যাত্রী আপনি। পথে, অচেনা জায়গাতে অর্থের প্রয়োজন হতে পারে আপনার। এই পেটিকা থেকে কিছু জিনিস নিয়ে যান আপনি।'

মৎস্যগন্ধার কথা শুনে শ্রমণ স্মিতহেসে বললেন, 'নিলে তো আমি অনেক

আগেই এ-সম্পদ পুরোটাই আত্মসাৎ করতে পারতাম। এই ছিন্ন বেশের পরিবর্তে রাজবেশ পরিধান করতাম। এমনকী আমি তোমার অনুপস্থিতিতে স্পর্শ করিনি ওই পেটিকা। ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজবেশ, রাজকোষ পরিত্যাগ করে পথে নেমেছিলেন মানবমুক্তির জন্য। আমি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি। পরিধানের এই চিবর আর কাঠারি অর্থাৎ কাঠের ভিক্ষাপাত্র ছাড়া ভিক্ষুদের আর কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মৎস্যগন্ধা বলল, 'যাবার আগে আমার প্রতি কোনও নির্দেশ দেবেন না আপনি?'

প্রশ্নটা শুনে শ্রমণও বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, 'তুমি যখন এ-প্রশ্ন করলে তবে বলি। নির্দেশ নয়, পরামর্শ। গণিকালয়ের ব্যবসা বন্ধ করো তুমি। হতভাগ্য নারীদের এই জীবনযন্ত্রণা থেকে তুমি মুক্তি দাও। সাত রাজার ধন আছে ওই রত্নপেটিকার মধ্যে। তোমার বেঁচে থাকার জন্য কোনওদিন অর্থাভাব হবে না। এ তমালিকা বন্দর সময় সময় বড় নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। এ-বন্দর যেমন অনেককে অনেক কিছু দিয়েছে তেমনই অনেকের জীবন কেড়েও নিয়েছে। গণিকালয় বন্ধ করলে গুপ্ত শত্রুরা তোমাকে ঘিরে ধরবে এ-ও জানি। কারণ, তোমার ক্ষমতা প্রতিপত্তির উৎস ওই গণিকালয়। তা বন্ধ করার পর তুমি কোনও দূর দেশে চলে যেও, যেখানে তোমাকে কেউ চিনবে না। সেখানে গিয়ে তুমি ঘর বসাও। নতুন করে জীবন শুরু করো। গরিব দুঃখীদের দান ধ্যান করো। আর যদি কোনও কষ্ট নেমে আসে তবে তথাগতকে স্মরণ কোরো।'—তাঁর কথা শেষ করলেন প্রাচীন ভিক্ষু নিশাদপাদ।

ভিক্ষুর কথাগুলো শুনে মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল মৎস্যগন্ধা। তাই দেখে নিশাদপাদ বললেন, 'আমাকে তোমার কোনও কথা দিতে হবে না। শুধু আমার কথাগুলো তুমি ভেবে দেখো।'

বাইরে শিয়াল ডেকে উঠল। শেষ প্রহর শুরু হল। এবার ফিরতে হবে মৎস্যগন্ধাকে। নইলে ফিরতে ফিরতে সূর্যোদয় হয়ে যাবে।

মৎস্যগন্ধা এগিয়ে এসে নতজানু হয়ে পাদস্পর্শ করল নিশাদপাদের। ভিক্ষু তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, 'করুণাময় ভগবান বুদ্ধ তোমার মঙ্গল করুন।'

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই প্রাচীন বুদ্ধমঠ ত্যাগ করল মৎস্যগন্ধা।

BanglaBook.org

তমালিকা বন্দরে আরও সাতটা দিন কেটে গেছে এস্তাদিওর। ইতিমধ্যে স্থানীয় বণিকদের কাছ থেকে কাপড় কিনে জাহাজে মজুত করাও হয়ে গেছে তার। বন্দর এলাকা থেকে আরও নানা তথ্য সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধও করেছে অদূর ভবিষ্যতে অ্যাডমিরাল, গোয়ার হবু গভর্নর ভাস্কোর হাতে পৌঁছে দেবার জন্য। খবরটা না পেলেও এস্তাদিওর অনুমান, পথে কিছু না ঘটে থাকলে এতদিনে নিশ্চই ভাস্কো পা রেখেছেন এ দেশের মাটিতে। এস্তাদিও যাত্রা শুরু করার সপ্তাহখানেক পরই ভাস্কোর এদেশে রওনা হবার কথা ছিল। সেই অর্থে রাজার পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছিল লিসবন বন্দরে। তাছাড়া ভাস্কোর নৌবহর এস্তাদিওর ছোট বাণিজ্যপোতের থেকে অনেক বেশি দ্রুতগামী। তাই কোনও অঘটন না ঘটে থাকলে আর নির্দিষ্ট দিনেই যদি অ্যাডমিরাল রওনা হয়ে থাকেন তবে নিশ্চিতভাবেই এদেশের মাটিতে পৌঁছে যাবার কথা।

কিন্তু এ-ক'দিন নানা কাজের মাঝে বারবারই এস্তাদিওর মনে পড়ছে একজনের কথা। চোখে ভেসে উঠছে তারই মুখ। সেদিন মৎস্যগন্ধার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটা কিছুতেই এস্তাদিও মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছে না। কেমন যেন এক অচেনা অমোঘ আকর্ষণ সে অনুভব করছে সেই বন্দর সুন্দরীর প্রতি। শুধু কি সে-নারীর গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁটের আহ্বান? তার উষ্ণতার স্পর্শ? এস্তাদিও ব্যাপারটা নিয়ে নিজেও ভেবে দেখেছে। তার মনে হয়েছে, এ শুধু মৎস্যগন্ধার শরীরী আকর্ষণ নয়। তার কিছু কথাও যেন গভীরভাবে দাগ কেটেছে এস্তাদিওর মনে। হয়তো বা সেটাই মৎস্যগন্ধার প্রতি তার আকর্ষণের মূল কারণ। এস্তাদিওর তমালিকা বন্দরের বন্ধনকাল শেষ হতে চলেছে। কাজ শেষ বললেই চলে। আর ক'টা দিন পরই তাকে রওনা দিতে হবে। আর হয়তো কোনও দিনই সে এ-বন্দরে ফিরবে না। তবু কেন এমন টান সে অনুভব করছে বুঝতে পারছে না এস্তাদিও।

সেদিন ভোরের প্রথম আলো যখন ঘরে প্রবেশ করল তখন চোখ মেলতেই এস্তাদিওর আবারও মনে পড়ল মৎস্যগন্ধার কথা। চোখের সামনে ভেসে উঠল

BanglaBook.org

কখনও মৎস্যগন্ধার চপলতা, আবার কখনও তার চোখে জেগে থাকা করুণ আর্তি। মৎস্যগন্ধার কথা ভাবতে-ভাবতে এস্তাদিও একসময় সিদ্ধান্ত নিল, সে শেষ একবারের জন্য তার সঙ্গে দেখা করে আসবে। আজ তার কোনও কাজ নেই। দুপুরের দিকে সে যাবে।

সান্টা মারিয়ার নাবিকরা নিয়মিত যাওয়া-আসা শুরু করেছে মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ে। এমনকী ক্যাপ্টেনের মাধ্যমে এস্তাদিও খবর পেয়েছে, জাহাজের চিকিৎসক ফ্রান্সিসেরও নাকি পদার্পণ ঘটেছে সেখানে। বিকেলের পর সেখানে গেলে তাদের কারও চোখে যদি এস্তাদিও ধরা পড়ে যায়, তবে তার অস্বস্তি বোধ হবে। এতদিন তারা জেনে এসেছে যে নারীদেহের প্রতি কোনও আসক্তি নেই এস্তাদিওর। তাই এস্তাদিওকে গণিকালয়ের আশেপাশে দেখলে নিশ্চই ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করবে। জাহাজ-ঘাটার দিক থেকে মাঝে-মাঝে শিঙার শব্দ ভেসে আসছে। নিশ্চই কোনও জাহাজ বন্দর ছেড়ে রওনা হয়েছে দেশের উদ্দেশ্যে। তারই সংকেতধ্বনি ওই শব্দ।

আলস্যে গা ডুবিয়ে বিছানায় শুয়ে মৎস্যগন্ধার কথা ভাবতে লাগল এস্তাদিও। বিশেষত, মৎস্যগন্ধার একটা প্রশ্ন—'ইচ্ছা করে না ঘর বাঁধতে?'

মৎস্যগন্ধার এ-প্রশ্নটাই সবচেয়ে বেশি মনে হয় তার। কোন ছেলেবেলায় বাবা-মাকে হারিয়েছে এস্তাদিও। টোগাস নদীর মোহনার কাছে ছোট্ট বাড়িটাতে সে একলাই থাকে। কিশোর বয়সে পেট চালানোর জন্য প্রথমে সে কাজ নিয়েছিল জেলে- ডিঙিতে। তারপর মোম্বাসাগামী এক বাণিজ্যপোতে কাজ। স্পেনসহ পর্তুগালের প্রতিবেশী দেশগুলোতে এরপর ছোট জাহাজ নিয়ে পণ্য সরবরাহের কাজ। আর সব শেষে অ্যাডমিরাল ভাস্কোর পরামর্শে, বলা ভালো, নির্দেশে সুদূর এই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে আসা। খালি ভাসা, ভেসেই চলেছে সে। কিন্তু সত্যিই যদি তার তেমন কোনও ঘর থাকত তবে কি এমনভাবে ভেসে বেড়াত সে? এস্তাদিও যখন জলে থাকে তখন মাঝে মাঝে তার মনে হয় ঘরের কথা। মনে হয় কবে ফিরব গ্রামে? কিন্তু ঘরে ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই সে আবার হাঁপিয়ে ওঠে। ভাবে, এই নিঃসঙ্গতার থেকে নাবিকের জীবন অনেক ভালো। কত নতুন দেশ নতুন মানুষ দেখা যায়। নিঃসঙ্গতা তেমনভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারে না মনের মধ্যে। পর্তুগিজ শব্দ মানেই তো আর নাবিক নয়, নাবিক আর কয়জন হয়? এদেশের অধিকাংশ মানুষ-ই তো পেঁপে, আনারস, আলু, গমের চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

BanglaBook.org

ঘর সংসার প্রতিপালন করে। যদি সত্যি এস্তাদিওর ঘরে কেউ থাকত, যে তাকে ভালোবাসা দেবে, মানসিক আশ্রয় দেবে তবে কি ঘর ছাড়ত এস্তাদিও? মৎস্যগন্ধার কথা ভাবতে-ভাবতে এসব কথাও ভাবতে লাগল সে।

বেলা একটু বাড়ার পর পেড্রো ঘরে এসে ঢুকতেই বিছানা ছেড়ে উঠে বসল এস্তাদিও। পেড্রো মাথার টুপি খুলে সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, 'আমরা কবে তমালিকা বন্দর ত্যাগ করছি বলুন তো?'

আজকাল মাঝে মাঝেই এই প্রশ্ন করে পেড্রো। আর এখানে তার থাকতে ইচ্ছা করছে না। দেশে ফেরার অপেক্ষায় সে দিন গুনছে।

তার কথা শুনে এস্তাদিও বলল, 'যাব। ঠিক সময়েই যাব। আর মাত্র কিছুদিন। ধৈর্য হারিয়ো না।'

পেড্রো বলল 'না, ধৈর্য হারাবার প্রশ্ন নয়। একজন আমাকে আজ এই প্রশ্নটা করল। আমার ধারণা, তার এই প্রশ্নর পিছনে কোনও উদ্দেশ্য আছে।'

'লোকটা কে?' জানতে চাইল এস্তাদিও।

পেড্রো বলল, 'স্থানীয় লোক। শুল্ক দপ্তরে কাজ করে। এর আগেও কয়েকদিন আমি লোকটাকে আমাদের আশেপাশে ঘুরতে দেখেছি। যেদিন আপনি আমাকে শুল্ক দপ্তরে লণ্ঠন দিতে পাঠিয়েছিলেন সেদিনও লোকটা নানা প্রশ্ন করছিল।

পেড্রোর কথায় এস্তাদিও বলল, 'হয়তো শুল্ক দারোগা আমাদের পিছনে তাকে লাগিয়েছে। তবে সমস্যার কারণ হবে না। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সঠিক হিসেব আমার কাছে আছে। কথাটা জানিয়ে ভালো করলে। আমি আজই তার সব হিসেব মিটিয়ে দিচ্ছি। দলিল- দস্তাবেজ নিয়ে তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।'

এস্তাদিও ভেবেছিল দুপুরবেলা মৎস্যগন্ধার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। কিন্তু বাণিজ্যকরের ঝামেলাটা মেটাবার জন্য খাতাপত্র-রসিদ দস্তাবেজ কাঁধে চাপিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুল্ক দারোগার দপ্তরের পথে রওনা হল সে। কিছুটা পথ এগোবার পরই একটা শোভাযাত্রার সামনে পড়ে গেল সে। মুণ্ডিত মস্তক, পীতবসন পরিহিত একদল কৃষ্ণবর্ণের বৌদ্ধ শিঙা, ঝাঁঝর বাজাতে বাজাতে এগোচ্ছে জাহাজঘাটার দিকে। শোভাযাত্রার ঠিক মাঝখানে গো-শকটে বসে আছেন এক অতিপ্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। শকটটা ফুলের মালা দিয়ে সাজানো।

পেড্রো বলল, 'সিংহলি জাহাজটা আজ ফিরে যাচ্ছে। গো শকটের ওপর যে বসে আছে সেই সন্ন্যাসী এখানকার এক বৌদ্ধ মন্দিরে থাকত। ওকে

BanglaBook.org

ওরা সিংহলে নিয়ে যাচ্ছে।

শোভাযাত্রাটা থেকে একজন লোক পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের হাতে কী যেন একটা জিনিস গুঁজে দিচ্ছে। এস্তাদিওকে দেখতে পেয়ে লোকটা এগিয়ে এসে তার হাতেও জিনিসটা দিল। কড়ে আঙুলের মতো আকারের চন্দনকাঠের ওপর এক পুরুষমূর্তি খোদিত আছে। খুব সুন্দর জিনিসটা। কাঠের মাথায় একটা ছিদ্রও আছে। সম্ভবত জিনিসটা সুতো দিয়ে গলায় ঝোলানো যায়। পেড্রো বলল, কাঠের গায়ে খোদিত ছবিটা হল বুদ্ধমূর্তির। এস্তাদিও চন্দনকাঠের টুকরোটা পোশাকের মধ্যে রেখে দিল। শোভাযাত্রা এস্তাদিওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এস্তাদিওরা এগিয়ে চলল তাদের গন্তব্যে।

শুল্ক দপ্তরে গিয়ে এস্তাদিও জানতে পারল, যে দারোগা আজ দপ্তরে আসবেন না। তবে শুল্ক জমা দেওয়া যেতেই পারে। এস্তাদিওর সঙ্গে কাগজপত্র নিয়ে বসে গেল তারা। যাবতীয় রসিদ-দলিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল তারা দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু এস্তাদিওর নিখুঁতভাবে মেলানো হিসেব কিছুতেই যেন মিলতে চাচ্ছে না তাদের কাছে। দুপুর হয়ে গেল তবু হিসেব মিলল না। এস্তাদিওর যাওয়ার কথা মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ে। অবশেষে হিসেব কেন মিলছে না তা অনুমান করতে পারল সে। দশটা রৌপ্যমুদ্রা বের করে এস্তাদিও গুঁজে দিল প্রধান হিসাবপরীক্ষকের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে হিসেব মিলে গেল তাদের। এরপর শুল্ক জমা দিয়ে রসিদ নিতে আরও কিছুটা সময় লাগল তার। কাজ মিটিয়ে এস্তাদিও যখন শুল্ক দপ্তরের বাইরে এসে দাঁড়াল তখন মাঝদুপুর। ভারমুক্ত হল এস্তাদিও। এখন আর কোনও চিন্তা নেই তার। যে-কোনও সময় সান্টা মারিয়াকে নিয়ে সে ভেসে পড়তে পারে সমুদ্রের দিকে। তার আগে মৎস্যগন্ধার সঙ্গে দেখা করে যাবে সে। পেড্রোর সঙ্গে কিছুটা পথ হেঁটে তার কাছে দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে এস্তাদিও সেগুলো নিয়ে তাকে ঘরে ফিরে যেতে বলল। পেড্রো সে সব নিয়ে চলে যাবার পর এস্তাদিও রওনা হল মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ের দিকে।

মন ভালো নেই মৎস্যগন্ধার। সেদিন রাতে বৃদ্ধ ভিক্ষু নিশাদপাদের মুখ থেকে তাঁর চলে যাবার ব্যাপারটা শোনার পর থেকেই বিষণ্ণতা কাজ করছে তার মনে। একইসঙ্গে বিপন্নতাও যেন ঘিরে ধরেছে তাকে। তাহলে শেষ মানুষটাও ছেড়ে যাচ্ছে তাকে। এ-তমালিকা বন্দরে আর এমন কোনও মানুষ রইল না যাকে বিপদে ভরসা করতে পারে মৎস্যগন্ধা। তবে এসবের মাঝে

BanglaBook.org

তার মনে হয় এস্তাদিওর কথাও। মৎস্যগন্ধা ভেবেছিল খুব তাড়াতাড়ি আবার সে আসবে। কিন্তু এক সপ্তাহ হয়ে গেল, নাবিকের দেখা নেই। এ ব্যাপারটাও যেন তার বিষণ্ণতাকে আরও বেশি বাড়িয়ে তুলেছে। রোজই ঘুম ভাঙার পর জানলা দিয়ে তাকিয়েছে বন্দরের দিকে, এস্তাদিওর জাহাজটার লাল পতাকাটা তাকে আশ্বস্ত করেছে যে, এস্তাদিও তমালিকা বন্দরেই আছে। মনে মনে সে ভেবেছে যে, আজ নিশ্চই নাবিক একবার আসবে। কিন্তু তার প্রতীক্ষায় সারা দিন থাকলেও নাবিক আসেনি। এইভাবেই সাত-সাতটা দিন কেটেছে তার। শ্রমণের শেষ কথাগুলোও গভীরভাবে দাগ কেটেছে মৎস্যগন্ধার মনে। সে তো চলে যেতেই চায় তমালিকা বন্দর ছেড়ে। নিশাদপাদ তাকে পরামর্শ দেবার আগেও তো সে ভেবেছে এ কথা বহুবার। কিন্তু কোথায় যাবে? কার সঙ্গে যাবে?

গত তিনদিন বিশেষ প্রয়োজন না হলে ঘর ছেড়ে বেরোয়নি মৎস্যগন্ধা। গণিকালয়ের দেখভাল শ্যামাই করেছে। শ্যামা বুঝতে পেরেছে, কিছু একটা হয়েছে মৎস্যগন্ধার। সে বেশ কয়েকবার জানতে চেয়েছে ব্যাপারটা। মৎস্যগন্ধা শুধু সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছে 'মন ভালো নেই।'

এদিন ঘুম ভাঙার পর স্নান সেরে নিজের কক্ষে রানিকে নিয়ে বসেছিল মৎস্যগন্ধা। জানলা দিয়ে নদীতটে নোঙর করা জাহাজগুলো দেখা যাচ্ছে। নির্জন দুপুর। একটা শঙ্খচিল পাক খাচ্ছে বন্দরের মাথায় আর মাঝে মাঝে করুণ স্বরে ডাক ছাড়ছে। তার কান্না ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে। সেদিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে ছিল মৎস্যগন্ধা। খাবারের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকল শ্যামা। তাকে দেখে মৎস্যগন্ধা বলল,'ওটা এখন নিয়ে যা। আমার খিদে নেই। পরে খাব।'

প্রবল এক বিষণ্ণতা যে মৎস্যগন্ধাকে ঘিরে রেখেছে তা বুঝতে অসুবিধা হল না শ্যামার। একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, 'ওই হুরী নামের মেয়েটাকে আপনার কাছে কিছু সময়ের জন্য পাঠাব?'

'কেন?' জানতে চাইল মৎস্যগন্ধা।

শ্যামা বলল, 'মেয়েটা নানা অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলতে পারে। দিল্লির সুলতান-আমীর-ওমরাহদের গল্প, হারেমের গল্প। হয়তো গল্প শুনলে মন ভালো হয়ে যাবে।'

তার কথা শুনে মৎস্যগন্ধা কিছুটা আনমনেই বলল, 'আচ্ছা পাঠাও দেখি, যদি মন ভালো হয়।'

BanglaBook.org

কিছুক্ষণের মধ্যেই কক্ষে প্রবেশ করল হুরী। মৎস্যগন্ধাকে কুর্নিশ করে পালঙ্কের ঠিক যেখানে মৎস্যগন্ধা ছত্রীতে হেলান দিয়ে বসে আছে সেখানে তার পায়ের নীচে মেঝেতে বসল হুরী।

যথারীতি হুরীকে দেখে একবার দাঁত বার করল রানি।

তার দিকে তাকিয়ে হুরী একটু ইতস্তত করে জানতে চাইল, 'এই প্রাণীটাকে কি এখানে রাখা হয়েছে যাতে আপনার খাবারে কেউ বিষ মেশাতে না পারে অথবা সাপ ঢুকতে না পারে সেজন্য?'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'না, রানি আমার বন্ধু-বাবা-মা-ভাই-বোন সবকিছু। কিন্তু এ প্রশ্ন করলি কেন? তুই আমাকে বিষ খাইয়ে মারতে চাস নাকি?'

হুরী কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দু-কানের লতিতে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, 'তওবা তওবা! আপনি আমাদের মা হন। আমি অন্য কারণে কথাটা জানতে চাইলাম। অপরাধ নেবেন না। সুলতানের হারেমের ব্যাপারে এগুলো নিয়ে আমি গল্প শুনেছি।

'মৎস্যগন্ধা নিজের মনের বিষণ্ণতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য বলল, 'বল তবে সে-গল্প শুনি।'

হুরী বলতে শুরু করল সে গল্প—'সুলতানের নানা জায়গাতে হারেম থাকলেও প্রধান হারেম যেখানে সুলতান নিয়মিত যাওয়া-আসা করেন তার পাশেই থাকে। দিল্লি ও আগ্রাতে দু-জায়গাতে সম্রাটের প্রাসাদ আছে আর তার পাশে হারেমও আছে। বিরাট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা শ্বেতপাথরে মোড়া সুলতানের হারেম। অনেক কক্ষ থাকে সেই হারেমে, সোনায় মোড়া শয়নকক্ষকে ঘিরে। হারেমের চারপাশে বিরাট বাগিচা সাজানো থাকে নানা ফুল-ফলের গাছে। সুলতান ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। বহিঃপ্রাচীর ও ফটক সার বেঁধে ঘিরে রাখে সুলতানের সেনারা। তাদের চোখ এড়িয়ে মাছিও প্রবেশ করতে পারে না ভিতরে। আর হারেমের প্রবেশদ্বারগুলোতে পাহারা দেয় খড়্গ হাতে দানবের মতো দেখতে হাবশি ক্রীতদাসরা। তাদের জিভ কাটা থাকে, কথা বলতে পারে না। যাতে তারা হারেমের খবর বাইরে প্রকাশ না করতে পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা। এছাড়া হারেমের ভিতর নজরদারি চালায় বৃহন্নলারা। মূলত তারাই হারেমের ভিতরের ব্যবস্থাটা দেখভাল করে। সুলতান বেশ নির্ভর করেন তাদের ওপর। নিজের প্রাণের ব্যাপারে সবসময় সজাগ থাকেন সুলতান। অনেক শত্রু থাকে তাঁর।

BanglaBook.org

যে-কোনও মুহূর্তে প্রাণ সংশয় হতে পারে তাঁর। না হয় হারেমে বাইরের কোনও লোক প্রবেশ করতে পারে না, কিন্তু যদি কেউ বিষ প্রয়োগ করে তাঁর খাবারে? অথবা প্রাচীরের বাইরে থেকে বিষধর সাপের ঝাঁপি ভিতরে ছুড়ে দেয় তখন কী হবে? এসব ব্যাপার আটকাবার জন্য পশু-পাখির সাহায্য নেওয়া হয়। হারেমের বাগিচায় বেজি তো থাকেই কিন্তু যে ময়ুর আর চিতল হরিণ থাকে তা শুধু নিছক মনোরঞ্জনের জন্য নয়। বেজির মতোই এ-দুই প্রাণীও সাপের চরম শত্রু। হারেমের ভিতর প্রতিটা অলিন্দে মাথার ওপর থাকে রুপোর দাঁড়ে বসানো সারিকা ভৃঙ্গরাজ ইত্যাদি পাখি। সাপের উপস্থিতি টের পেলেই তারা কর্কশভাবে ডেকে ওঠে। শ্বেতা, মুগ্ধক ইত্যাদি গাছও তামার পাত্রে বসানো থাকে হারেমের আনাচে-কানাচে। আর সুলতানকে যে-খাদ্য পরিবেশন করা হয়, পানীয় পরিবেশন করা হয় তাতে বিষ মেশানো আছে কিনা তা দেখে নেওয়ার জন্য পরিবেশনকারিনীদের তা খাওয়ানো হয় ঠিকই কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্যও নানা পশু-পাখি বিশেষত, পাখিদের সাহায্য নেওয়া হয়। যে-জায়গায় সুলতানদের খাবার রাখা হয় সেখানে সুলতানদের চোখের সামনে এনে রাখা হয় চারধরনের পাখির খাঁচা। ক্রৌঞ্চ, জীবঙ্গ-জীবক, মত্ত কোকিল আর চকোর। প্রকৃতি এদের এক অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়েছে। বিষের উপস্থিতি বুঝতে পারে এরা। আশেপাশে বিষাক্ত কিছু থাকলে নানা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয় তাদের মধ্যে। চকোরের চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করে, জীবক অবসন্ন হয়, ক্রৌঞ্চ মূর্চ্ছা যায় আর সুরাপান করানো-কোকিলের মৃত্যু হয়। তাই ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গিনীকেও হয়তো বা এ কারণেই এখানে রাখা হয়েছে।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'তুই এত সব কথা জানলি কীভাবে? সে হারেম দেখেছিস নাকি?'

হুরী বলল, 'না, নিজে দেখিনি। সুলতানের হারেমে ছিল এমন একজনের মুখে গল্প শুনেছি। সুলতানদের খাস হারেমে কি সব মেয়ে প্রবেশ করতে পারে? কুমারী মেয়ে ছাড়া কাউকে গ্রহণ করেন না সুলতান। আমার মায়ের শয়তান প্রেমিক তো আমারও কুমারীত্ব নষ্ট করে দিয়েছিল। যত সুন্দরী মেয়েই হোক না কেন, সুলতানের সামনে তাকে হাজির করাবার আগে তার কুমারীত্ব পরীক্ষা করে বৃহন্নলারা। পদ্ধতিটা খুব ভয়ঙ্কর। মাথায় রক্ত উঠে মৃত্যুও হয় অনেকের।'

'সে কেমন পদ্ধতি?' জানতে চাইল মৎস্যগন্ধা। অনেক সময় মৎস্যগন্ধাকে

BanglaBook.org

জেনে নিতে হয় তার গণিকালয়ে আসা নবাগতা মেয়েটি কুমারী কিনা।'

মৎস্যগন্ধার কথা শুনে হুরী একটু ইতস্তত করে বলল, 'মেয়েদের দু পা দুপাশে ফাঁক করে দড়ি বেঁধে মাথা মাটির দিকে করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর যোনিতে তৈল সিঞ্চন করে সুতো-বাঁধা একটা স্বর্ণগোলক স্থাপন করা হয় সেখানে। তৈল সিক্ত পিচ্ছিল যোনিগহ্বরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে থাকে সেই গোলক। দীর্ঘক্ষণ এভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয় সেই মেয়েকে। তারপর সুতায় টান দিয়ে সে-গোলক বের করে আনলে বোঝা যায় ওই গোলক যোনিগহ্বরে কত দূর প্রবেশ করেছিল। আর তা দেখেই অভিজ্ঞরা বুঝতে পারে যে, ইতিপূর্বে মেয়েটার কুমারীত্ব নষ্ট হয়েছে কিনা।'

মৎস্যগন্ধা শিউরে উঠল ব্যাপারটা কল্পনা করে। তার গণিকালয়েও অনেক সময় মেয়েদের কুমারীত্বর পরীক্ষা নেওয়া হয়। কারণ অনেক সময় খদ্দেররা কুমারী মেয়ে চায়। কিন্তু এমন ভয়ঙ্করভাবে কুমারীত্বর পরীক্ষা নেওয়া হয় না এখানে। মৎস্যগন্ধা কিছু একটা কথা জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল হুরীকে। কিন্তু ঠিক সেইসময় ঘরে প্রবেশ করল শ্যামা। সে বলল, 'পর্তুগিজ জাহাজের নায়ক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তাকে নিয়ে আসব তো?'

শ্যামা খেয়াল করল যে, কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল মৎস্যগন্ধার মুখটা। মৎস্যগন্ধা পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাকে নিয়ে আয়। আর সে যতক্ষণ ঘরে থাকবে ততক্ষণ কোনওভাবেই আমাকে বিরক্ত করবি না। রানিকেও সঙ্গে করে নিয়ে যা।'

রানিকে অবশ্য নিতে হল না। সেইসময় সে কক্ষসংলগ্ন অলিন্দে চলে গেল। আর হুরীকেও সে বলল, 'তুই এখন যা। পরে অন্য সময় তোর গল্প শুনব।'

শ্যামা আর হুরী সেই কক্ষ ত্যাগ করার পর পাশের স্নানাগারে ঢুকে দ্রুত চোখে-মুখে জল সিঞ্চন করে দেহে সুগন্ধী মেখে পোশাক পরিবর্তন করে নিজের কক্ষে ফিরে এল মৎস্যগন্ধা।

এস্তাদিও পা রাখল মৎস্যগন্ধার ঘরে। তাকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মৎস্যগন্ধার চোখ-মুখ। সে ইশারায় এস্তাদিওকে পালঙ্কে বসতে বলল। তারপর দরজায় খিল তুলে দিয়ে এসে এস্তাদিওর পাশে পালঙ্কে বসল। সে তাকাল এস্তাদিওর চোখের দিকে। কী সুগভীর নীল চোখ! তার মধ্যে রয়েছে নিজেকে হারিয়ে ফেলার হাতছানি!

এস্তাদিও তাকে প্রশ্ন করল, 'কী দেখছ?'

BanglaBook.org

মৎস্যগন্ধা প্রথমে জবাব দিল, 'তোমার চোখদুটো'। তারপর মৃদু অনুযোগের সুরে বলল, 'তোমার জন্য রোজ অপেক্ষায় থাকতাম। আসতে এত দেরি করলে কেন?'

এস্তাদিও মৃদু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলল, 'খুব ব্যস্ত ছিলাম এ-ক'দিন। আজ দুপুরে সব কাজ মিটল। তারপর এলাম।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'জানো, রোজ ঘুম ভাঙার পর আমি নদীর দিকে তাকিয়ে একবার করে দেখি তোমার জাহাজের লাল নিশানটা দেখা যাচ্ছে কিনা। ওটা দেখেই আমি বুঝতে পারতাম তুমি তমালিকা বন্দরেই আছ।'

কথাটা শুনে এস্তাদিও মৎস্যগন্ধার মনের অনুভূতিটা বুঝতে পারল। এস্তাদিওকে তো আজ নয় কাল তমালিকা বন্দর ছেড়ে চলে যেতেই হবে। মৎস্যগন্ধার কথা শুনে একটা বেদনাবোধ জেগে উঠল এস্তাদিওর মনের ভিতর। কী অপরূপা এই নারী! কত বিত্তশালী! কিন্তু কী একাকীত্ববোধ লুকিয়ে আছে তার মধ্যে! শেষের ব্যাপারটার সঙ্গে এস্তাদিওর নিজেরও মিল আছে। সে নিজেও তো একা। মৎস্যগন্ধার মতোই তারও ঘর থেকেও ঘর নেই।

বেশ কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তারা চুপচাপ বসে রইল। যেন কী বলবে সে-কথা খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। অবশ্য নিস্তব্ধতারও একটা ভাষা থাকে। ভালোবাসার ভাষা। হয়তো বা এটুকু সময়ের জন্য এ-ভাষাতেই কথা বলল তারা। এরপর মৌনতা ভঙ্গ করে মৎস্যগন্ধা প্রথমে বলল, 'এভাবেই কি চুপ করে থাকব আমরা?'

এস্তাদিও হেসে বলল, 'আমি তো তোমার সঙ্গে কথা বলতেই এলাম।'

মৎস্যগন্ধা মজা করে তাকে প্রশ্ন করল, 'আজ তুমি আমার জন্য কোনও উপহার আনোনি?'

মৎস্যগন্ধা তাকে ঠাট্টার ছলে প্রশ্নটা করলেও এ-প্রশ্নে মৃদু লজ্জাবোধ করল এস্তাদিও। ব্যাপারটা তার মাথায় আসেনি। আসলে সে খুব একটা অভ্যস্ত নয় এই ব্যাপারগুলোতে।

মৎস্যগন্ধা বলল, 'না, না, আমি মণি-মুক্তার কথা বলছি না। অন্তত একটা গোলাপ আনতে পারতে।'

এরপর সে বলল, 'জানো, একবার এক নাবিক আমাকে বসরা বন্দরের গোলাপ উপহার দিয়েছিল। কী সুন্দর গন্ধ তার! সে আমাকে গল্প করেছিল, বসরার গোলাপবাগগুলোতে সন্ধেবেলায় যখন একসঙ্গে গোলাপকুঁড়িগুলো

BanglaBook.org

ফুটে উঠতে শুরু করে তখন বহুদূর থেকে নাকি শোনা যায়, ভ্রমর-গুঞ্জনের মতো গোলাপের ডানা মেলার শব্দ!' কথাটা বলে মুহূর্তের জন্য থামল মৎস্যগন্ধা, তারপর চোখ বন্ধ করল। হয়তো মনে মনে সে কল্পনা করার চেষ্টা করল গোলাপকুঁড়ি ফুটে ওঠার ব্যাপারটা। জানলা দিয়ে আসা বিকেলের রক্তিম আলোতে বসরার গোলাপের মতই সুন্দর দেখাচ্ছে বন্দর সুন্দরীর মুখ। সে-মুখের দিকে তাকিয়ে এস্তাদিওর হঠাৎ মনে পড়ল, একটা জিনিস তো তার কাছে আছে। জিনিসটা ক্ষুদ্র হলেও খুব সুন্দর। ব্যাপারটা খেয়াল হতেই সে বলল, 'দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস উপহার দিচ্ছি।'—এই বলে সে সেই শোভাযাত্রা থেকে পাওয়া চন্দনকাঠের টুকরোটা পোশাক থেকে বের করে তুলে দিল মৎস্যগন্ধার হাতে।

জিনিসটা হাতে নিয়ে খুশিতে ভরে উঠল মৎস্যগন্ধার মুখ। সামান্য জিনিস হলেও সেটা উপহার বলে কথা। মূর্তিখোদিত কাঠের খণ্ডটা নেড়েচেড়ে দেখে মৎস্যগন্ধা বলল, 'এ তো সিংহলের জিনিস! বৌদ্ধ সিংহলি সাধিকরা গলায় পরে। এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে? সে দ্বীপে তুমি গেছিলে?'

এস্তাদিও বলল 'না, যাইনি। আজ সকালে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক শোভাযাত্রার মুখে পড়েছিলাম। সিংহলি বৌদ্ধ তারা। পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পথচারীদের তারা এই কাষ্ঠখণ্ড উপহার দিচ্ছিল। এখানকার কোনও এক মঠ থেকে প্রাচীন এক সন্ন্যাসীকে শোভাযাত্রা করে জাহাজঘাটায় নিয়ে গেল, তাঁকে নিয়ে সিংহলে পাড়ি দেবার জন্য।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মৎস্যগন্ধা পালঙ্ক ছেড়ে নেমে এগিয়ে গেল জানলার দিকে। ভালো করে দেখার চেষ্টা করতে লাগল নৌকা-জাহাজগুলোর ভিড়ে কোনও সিংহলি জাহাজের সোনালি মাস্তুল চোখে পড়ে কিনা। না, সে দেখতে পেল না সেই সোনালি মাস্তুল। ভিক্ষু নিশাদপাদকে নিয়ে তমালিকা বন্দর তারা অনেক আগেই ত্যাগ করে যাত্রা শুরু করেছে গভীর সমুদ্রের দিকে। এস্তাদিওর মনে হল, বন্দরের দিকে তাকিয়ে মৎস্যগন্ধা যেন অস্পষ্টভাবে একবার বলল, 'তিনি সত্যিই তবে চলে গেলেন! আমার আর কেউ রইল না।'

এস্তাদিওর দিকে পিছন ফিরে নদীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মৎস্যগন্ধা। হরিণির মতো চোখ বেয়ে জল নামতে শুরু করল। খালি তার মনে হতে লাগল, এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে তার কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই। সে কেন

BanglaBook.org

নিশাদপাদকে বলল না, তাকে তাঁর সঙ্গী করে সিংহলে নিয়ে যেতে? মন্দিরে তো দেবদাসী থাকে। সে নাহয় দেবদাসীর মতোই জীবন কাটাত সেই মন্দিরে। নিশাদপাদের বলা শেষ কথাগুলোও কানে বাজতে লাগল তার, তমালিকা বন্দর বড় নিষ্ঠুর। এ বন্দর যেমন অনেককে অনেক কিছু দিয়েছে তেমনই অনেকের জীবন কেড়ে নিয়েছে। এ বন্দর ছেড়ে চলে যাও তুমি...কিন্তু মৎস্যগন্ধা কোথায় যাবে? কার সঙ্গে?

মৎস্যগন্ধাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে এস্তাদিও প্রশ্ন করল, 'কী হল মৎস্যগন্ধা?'

মৎস্যগন্ধা কোনও জবাব দিল না। প্রচণ্ড একটা কষ্ট, যন্ত্রণা গলা থেকে কান্না হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার। সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে সেটাকে আটকাবার।

উত্তর না পেয়ে এস্তাদিও এবার অনুমান করল যে, কিছু একটা হয়েছে মৎস্যগন্ধার। একটু ইতস্তত করে এস্তাদিও পালঙ্ক থেকে নেমে মৎস্যগন্ধার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আলতো করে হাত ছোঁয়াল মৎস্যগন্ধার পিঠে। মৎসগন্ধা ফিরে দাঁড়াল এস্তাদিওর দিকে। জলে ভেসে যাচ্ছে তার চোখ। ঠোঁটগুলো তিরতির করে কাঁপছে।

BanglaBook.org

সামান্য একটা বুদ্ধমূর্তিকে কেন্দ্র করে কী ঘটনা ঘটল তা বুঝে উঠতে পারল না এস্তাদিও। এস্তাদিও আবারও তাকে প্রশ্ন করল, 'তোমার কী হয়েছে?'

মৎস্যগন্ধা এবার আর এতদিন ধরে যত্নে লালিত নিজের কাঠিন্যকে ধরে রাখতে পারল না। এস্তাদিওকে জড়িয়ে ধরে সে কেঁদে উঠল, 'তুমি কি আমাকে

তোমার সঙ্গী করতে পারো না নাবিক? আমাকে নিয়ে চলে যেতে পারো না কোনও দূর দেশে? যেখানে আমাকে কেউ চিনবে না। আমার যা আছে আমি তোমাকে সব দেব, সব দেব...

মৎস্যগন্ধার কথা শুনে প্রথমে চমকে উঠল এস্তাদিও। এ কীসের ডাক? কীসের ডাক শুনতে পাচ্ছে সে?

মৎস্যগন্ধা তাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, 'পারবে না? পারবে না তুমি আমাকে এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি দিতে? ভালোবাসা ছাড়া আমার কোনও কিছুর অভাব নেই। রূপ আছে, সম্পদ আছে। ভালোবাসা ছাড়া আর কোনও কিছু আমি চাই না তোমার কাছে। আমার যা আছে সব আমি তোমার হাতে তুলে দেব। তার বিনিময়ে তুমি আমাকে শুধু একটু ভালোবাসা দাও...

মৎস্যগন্ধার কান্না, সমর্পণের আকুতি যেন পাক খেতে লাগল বাতাসে। একসময় এস্তাদিওরও মনে হতে লাগল, এ নারী যেন যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করেছিল তার জন্য, আর সে-ও অপেক্ষা করেছিল এমনই কোনও নারীর জন্য। এস্তাদিওর মনের গভীরে যে সুতোগুলো নাবিক এস্তাদিও থেকে প্রেমিক এস্তাদিওকে আড়াল করে রেখেছিল সেই সুতোর আবরণ যেন একটার পর একটা করে ছিঁড়ে যেতে লাগল। খসে পড়তে লাগল নাবিক এস্তাদিওর আবরণ, যে-এস্তাদিও উত্তাল সমুদ্রে জাহাজ ভাসায় নতুন দেশের খোঁজে, যে-এস্তাদিওর ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে দুধর্ষ অভিযাত্রী নাবিক ভাস্কোর রক্ত। মৎস্যগন্ধার কান্না জাগিয়ে তুলল অন্য এক এস্তাদিওকে। প্রেমিক এস্তাদিওকে।

মৎস্যগন্ধা বলে চলেছে, 'বলো নাবিক, বলো? তুমি কি আমাকে নিয়ে যাবে সেই অজানা দেশে? যেখানে ঘর বাঁধব আমরা? আমার একমাত্র অপরাধ কি আমি বন্দরসুন্দরী? আমি গণিকা? তাতে তো আমার কোনও হাত ছিল না। সমুদ্রই আমাকে ভাসিয়ে এনে বন্দর সুন্দরী বানিয়েছে। আমার কি শুধু দেহই আছে? সমুদ্রের মতো গভীর কোনও মন কি নেই আমার?'

এস্তাদিও এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। জোয়ারের সময় জাহাজ যেমন অনেক সময় নোঙর ছিঁড়ে সমুদ্রে ভেসে যায় ঠিক তেমনই এস্তাদিও ছিঁড়ে ফেলল তার অন্য সব ভাবনা। সমুদ্রের জলোচ্ছাসের মতোই সে প্রচণ্ড আবেগে মৎস্যগন্ধাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, নিয়ে যাব, নিয়ে যাব। তোমাকেই তো আমি এতদিন খুঁজছিলাম। তোমার জন্যই তো আমি জাহাজ ভাসিয়েছিলাম এই অজানা দেশে।'

BanglaBook.org

মৎস্যগন্ধা বলে উঠল, 'সত্যি! নাবিক তুমি সত্যি বলছ?'

এস্তাদিও বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি।'

প্রচণ্ড আবেগে ভালোবাসায় এস্তাদিওকে জড়িয়ে ধরে তার জামার ফাঁকে লোমশ বুকে মুখ ঘসতে লাগল মৎস্যগন্ধা। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্য এক অনুভূতি শুরু হল এস্তাদিওর শরীরে। যুগ যুগ ধরে এস্তাদিওর শরীরে ঘুমিয়ে থাকা আদিম অনুভূতিও জেগে উঠতে শুরু করল। সে অনুভূতি মিশে থাকে প্রত্যেক নর-নারীর রক্তে, প্রত্যেক প্রাণীর রক্তে। এস্তাদিওর মনে হল মৎস্যগন্ধার দেহেও যেন জেগে উঠেছে সেই আদিম সত্তা। নইলে সে ওভাবে একটানা এস্তাদিওর বুকে মুখ ঘসে চলেছে কেন? আলিঙ্গনরত মৎস্যগন্ধার নখগুলো যেন প্রচণ্ড উত্তেজনায় এস্তাদিওর পিঠে বসে যাচ্ছে!

এস্তাদিও নিজের অজান্তেই যেন মৎস্যগন্ধাকে টেনে এনে পালঙ্কে শুইয়ে দিল। বাধা দিল না মৎস্যগন্ধা। বরং এস্তাদিওর মুখটা আরও চেপে ধরল নিজের মুখের ওপর।

বাইরে সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। কোনও এক জাহাজ যেন বন্দর ছেড়ে সমুদ্রে যাত্রা শুরুর আগে ঘন ঘন শঙ্খ বাজাচ্ছে। কিন্তু বন্দর ছাড়ার, সমুদ্রের দিকে ভেসে পড়ার সেই আহ্বান আর যেন কানে পৌঁছোল না এস্তাদিওর। তার ঠোঁটে তখন মৎস্যগন্ধার গোলাপ-ঠোঁটের উষ্ণ স্পর্শ। নাবিকের কাছে সমুদ্রের আহ্বানের থেকেও অনেক বেশি গাঢ় সেই আদিম আহ্বান। ধীরে-ধীরে শরীর থেকে পোশাক খসিয়ে চূড়ান্ত মিলনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করল মৎস্যগন্ধা। না, এ কোনও গণিকার তার খদ্দেরের কাছে নিজেকে সমর্পণ নয়, আর তাকে সমর্পণ বলেও না। এতদিন মৎস্যগন্ধা যেসব পুরুষের সঙ্গে শুয়েছে সেসব ছিল নিছকই শরীরী মিলন, কোনও আবেগ বা ভালোবাসার স্পর্শ ছিল না তাতে। এই প্রথম নিজেকে কোনও পুরুষের কাছে সত্যি সমর্পণ করল মৎস্যগন্ধা। পয়সার বিনিময়ে নয়, ভালোবাসার বিনিময়ে। শরীর ও মনের এক আশ্চর্য তৃপ্তি অনুভব করতে পারছে মৎস্যগন্ধা। মৎস্যগন্ধার শরীর উন্মোচিত হল এস্তাদিওর সামনে। সে শরীরে কোনও ক্লেদ নেই, পাপ নেই। মৎস্যগন্ধার শরীরের প্রতিটা রোমকূপ, প্রতিটা রন্ধ্র যেন এস্তাদিওর স্পর্শ পাবার জন্য উন্মুখ। নাবিকের পোশাক খসিয়ে ফেলল এস্তাদিও। তার ঠোঁট মৎস্যগন্ধার ঠোঁট ছুঁয়ে নামতে শুরু করল তার গলায়, বুকের মাঝে, দু-পাশে পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত দুই স্তনে, তারপর আরও নীচে

BanglaBook.org

গভীর নাভিকূপে। সেখানে কিছুক্ষণ থেমে তারপর আরও নীচে।

সূর্য ডুবে গেল, অন্ধকার নামল। তারপর চাঁদও উঠল এক সময়। খোলা জানলা দিয়ে সেই চাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়ল পালঙ্কে, আলিঙ্গনরত এস্তাদিও আর মৎস্যগন্ধার নগ্ন শরীরে। যেন মিথুনরত পৃথিবীর প্রথম নারী-পুরুষ তারা।

১৩

প্রায় মাঝরাত, ক্ষয়াটে চাঁদের আলোতে সান্টা মারিয়ার ডেকে দাঁড়িয়েছিলেন ক্যাপ্টেন পেরো। তমালিকা বন্দরের আকাশপ্রদীপের আলো বহুক্ষণ আগে নিভে গেছে। শুধু এক জায়গাতেই উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে বন্দরের দিকে। সে জায়গা হল মৎস্যগন্ধার গণিকালয়। সান্টা মারিয়াকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজ-নৌকাগুলোও ঘুমিয়ে পড়েছে। জাহাজের খোলের গায়ে জলের ধাক্কার মৃদু শব্দ ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই। চিন্তামগ্ন হয়ে ক্যাপ্টেন তাকিয়েছিলেন ঘুমন্ত বন্দরের জেগে থাকা একমাত্র আলোকিত অংশের দিকে। সান্টা মারিয়ার নাবিকরা প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিজের কেবিন থেকে ক্যাপ্টেনকে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জাহাজের চিকিৎসক ফ্রান্সিস কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়াল। আলো অস্পষ্ট হলেও ক্যাপ্টেনের মুখে যে স্পষ্ট চিন্তার ভাব ফুটে উঠেছে তা বুঝতে অসুবিধা হল না ফ্রান্সিসের। সে ক্যাপ্টেনকে প্রশ্ন করল, 'নতুন কিছু খবর হল?'

ক্যাপ্টেন হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'না, আজও তিনি এলেন না। আমি তো নিজে আজও সকালে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার। অন্যদিনের মতো তিনি কথা দিয়েছিলেন, আজ তিনি জাহাজে আসবেন, কথা বলবেন নাবিকদের সঙ্গে; কিন্তু এলেন না। এদিকে নাবিকদের মধ্যেও চাপা অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। মৎস্যগন্ধার বেশ্যালয়ে গিয়ে তাদের পকেট খালি হয়ে গেছে ক'দিনের মধ্যেই। তাদের হাতে কোনও কাজও নেই। জাহাজে একঘেয়ে জীবন কাটাচ্ছে তারা। নাবিকরা বারবার জানতে চাইছে কবে জাহাজ আবার বন্দর ত্যাগ করে সমুদ্রে ভাসবে?'

ফ্রান্সিস জানতে চাইল, 'ঠিক কতদিন আমরা এ বন্দরে নোঙর করে

BanglaBook.org

আছি বলুন তো?'

পেরো হিসাব করে জবাব দিলেন, 'প্রায় দুমাস। আটান্ন দিন। যেমন অনেক সময় সমুদ্রে বাতাস আর স্রোতের অভাবে জাহাজ দিনের পর দিন একই জায়গায় আটকে থাকে, এ অঞ্চলে লোকেরা যাকে "কাফিন দরিয়া" বলে, এক-এক সময়ে মনে হয় আমরা সেই "কাফিন দরিয়া"-তে আটকে পড়েছি।'

ফ্রান্সিস বলল, 'হঠাৎ এস্তাদিওর মনে এমন নারী আসক্তি হল কীভাবে কে জানে! এতদিন তো জেনে এসেছিলাম, তিনি এ ব্যাপারে একদম বিপরীত চরিত্রের লোক। যে কারণে অনেক সময় নাবিকদের তাঁকে নিয়ে আড়ালে হাসাহাসিও করতে দেখেছি। হঠাৎ তিনি এমন হয়ে গেলেন কেন?'

বন্দরের যেখানে আলো জ্বলছে সেদিকে চোখ রেখেই ক্যাপ্টেন বললেন, 'পেড্রো বলছিল প্রতিদিন বিকেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সোজা সেই গণিকালয়ে চলে যান তিনি। কোনও দিন মধ্যরাতে ফিরে আসেন আবার কোনওদিন ফিরতে তাঁর ভোর হয়ে যায়। এস্তাদিওকে মুখে কিছু বলতে না পারলেও পেড্রোও বেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছে আমাদেরই মতো। তার অবশ্য অন্য একটা ধারণা হয়েছে ব্যাপারটা নিয়ে...

'কী ধারণা?' জানতে চাইল ফ্রান্সিস।

পেরো বললেন, 'ভারতীয়রা অনেক তুকতাক জানে। পেড্রোর ধারণা, মৎস্যগন্ধা নামের ওই বেশ্যা তেমনই কিছু একটা করেছে তাকে। নইলে এ ঘটনা হবার নয়। ক'দিনের মধ্যে একটা মানুষ এমন আমূল বদলে যেতে পারে না। বন্দর এলাকার লোকজনও নাকি এই একই কথা বলছে।'

ফ্রান্সিস বলল, 'তাহলে এ অবস্থায় আমাদের কী কর্তব্য বলে আপনার মনে হয়?'

ক্যাপ্টেন বলল, 'চাপটা আমার ওপরই সব থেকে বেশি। কারণ নাবিকরা আমাকেই এসে ধরছে। আবার এস্তাদিও কিছু বলছেন না। ভাবছি কাল আমি তাঁর কাছে গিয়ে সরাসরি জানতে চাইব ব্যাপারটা। প্রয়োজনে আপনিও আমার সঙ্গী হতে পারেন।'

ফ্রান্সিস বলল, 'আমার কোনও আপত্তি নেই। এবার এস্তাদিও কী চাইছেন তা সরাসরি জেনে নেওয়াই ভালো।'

কথা বলছিলেন তাঁরা। হঠাৎ তাঁদের নজর পড়ল অন্ধকার নদীবক্ষে একটা লণ্ঠনের আলো ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে। মাঝারি আকারের একটা নৌকা।

BanglaBook.org

ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস প্রথমে সে নৌকাটাকে নদীতে ভ্রাম্যমান বেশ্যাদের নৌকা ভেবেছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের সে ভুল ভেঙে গেল। আশেপাশে নোঙর করা জাহাজগুলোর ফাঁক গলে নৌকাটা এসে দাঁড়াল সান্টা মারিয়ার গায়ে। অবাক হয়ে পেরোরা ডেকের প্রান্ত থেকে ঝুঁকে পড়ে নৌকাটার দিকে তাকালেন। জনা পাঁচেক লোক সে নৌকাতে। তাদের মধ্যে একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে লণ্ঠনটা ওপরে তুলে ধরল। তারপর পেরোদের দেখতে পেয়ে পর্তুগিজ ভাষায় বলল, 'যিশুর জয় হোক, মাতা মেরির জয় হোক। আমি বণিক এস্তাদিওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। জরুরি দরকার আছে।'

পেরো জানতে চাইলেন, 'আপনি কে?'

লোকটা জবাব দিল, 'আমি একজন পর্তুগিজ বণিক। মোহনার দিকে আমার একটা ছোট বাণিজ্যকুঠি আছে।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'আপনি ওপরে উঠে আসুন।'

দড়ির মই বেয়ে ওপরে উঠে এল লোকটা। মাঝবয়সি এক পর্তুগিজ। চেহারাতে বণিকসুলভ আভিজাত্যের ছাপ আছে। লোকটা বলল, 'আমি দিয়াগো। বাণিজ্যকুঠির মালিক। জরুরি প্রয়োজনে এস্তাদিওর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছি। তিনি কোথায়?'

পেরো বললেন, 'আমি এ জাহাজের ক্যাপ্টেন পেরো। এস্তাদিও তো জাহাজে থাকেননা, তিনি বন্দরে থাকেন।

দিয়াগো বললেন, 'আপনাদের বন্দরের কাজ শেষ হয়নি এখনও?'

পেরো এ প্রশ্নের জবাবে কী উত্তর দেবেন তা বুঝতে পারলেন না। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'আপনি কোনও সংবাদ দিলে তা আমি কাল তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারি। নচেৎ আপনি জাহাজে রাত্রিবাস করুন। কাল ভোরে আমি তাঁর কাছে নিয়ে যাব।'

পর্তুগিজ নাবিক বললেন, 'না, রাত্রিবাস সম্ভব নয়। একটা জরুরি বার্তা আছে। কাল সকালেই সেটা তাঁর কাছে পৌঁছে দেবেন।'

এরপর তিনি একটু থেমে বললেন,'আপনারা জানেন কিনা জানি না, অ্যাডমিরাল ভাস্কো প্রায় একমাস হতে চলল গোয়ায় পদার্পণ করেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি এখনও ভাইসরয়ের দায়িত্ব গ্রহণ না করলেও গোয়ার শাসনভার তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। শুধু গোয়া নয়, এদেশে যত

BanglaBook.org

পর্তুগিজ ঘাঁটি আছে, যত বাণিজ্যকুঠি আছে তার সর্বময় কর্তা করে তাঁকে এদেশে পাঠিয়েছেন রাজা। যে-কোনও পর্তুগিজ বা পর্তুগিজপোতও রাজার সনদ বলে তাঁর নিয়ন্ত্রাণাধীন। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছিলাম গোয়াতে। সেখান থেকেই ফিরে সোজা এখানে এসেছি। কারণ, হবু ভাইসরয় এস্তাদিওকে দ্রুত গোয়াতে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। ক্যাপ্টেন কোহেলোর নেতৃত্বে তিনি একটা ছোট দ্রুতগামী রণতরী এদিকে পাঠিয়েছেন। সে জাহাজেই আমিও ফিরেছি। মোহনা ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে সমুদ্রে অপেক্ষা করছে কোহেলোর জাহাজ। এস্তাদিও যেন যথাসম্ভব দ্রুত কোহেলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি এস্তাদিওকে নিয়ে গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। আর তাঁদের পিছন পিছন আপনারাও রওনা হবেন সেদিকেই।'—একটানা কথাগুলো বলে থামলেন বণিক।

তার কথাগুলো শুনে মৃদু চোখাচোখি হল পেরো আর ফ্রান্সিসের মধ্যে। পেরো আগন্তুককে বললেন, 'কাল ভোরেই আমরা খবরটা পৌঁছে দেব এস্তাদিওর কাছে।'

দিয়াগো বললেন, 'হ্যাঁ, দেবেন। মনে রাখবেন এটা স্বয়ং অ্যাডমিরালের নির্দেশ।'

পেরো বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন তবে গোয়ার অবস্থা কেমন তা একটু বলবেন?'

বণিককুঠির মালিক বললেন, 'শেষ কয়েকবছর পর্তুগিজদের মধ্যে বেশ উচ্ছৃলঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল। মেয়ে আর জুয়া নিয়ে মেতেছিল তারা। কিছু সরকারি সম্পত্তিও বেহাত হয়েছে সে কারণে। অ্যাডমিরাল অবশ্য এসে কড়া হাতে সেসব দমন করতে শুরু করেছেন। শৃঙ্খলা আবার ফিরে আসছে। চিন্তার কিছু নেই। আর ক'দিনের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

একথা বলার পর দিয়াগো বললেন, 'এখন আমাকে যেতে হবে। আপনাদের কাছে যে খবরটা পৌঁছে দিয়েছি সে খবরটা আবার ক্যাপ্টেন কোহেলোর কাছে পৌঁছে দিতে হবে।'

ক্যাপ্টেন পেরোদের থেকে বিদায় নিয়ে এরপর জাহাজ থেকে নেমে গেলেন দিয়াগো। তাঁর নৌকার আলো মিলিয়ে গেল মোহনার দিকে।

তিনি চলে যাবার পর ফ্রান্সিস হেসে বলল, 'এবার সমস্যা কাটল বলে মনে হয়।'

BanglaBook.org

পেরো বললেন, 'হ্যাঁ, কাল সকালে খবরটা পৌঁছে দিতে হবে তাঁর কাছে। ঈশ্বর মঙ্গলময়।'

পরদিন ভোরে এস্তাদিওর যখন ঘুম ভাঙল তার অনেক আগেই সূর্য উঠে গেছে। গতকাল মাঝরাতে ঘরে ফিরেছিল সে। ঘুম ভাঙার পর প্রতিদিনের মতোই তার মনে পড়ল মৎস্যগন্ধার কথা। এস্তাদিওর শয়নে স্বপনে এখন শুধু জেগে থাকে মৎস্যগন্ধা। এক অপূর্ব প্রেমের মায়াজালে সে আবদ্ধ হয়ে গেছে মৎস্যগন্ধার সঙ্গে। আর মৎস্যগন্ধাও। তারা দুজনেই যেন একটাই সত্তা। মৎস্যগন্ধার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এস্তাদিওর মনে হল, গতরাতে তাকে বিদায় দেবার সময় মৎস্যগন্ধা তাকে বলেছে আজ সে একটা অত্যন্ত জরুরি আর গোপনীয় কথা বলবে এস্তাদিওকে।

কী সেই কথা? বিছানায় শুয়ে ব্যাপারটা অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগল এস্তাদিও। কিছু সময়ের মধ্যেই ঘরে ঢুকল পেড্রো। সে বলল, 'ক্যাপ্টেন পেরো আর চিকিৎসক ফ্রান্সিস আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

কথাটা শুনে এস্তাদিও বিছানায় উঠে বসল। তার মনে পড়ল গতকাল তার জাহাজে যাওয়ার কথা থাকলেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আসলে দুপুরের পর খাওয়া সেরে পথে নামলেই এস্তাদিও সব কিছু ভুলে যায় । তার মনে হয় মৎস্যগন্ধা নিশ্চই অপেক্ষা করে বসে আছে তার জন্য। আর এ-কথাটা মনে হতেই প্রতিদিন এস্তাদিও রওনা হয় মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ের দিকে। ব্যাপারটা অবশ্য সত্যিও। মৎস্যগন্ধাও প্রতীক্ষা করে থাকে তার জন্য। পেড্রোর কথা শুনে এস্তাদিও বলল, 'ওদের ভিতরে নিয়ে আয়।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে প্রবেশ করলেন ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস। টুপি খুলে তারা প্রথমে প্রভাতি শুভেচ্ছা জানাল এস্তাদিওকে। এস্তাদিও তাদের আসন গ্রহণ করতে বলল।

তারা দুজন বসার পর এস্তাদিও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলল, 'গতকাল যাব ভেবেছিলাম ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আটকে গেলাম। আজ অথবা কাল নিশ্চই যাব।'

পেরো কথাটা শুনে বললেন, 'আজ আমরা একটা জরুরি খবর নিয়ে এসেছি। হয়তো আজই আমাদের তমালিকা বন্দর ত্যাগ করতে হবে। তবে সমস্যা কিছু হবে না। নাবিকরা সব প্রস্তুতই আছে। শুধু নোঙর তুলে ফেললেই হল।'

BanglaBook.org

কথাটা শুনে এস্তাদিও বিস্মিত ভাবে জানতে চাইল, 'কী এমন খবর, যার জন্য আজই এ-বন্দর ত্যাগ করতে হবে?'

প্রশ্ন শুনে ক্যাপ্টেন পেরো গতকাল রাতে বণিক দিয়াগোর জাহাজে আসার কথা ও তাঁর বলা-কথা সবিস্তারে ব্যক্ত করলেন তাকে।

কথাগুলো শুনে চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগল এস্তাদিও।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ক্যাপ্টেন ভাবলেন এবার এস্তাদিও নিশ্চই বলবেন যে, 'ঠিক আছে, তবে জাহাজ ছাড়ার প্রস্তুতি শুরু করুন।'

তাই পেরো এরপর বললেন, 'দুজন নাবিককে তবে ফিরে গিয়ে আপনার এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারা আপনার মালপত্র জাহাজে নিয়ে যাবে।'

কিন্তু পেরোর কথা শুনে এস্তাদিও তাদের বেশ অবাক করে দিয়ে বলল, 'এখনই তাদের পাঠাবার দরকার নেই, আমি ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু ভেবে নিয়ে আপনাদের জানাচ্ছি।'

স্বয়ং অ্যাডমিরাল নির্দেশ পাঠিয়েছেন তবু তা নিয়ে ভাবিবেন বলছেন এস্তাদিও! এরপর তাকে আর কী বলবেন তা বুঝে পেলেন না ক্যাপ্টেন পেরো। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর তিনি বললেন, 'তাহলে আমরা এখন জাহাজে ফিরে আপনার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছি।'

কথাগুলো বলে ক্যাপ্টেন এস্তাদিওকে বিদায় জানিয়ে ফ্রান্সিসকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ফ্রান্সিস তাকে প্রশ্ন করলে, 'কী বুঝলেন?'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'অ্যাডমিরালের কথা শুনেও এস্তাদিও বললেন তিনি ভাববেন! ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না! আমি জাহাজের ক্যাপ্টেন। শেষ পর্যন্ত না আমাকেও ভবিষ্যতে শাস্তি পেতে হয় অ্যাডমিরালের কথা অমান্য করার জন্য। এমনকী আপনাদেরও অর্থাৎ অন্য নাবিকদেরও শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে।'

কথাটা শুনে ফ্রান্সিস চিন্তিতভাবে বলল, 'তেমন হলে আমাদের ক্যাপ্টেন কোহেলোর কাছে গিয়ে সবকিছু জানিয়ে আসা উচিত।'

এ কথা বলার পর ফ্রান্সিস বলল, 'আচ্ছা এমন নয়তো যে, ওই বারবনিতার জন্য নয়, অন্য কোনও কারণে তিনি রয়ে যাচ্ছেন এখানে? প্রতিদিন রাতে তিনি অন্যও কোনও জায়গায় যান? কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারও থাকতে পারে তার মধ্যে?'

পেড্রো দাঁড়িয়েছিল বাড়ির দরজাতে। এস্তাদিওর সঙ্গে ক্যাপ্টেনদের

BanglaBook.org

কথোপকথন সে-ও শুনেছে। এস্তাদিওকে মুখে কোনওদিন কিছু না বললেও ভিতরে ভিতরে দেশে ফেরার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে সে। ফ্রান্সিসের কথা শুনে ক্যাপ্টেন পেরো ইশারায় তাকে কাছে ডাকলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'তুমি নিশ্চিত তো যে, প্রতিরাতে এস্তাদিও ওই গণিকালয়েই যান? অন্য কোথাও যান না?'

পেড্রো জবাব দিল, 'আমি তো জানি তিনি ওই মৎস্যগন্ধার কাছেই যান। তবে সে জায়গা হয়ে অন্য কোথাও যান কিনা বলতে পারব না। আমি তো বাড়িতেই থাকি।'

জবাব শুনে ক্যাপ্টেন পেরো একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'দেখো পেড্রো, জাহাজ ছাড়তে অনেক দেরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। ঠিক সময়ে যাত্রা শুরু করলে এতদিনে হয়তো গোয়া হয়ে পর্তুগালের দিকে যাত্রা শুরু করতাম আমরা। আমি জাহাজের ক্যাপ্টেন। মনে রেখো, আমি তোমাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। আমি আপত্তি করলে এস্তাদিও তোমাকে জাহাজে তুলতে পারবেন না। কারণ সান্টা মারিয়ার নাবিকতালিকাতে তোমার নাম নেই। তোমাকে নিয়ে যেতে আমি বাধ্য নই। আর তেমন হলে তোমাকে বাকি জীবনটা এই মরা বন্দরে আগের মতোই ভিখারি হয়ে কাটাতে হবে।'

ক্যাপ্টেনের কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে পেড্রো ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, 'না, না, আমি যথাসম্ভব দ্রুত দেশে ফিরতে চাই। তার জন্য আমাকে কী করতে হবে বলুন?'

ক্যাপ্টেন তার পোশাকের ভিতর থেকে দশটা রৌপ্যমুদ্রা বের করে পেড্রোর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এমন হতে পারে যে তিনি গণিকালয়ে যাবেন বলে বাড়ি ছাড়েন ঠিকই, তবে তারপর সেখান থেকে অন্য কোথাও যান। আজ থেকে বিকেলে বা সন্ধেয় তিনি ঘর ছাড়লেই তুমি গোপনে অনুসরণ করবে তাকে যতক্ষণ না তিনি ঘরে ফিরে আসেন, ততক্ষণ পর্যন্ত। আর তেমন কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আমাদের জানাবে। আর এ কথা যদি এস্তাদিওর কাছে কোনওভাবে ফাঁস হয় তবে তোমার দেশে ফেরার পথ চিরজীবনের জন্য বন্ধ, এটুকু জেনে রেখো। কথাগুলো বলে ক্যাপ্টেন পেরো তার সঙ্গীকে নিয়ে পা বাড়ালেন জাহাজঘাটার দিকে।

মুদ্রাগুলো পকেটে ভরে নিল পেড্রো।

ক্যাপ্টেন পেরো ঘর ছেড়ে যাবার পর এস্তাদিও মনে মনে ভাবল, স্বয়ং

BanglaBook.org

ভাস্কো তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এ-ডাক যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এভাবে সে কী করে মৎস্যগন্ধাকে ফেলে চলে যাবে?

না, এখন আর তা সম্ভব নয়। বেশ কিছুক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার পর এস্তাদিও সিদ্ধান্ত নিল, বিষয়টা নিয়ে মৎস্যগন্ধার সঙ্গে আলোচনা করে তারপর যা করার করবে সে। বেলা বেড়ে চলল। বিছানাতে আধশোয়া অবস্থায় মৎস্যগন্ধার কথা ভাবতে লাগল এস্তাদিও। মৎস্যগন্ধা আজ কী বলবে তাকে?

সূর্য ঢলতে শুরু করেছে পশ্চিমে। বিকেল হয়ে আসছে। জানলায় দাঁড়িয়ে বাড়ির পিছনে গলিপথের দিকে তাকিয়ে এস্তাদিওর প্রতীক্ষা করছিল মৎস্যগন্ধা। ও- পথ ধরেই এস্তাদিও রোজ পিছনের দরজা দিয়ে এবাড়িতে প্রবেশ করে। তাকে আজকাল আর কেউ বাধা দেয় না। তেমনই নির্দেশ দেওয়া আছে মৎস্যগন্ধার। পিছনের সিঁড়ি বেয়ে সে সোজা চলে আসে দ্বিতলে এই ঘরে। এঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায় তারপর। রাতে খদ্দেরদের ভিড় আজকাল শ্যামা আর কিছু বয়স্থা গণিকারাই সামলায়। আর তাতে তাদের বাড়তি রোজগারও হয় বেশ কিছু।

মৎস্যগন্ধা কিছু সময়ের মধ্যেই দেখতে পেল তার প্রত্যাশা মতই এস্তাদিও বাড়ির দিকে আসছে। যে গোপন কথাটা এতদিন কাউকে মৎস্যগন্ধা জানায়নি সে-কথাটা আজ এস্তাদিওকে জানাবে বলে ভেবে রেখেছে মৎস্যগন্ধা। কিন্তু এস্তাদিওকে দেখতে পেয়েই মৎস্যগন্ধা ভাবল, আগে একটু মজা করে নেওয়া যাক তার সঙ্গে, তারপর সেই গোপন ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

এস্তাদিও দেখতে পায়নি তাকে। সঙ্গে সঙ্গে জানলা থেকে সরে এল মৎস্যগন্ধা। রানি পালঙ্কে শুয়ে আছে। ঘুমাচ্ছে সে। অন্যদিন এস্তাদিওকে ওপর থেকে আসতে দেখলেই রানিকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দেয় মৎস্যগন্ধা। আজ মৎস্যগন্ধা সে-কাজ না করে নিজে যে পশমের চাদরটা গায়ে দিয়ে ঘুমায় সেটা দিয়ে ঢেকে দিল রানির শরীর। রানিকে আপাদমস্তক ঢেকে দেবার পর ঘরের জানলার পাল্লাগুলোও সামান্য একটু ফাঁক রেখে বন্ধ করে দিল যাতে বেশি আলো ঘরে প্রবেশ না করতে পারে, সেজন্য। তারপর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল এস্তাদিওর জন্য।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই আধো অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করল এস্তাদিও। বিছানার মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে একজন। মৎস্যগন্ধার পালঙ্কে সে ছাড়া আর কে ঘুমাবে? এস্তাদিও মাথা থেকে টুপি আর কোমর থেকে তলোয়ারটা

BanglaBook.org

খুলে সে জিনিসদুটো ঘরের এক জায়গাতে রেখে পালঙ্কের দিকে এগোল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপটে ধরল রানিকে। আকস্মিক এ ঘটনায় রানি ভয় পেয়ে খাট ছেড়ে লাফিয়ে উঠল প্রচণ্ড চিৎকার করে। এস্তাদিওও ঘাবড়ে গিয়ে ছিটকে সরে এল তার কাছ থেকে। ঠকে গেছে এস্তাদিও! মৎস্যগন্ধা দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে খিলখিল করে হাসতে লাগল এস্তাদিওর বোকা বনে যাওয়া মুখ দেখে। রানি খোলা দরজা দিয়ে একলাফে বাইরে বেরিয়ে গেল। বেচারাও কম ঘাবড়ায়নি!

বেশ কিছুক্ষণ পর হাসি থামল মৎস্যগন্ধার। এস্তাদিওরও চমক ভাঙল। সে বুঝতে পারল পুরো ব্যাপারটাই আসলে মৎস্যগন্ধার কারসাজি ছিল।

মৎস্যগন্ধা দোরের খিল দিতে দিতে বলল, 'তুমি শেষে রানির সঙ্গে শুতে যাচ্ছিলে! তবে প্রেমিকা হিসাবে সে-ও মন্দ হবে না। তার-ও তো শরীরের চাহিদা আছে। জানো, একবার আমি অনেক চেষ্টা চালিয়েছিলাম রানির একটা পুরুষসঙ্গী খোঁজার জন্য। কিন্তু পেলাম না।'

এস্তাদিও বলল, 'একী বলছ! শেষে রানির সঙ্গে মিলন? মানুষ কি ইতর প্রাণীর সঙ্গে মিলিত হয়?'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'রাগ কোরো না। আমি মজা করে বললাম। তবে একটা কথা বলি তোমাকে। মানুষ কিন্তু ইতর প্রাণীর সঙ্গেও মিলিত হয়।'

এস্তাদিও জানতে চাইল, 'কেমন ব্যাপারটা?'

মৎস্যগন্ধা, এস্তাদিওর গলা জড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি। বেনারস থেকে আসা যে মেয়েগুলোকে আমি কিনেছি তার মধ্যে হুরী নামের একটা মেয়ে আছে। সুলতানের হারেমের মেয়ে। সে অনেক গল্প জানে। সে আমাকে বলছিল যে এ-দেশের এক রাজপুরুষ নাকি প্রাচীনকাল থেকেই ঘোটকীর সঙ্গে সঙ্গম করে। ঘোটকী নাকি কামের প্রতীক। কিন্তু সে সহজে তৃপ্ত হয় না। তৃপ্ত হলে ঘোটকী যে শব্দ করে তাকে বলে হ্রেষাকাম। যে-পুরুষ ঘোটকীকে তৃপ্ত করতে পারে সে একসঙ্গে দশজন নারীকে তৃপ্ত করতে পারে। যৌন ক্ষমতা ধরে রাখার জন্যই নাকি ঘোটকীর সঙ্গে সঙ্গম করার প্রাচীন রীতি এদেশে। মধ্য ভারতে, 'খর্জুরবাহক' নামে এক জায়গাতে নাকি অতিপ্রাচীন বেশ কিছু মন্দির আছে। তার দেওয়ালগাত্রেও বেশ কিছু যৌন ভাস্কর্য খোদিত আছে। সেখানে নাকি ঘোটকীর সঙ্গে মানুষের সঙ্গমদৃশ্য খোদিত আছে!'

এস্তাদিও বেশ অবাক হয়ে গেল এ ঘটনা শুনে। বহুদূরের এই অচেনা

BanglaBook.org

পৃথিবী। পাহাড় থেকে সমুদ্র, ধূসর মরু অঞ্চল থেকে গভীর অরণ্যময় বিশাল বিচিত্র পরিধির এই দেশ। এ-দেশ সম্বন্ধে এস্তাদিও আর কতটুকুই বা জানে! সে তো জানে শুধু এই ক্ষয়িষ্ণু তমালিকা বন্দরকে।

এস্তাদিওর মনে হল, আগে জরুরি কথাগুলো সেরে নেওয়া ভালো। নইলে মৎস্যগন্ধার বাহুডোরে আবদ্ধ হয়ে হয়তো সে ভুলেই যাবে কথাটা। তাই সে বলল, 'তোমাকে একটা জরুরি ব্যাপার জানাবার আছে।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'আমারও তো আছে। বেশ তুমি আগে বলো, তারপর আমার কথা শুনো।'

একটু চুপ করে থেকে এস্তাদিও বলতে শুরু করল, 'তুমি হয়তো পর্তুগিজ দুঃসাহসী নাবিক ভাস্কো ডা গামার নাম শুনে থাকবে। এই তাম্রলিপ্ত বন্দরে তিনি কোনওদিন না এলেও এদেশের কালিকট বন্দরে তিনি এর আগে দু-দুবার এসেছিলেন। শেষ এসেছিলেন একুশ বছর আগে। সম্পর্কে তিনি আমারও আত্মীয় হন। এদেশে যেখানে যত পর্তুগিজ বসতি আছে, বাণিজ্যকুঠি আছে তার কোনও কিছুই থাকত না যদি-না তিনি এদেশ আমাদের চেনাতেন। আমি যখন এ দেশে পাড়ি দিলাম তখন তিনি আমাকে রাজকোষ থেকে অর্থ সাহায্যেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বলতে গেলে তাঁর নির্দেশেই অন্য কোনও বন্দরে না গিয়ে এই তমালিকা বন্দরে আসি। গোয়া বলে এদেশে সমুদ্র তীরবর্তী একটা অঞ্চল আছে। সে জায়গা পর্তুগিজদের দখলে। গোয়ার শাসক অর্থাৎ ভাইসরয় হিসাবে একুশ বছর পর তিনি আবার এদেশে ফিরে এসেছেন। শুধু তাই নয়, পর্তুগিজদের দন্ডমুন্ডের কর্তা হিসাবেই আমাদের দেশের রাজা তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন। এদেশে যত পর্তুগিজ আছে তাদের পুরস্কার, তিরস্কার এমনকী মৃত্যুদণ্ড দেবার ক্ষমতাও তাঁকে ন্যস্ত করা হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে দেশে ভাস্কোই আমাদের রাজা। আমরা সবাই তার নিয়ন্ত্রাণাধীন। এখানকার কাজ মিটিয়ে গোয়াতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার কথা ছিল আমার। কিন্তু আমি যাইনি। তিনি একটা জাহাজ পাঠিয়েছেন এদিকে। নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন যথাসম্ভব দ্রুত সে-জাহাজে গোয়ার দিকে রওনা হই।'

এ পর্যন্ত শোনার পর মৎস্যগন্ধা ব্যগ্রভাবে জানতে চাইল, 'সেখানে যাবার পর আবার কবে ফিরে আসতে পারবে তুমি?'

এস্তাদিও চিন্তিতভাবে বলল, 'সেখানে যাবার পর আমাকে ভাস্কোর নির্দেশ

BanglaBook.org

মানতে হবে। হয়তো তিনি আমাকে সেখানেই রেখে দিলেন বা অন্য কোনও নতুন জায়গাতে পাঠিয়ে দিলেন কোনও দায়িত্ব দিয়ে। আবার এমনও হতে পারে যে তিনি আমাকে আবার দেশে পাঠিয়ে দিলেন।'

কথাটা শুনেই বিবর্ণ হয়ে গেল মৎস্যগন্ধার মুখ। এস্তাদিওর গলা আঁকড়ে ধরে কাতর কণ্ঠে সে বলল, 'তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না এস্তাদিও। দোহাই তোমার।'

জলের ধারা নামতে লাগল তার চোখ বেয়ে। এস্তাদিও এবার তাকে আবেগে জড়িয়ে ধরল। তারপর বলল, 'না, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আমার জাহাজকে আমি ফিরে যেতে বলব। জানি, তার জন্য দেশে ফেরার পথ চির জীবনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। বা ফিরলেও অ্যাডমিরালের আদেশ অমান্য করার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে ফাঁসি অথবা কারাবাস। কিন্তু সমস্যা হল আমি এই তমালিকা বন্দরেই বা আজীবন থাকব কীভাবে? এখানকার লোকেরা আমাকে সন্দেহ করতে পারে, থাকতে নাও দিতে পারে ভবিষ্যতে।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'আমিও আর এখানে থাকতে চাই না। এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে চাই। নাবিক তুমি তো আমাকে বলেছিলে যে আমাকে তুমি নতুন দেশে নিয়ে যাবে?'

এস্তাদিও মৎস্যগন্ধার কেশরাশিতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'কিন্তু তার জন্য তো টাকার দরকার। ছোট হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু সমুদ্রের বুকে ভাসবার জন্য অন্তত শক্তপোক্ত জাহাজের দরকার। আমার কাছে যে টাকা আছে তা দিয়ে হয়তো মাঝিমাল্লা জোগাড় করা যেতে পারে। কিন্তু জাহাজ কিনব কীভাবে?'

কথাটা শুনে মৎস্যগন্ধা সোজাসুজি তাকাল এস্তাদিওর চোখের দিকে। তারপর বলল, 'তোমাকে আমি যে গোপন খবরটা আজ দেব, তার মধ্যেই তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে। গল্পটা তবে শোনো।

সমুদ্র থেকে শিশুবয়সে আমাকে আর রানিকে একটা ভাসমান খাঁচা থেকে উদ্ধার করেছিলেন স্বয়ম্ভুনাথ নামে এক বেশ্যাপোতের মালিক। যতদূর শুনেছি সেই ময়ূরপঙ্খিনাও আমাদের নিয়ে কালিকট বন্দরে যায়। কিন্তু কোনও অজানা কারণে পরদিনই আবার সেই বন্দর ত্যাগ করি আমরা। সমুদ্রে ময়ূরপঙ্খির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় পর্তুগিজ রণপোতের। তারা ডুবিয়ে দেয় আমাদের ময়ূরপঙ্খি।

BanglaBook.org

স্বয়ম্ভুনাথ কোনওরকমে আমাকে, রানিকে আর ভর্তিকা নামের গণিকাকে নিয়ে অন্ধকারে ভেসে পড়েন সমুদ্রে। আমাদের ক'দিন পর উদ্ধার করেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নিশাদপাদ, যাকে তুমি সিংহলে ফিরে যেতে দেখেছিলে। আমাদের যখন তিনি উদ্ধার করেন তখন স্বয়ম্ভুনাথের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। মৃত্যুর আগে তিনি আমাদের সঁপে দেন ভিক্ষু নিশাদপাদের হাতে। তিনিই আমাদের এই তমালিকা বন্দরে নিয়ে আসেন। শুধু তিনি আমাদেরই নিয়ে আসেননি আরও একটা জিনিস স্বয়ম্ভুনাথ তুলে দিয়েছিলেন তার হাতে। সেটাও তিনি এতদিন গোপনে রক্ষা করছিলেন তাঁর প্রাচীন মঠে। এখনও সে-জিনিসটা সেই পরিত্যক্ত মঠে লুকোনো আছে। তবে সেটা আর অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা যাবে না। আগামীকাল রাতে গিয়ে আমরা সেটা নিয়ে আসব...।'

এস্তাদিও বলল, 'কী জিনিস?'

মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে সে বলল, 'একটা পেটিকা। সেটা স্বয়ম্ভুনাথের নিজের ছিল নাকি অন্য কেউ দিয়েছিল তা জানা নেই। তার মধ্যে রয়েছে রাশি রাশি হীরে-জহরত-আর স্বর্ণখণ্ড। এত সম্পদ জমিদারদেরও নেই। হয়তো একশোটা জাহাজ কেনা যাবে তা দিয়ে...

এস্তাদিও আশ্চর্য হয়ে গেল তার কথা শুনে।

মৎস্যগন্ধা বলে যেতে লাগল, 'জাহাজে করে সে সম্পদ নিয়ে আমরা চলে যাব কোনও অচেনা দেশে, যেখানে আমাকে কেউ চিনবে না। তোমার কোনও খোঁজ পাবে না পর্তুগিজরা। আমরা সেখানে ঘর বাঁধব...

মৎস্যগন্ধা বলে যেতে লাগল তার কথা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে এস্তাদিওর চোখের সামনেও যেন ভেসে উঠতে লাগল এক অজানা দেশের আশ্চর্য সুন্দর ছবি।

BanglaBook.org

তৃতীয় পর্ব

১৪

সারা রাত বেশ পরিশ্রম গেছে এস্তাদিও আর মৎস্যগন্ধা দুজনেরই। বন্দর অঞ্চল থেকে সেই প্রাচীন মঠ কম দূর নয়। সঙ্গে একটা খচ্চর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঠিকই, তবে তা চড়বার জন্য নয়। কাপড়ের আচ্ছাদন দিয়ে ভালো করে ঢেকে পেটিকাটা খচ্চরের পিঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে বহন করে আনা হয়েছে গণিকালয়ে। ছোট হলেও পেটিকাটা অত্যন্ত ভারী। সিন্দুকটা দ্বিতলে অবস্থিত মৎস্যগন্ধার কক্ষে স্থানান্তরিত করাও যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ ছিল। সেই প্রাচীন মঠ থেকে ফেরার পথে তাদের মনে এ আশঙ্কাও কাজ করছিল যে, রাজপথে যদি নৈশ প্রহরীদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হয়? যদি তারা খুলে দেখতে চায় পেটিকা, তখন কী হবে? কাজেই যথাসম্ভব দ্রুত, প্রায় ছুটতে ছুটতেই তারা ফিরেছে। মৎস্যগন্ধার ঘরে একবার পেটিকাটা খোলা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন আলোকিত হয়ে গেছিল এস্তাদিওর চোখ। তার নিশ্চিত ধারণা, এ-সম্পদ স্বয়ং ভাস্কোরও নেই। একটা জাহাজ কেন পুরো একটা নৌবহর কিনে নেওয়া যায় তা দিয়ে!

মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ে জিনিসটা পৌঁছে এস্তাদিও যখন নিজের বাসায় ফেরার জন্য পথে নামল তখন পুবের আকাশ লাল হতে শুরু করেছে। বাড়ির

BanglaBook.org

কাছাকাছি পৌঁছে এস্তাদিও আধো অন্ধকারের মধ্যে যেন দেখতে পেল একটা লোক তার বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। ব্যাপারটা দেখে মৃদু বিস্মিত হল সে। কিন্তু যখন বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তখন দেখতে পেল ভিতর থেকে সে দরজা বন্ধ। এস্তাদিও ঘা দিল দরজায়। অন্য দিনের থেকে আজ যেন বেশ কিছুটা দেরিতেই দরজা খুলল পেড্রো। এস্তাদিও তাকে প্রশ্ন করল, 'কেউ এখন এল নাকি? নাকি তুমি এখন বাইরে থেকে ফিরলে?'

মৃদু হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল পেড্রো। জবাব দিল, 'না, কেউ আসেনি তো। আর আমি তো ঘুমাচ্ছিলাম।'

এস্তাদিও ভাবল, আধো অন্ধকারে ক্লান্ত শরীরে সে হয়তো ভুল দেখেছে। পেড্রোর সঙ্গে আর বাক্যালাপ না করে এস্তাদিও তার ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বাইরে তখন সূর্যের প্রথম কিরণ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে তমালিকা বন্দরে। ঘুমিয়ে পড়ল এস্তাদিও।

স্বপ্ন দেখছিল এস্তাদিও। এক নতুন দেশের স্বপ্ন। নারিকেল গাছের ছায়া-ঘেরা এক দ্বীপ। ছবির মতো সাজানো ঘরবাড়ি সেখানে। ঊর্মিমালা এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে রৌদ্রকিরণে উজ্জ্বল সোনালি বালুতটকে। আকাশে বড় বড় রঙিন টিয়া পাখির দল ওড়াউড়ি করছে। আর সেই বালুতটে জলছোঁয়া-শঙ্খর মতো সাদা একটা পাথরের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে মৎস্যগন্ধা। সমুদ্রর জলগুলো এসে ঝাপটা দিচ্ছে তার পায়ে। সাদা ফেনায় ঢেকে যাচ্ছে তার কোমর থেকে নীচের অংশ। দূর থেকে দেখতে লাগছে সাপের মতো। ঠিক মৎস্যকন্যার মতো দেখতে লাগছে তাকে। ওপরটা মানবীর, দেহের নিচের অংশটা মাছের মতো। মৎস্যকন্যার মতোই সুন্দর দেখতে তাকে। সমুদ্রের বাতাসে তার খোলা চুল উড়ছে। এস্তাদিও তার উদ্দেশ্যে বলল, 'ওভাবে বসে থেকো না তুমি। তোমাকে মৎস্যকন্যার মতো লাগছে, নির্ঘাত কোনও জাহাজ ডুবিয়ে ছাড়বে তুমি!

মৎস্যগন্ধা তার কথার জবাবে কী যেন একটা বলল। কিন্তু সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের শব্দে এস্তাদিও তার কথা শুনতে পেল না। এস্তাদিও আবার তাকে জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল, 'তুমি কী বলছ?'

কিন্তু এ পর্যন্ত স্বপ্নটা দেখেই হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গেল তার। সুখস্বপ্ন স্থায়ী হল না। চোখ মেলে সে দেখতে পেল পেড্রো এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস আবার এসেছেন। মনে মনে নিদ্রাভঙ্গ,

BanglaBook.org

বলা ভালো, স্বপ্নভঙ্গর জন্য অসন্তুষ্ট হলেও এস্তাদিও বলল, 'ওদের নিয়ে এসো।' এস্তাদিও উঠে বসল।

ঘরে ঢুকে টুপি খুলে এস্তাদিওকে সম্ভাষণ জানাবার পর ক্যাপ্টেন বললেন, 'দুটো দিন হয়ে গেল আপনি কোনও খবর জানালেন না, তাই খোঁজ নিতে এলাম।'

এস্তাদিও জবাব দিল, 'আমি এখনও ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে উঠতে পারিনি।'

পেরো বললেন, 'কিন্তু ক্যাপ্টেন কোহেলো তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন?'

এস্তাদিও আলগোছে জবাব দিল, 'দেখি কী করি?'

কথাটা শুনে ফ্রান্সিস অনেকটা কৈফিয়ত চাইবার ঢঙেই বলে উঠল, 'স্বয়ং অ্যাডিমিরাল আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আর আপনি বলছেন, "ভাবছি"?'

ফ্রান্সিসের কথা শুনে এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এস্তাদিওর। জাহাজের মালিক আর ক্যাপ্টেন যখন আলোচনা করেন তখন তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর অধিকার নেই সেখানে। ডাক্তার হলেও ফ্রান্সিস পদমর্যাদায় তাদের অনেক নীচে। ফ্রান্সিসের কথা শুনে এস্তাদিও বলল, 'অ্যাডমিরাল যে আমাকে ডেকেছেন তা আমি শুনেছি। বারবার কথাটা আমাকে স্মরণ করাবার দরকার নেই। আমার সিদ্ধান্ত আমি যথাসময়ে জানিয়ে দেব। আপনারা এখন জাহাজে ফিরে যান। আর একান্তই যদি আপনারা আমার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে না পারেন, নাবিকরা যদি আর এখানে থাকতে না চায় তবে আপনারা জাহাজ নিয়ে ফিরে যেতে পারেন। তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। জাহাজের খোলে যা মাল তোলা হয়েছে তা গোয়া বা অন্য কোনও বন্দরে গিয়ে বিক্রি করলে নাবিকদের পাওনাগন্ডা, জাহাজ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার খরচ উঠে যাবে।'

এরপর আর কোনও কথা হয় না। ক্যাপ্টেন পেরো বললেন, 'ঠিক আছে। যদি বন্দর ছাড়ি তবে যাবার আগে শেষ একবার আপনাকে জানিয়ে দিয়ে যাব।'

এস্তাদিওর বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই পেড্রো এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। চাপাস্বরে সে বলল, 'একটা খবর আছে।'

'কী খবর?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

পেড্রো বলল, 'গতকাল বিকাল নাগাদ তিনি এ-বাড়ি ছাড়তেই আপনাদের

BanglaBook.org

কথামতো আমি তার পিছু নিলাম। তিনি প্রথমে গেলেন সেই গণিকালয়ে। আমি নদীর পাড়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেশ রাতে মৎস্যগন্ধা নামে বেশ্যালয়ের সেই মালকিন আর একটা খচ্চর নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় নামলেন তিনি। আমিও তাঁদের পিছু নিলাম। বন্দর এলাকা থেকে বেশ দূরে একটা প্রাচীন মঠ আছে। বর্তমানে সেখানে কেউ থাকে না। এক বৃদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী থাকত সেখানে। সে লোকটা ক'দিন আগে সিংহলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। তারা গিয়ে উপস্থিত হল সেই বৌদ্ধ মঠে। তারপর তারা সেখান থেকে একটা ছোট সিন্দুক বার করে এনে খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে ভোর রাতে বেশ্যালয়ে ফিরে এল। যে ভাবে তারা দুজন কষ্ট করে সিন্দুকটা তুলছিল তাতে মনে হয় জিনিসটা খুব ভারী, খচ্চরটাও প্রথমে পিঠে নিতে চাচ্ছিল না পেটিকাটা।'

কথাটা শুনে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস।

পেরো তাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সেইসময় বাড়ির ভিতর থেকে এস্তাদিওর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। পেড্রোর নাম ধরে হাঁক দিচ্ছে এস্তাদিও। ডাকটা শুনেই পেড্রো বলল, 'আমি এখন যাই। তেমন কিছু হলে খবর দেব আপনাদের। কথাগুলো বলে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল, আর ক্যাপ্টেন পেরোরা চললেন জাহাজে ফিরে যাবার জন্য। পথ চলতে চলতে ফ্রান্সিস প্রশ্ন করল, 'ওই সিন্দুকে কী থাকতে পারে বলে মনে হয়?'

ক্যাপ্টেন একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'সম্ভবত কোনও মূল্যবান জিনিস। এমনকী ধনরত্ন সোনাদানাও থাকতে পারে। নইলে সেটা উদ্ধার করার জন্য এত গোপনীয়তা কেন? দিনেরবেলা বের করেও তো তা আনা যেত। নিশ্চই ওই পেটিকা উদ্ধারের কোনও সাক্ষী রাখতে চায়নি তারা।'

এ কথা বলার পর ক্যাপ্টেন বললেন, 'শুনুন, আমাদের কর্তব্য আমি ভেবে নিয়েছি। যা মনে হচ্ছে তাতে এস্তাদিও সহজে নড়বেন না এ বন্দর ছেড়ে। আমাদের একটা দ্রুতগামী নৌকা জোগাড় করতে হবে সমুদ্র অভিযানের উপযোগী। সে নৌকা নিয়ে আমরা আজই যাত্রা করব মোহনার দিকে ক্যাপ্টেন কোহেলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। তিনিই তো ভাস্কোর নির্দেশ নিয়ে এসেছেন। আমরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব, তাঁর পরামর্শমতো। যাতে পরবর্তীকালে আমাদের কোনও জবাবদিহির মুখে পড়তে না হয়।'

BanglaBook.org

'ফ্রান্সিস বলল, 'হ্যাঁ, অতি উত্তম ভাবনা। এটাই করা দরকার।'

কথা বলতে-বলতে তারা এগোল জাহাজের দিকে।

ক্যাপ্টেনরা চলে যাবার পর পেড্রোকে হাঁক দিল এস্তাদিও তার স্নানের জল আর খাবার দেবার জন্য। তারা আসায় ঘুমটা নষ্ট হয়ে গেছিল তার। এস্তাদিও তাই ভেবেছিল যে স্নান খাওয়া সেরে একেবারে ঘুম দেবে। যাতে তাকে বিকেলে বাইরে বেরোবার আগে ঘুম থেকে উঠতে না হয়।

সেইমতো স্নানও সেরে নিল এস্তাদিও। তারপর এস্তাদিও যখন খাবার মুখে তুলতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় পেড্রো ঘরে ঢুকে বলল, 'একজন স্থানীয় লোক এসেছে। বলছে আপনি তাকে চেনেন। ভীষণ জরুরি দরকার আপনার সঙ্গে, তবে নাম বা কোথা থেকে এসেছে তা কিছুই বলছে না।'

কথাটা শুনে এস্তাদিও বাড়ির বাইরে এসে যাকে দেখল সে লোকটার নাম না জানলেও এস্তাদিও তাকে চেনে। লোকটা মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ের দরজা পাহারা দেয়। এস্তাদিওকে দেখেই সে বলল, 'মালকিন এখনই আপনাকে একবার যাবার জন্য সংবাদ পাঠিয়েছেন।'

খবরটা শুনে এস্তাদিও মৃদু শঙ্কিত ভাবে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'তাড়াতাড়ি আসুন। এলেই বুঝতে পারবেন।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে লোকটা আর দাঁড়াল না। প্রায় ছুটতে ছুটতেই সে ফেরার পথ ধরল।

পোশাক পাল্টাতে ঠিক যতটুকু সময় লাগে ঠিক ততটুকু সময় নিল এস্তাদিও। তারপর সে দ্রুত রওনা হল মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ের দিকে।

বাড়িটাতে পা রেখেই এস্তাদিও বুঝতে পারল, কিছু একটা ঘটেছে। অন্যদিন দিনের বেলা এসময় বাড়িটা ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু গণিকার দল এখন ঘর ছেড়ে হঠাৎই যেন বাইরে বেরিয়ে এসেছে। চাপাস্বরে নিজেদের মধ্যে কী সব যেন আলোচনা করছে। চোখ-মুখের ভাবও বেশ উত্তেজিত। এস্তাদিও সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা মৎস্যগন্ধার ঘরের সামনে হাজির হল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শ্যামা চোখ মুছছিল। এস্তাদিওকে দেখে সে নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল। এস্তাদিও ভিতরে ঢোকার পর আবার পিছন থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

জানলা দিয়ে দিনের আলো ঢুকছে ঘরে। এস্তাদিও দেখল পালঙ্কের ওপর শুয়ে আছে রানি। আর তার মাথায় পরম মমতায় হাত বোলাচ্ছে মৎস্যগন্ধা। জল গড়িয়ে পড়ছে তার চোখ বেয়ে।

পালঙ্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল এস্তাদিও। রানির দিকে তাকিয়ে এস্তাদিও

BanglaBook.org

বুঝতে পারল; মৎস্যগন্ধার দীর্ঘদিনের ছায়াসঙ্গী, সহচরী আর বেঁচে নেই। বিস্মিতভাবে এস্তাদিও জানতে চাইল, 'ওর কী হয়েছিল?'

প্রথমে মৎস্যগন্ধা মুখে কোনও কথা না বলে ইঙ্গিত করল ঘরের এক কোণে মেঝের দিকে। একটা কালো হিলহিলে সাপ সেখানে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে!

মৎস্যগন্ধা এরপর ধরা গলায় বলতে লাগল, 'তুমি চলে যাবার পর শুয়ে পড়েছিলাম আমি। রানি অলিন্দ থেকে কখন ঘরে ঢুকেছিল জানি না। ওর চিৎকারে ঘুম ভেঙে দেখি সে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ছে সাপটাকে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। যাবার আগে সাপটা শেষ কামড় দিয়ে গেল রানির লোমহীন হাতের পাতায়।'

এস্তাদিও বিস্মিতভাবে বলল, 'এঘরে সাপ ঢুকলো কীভাবে?'

কান্না-ভেজা গলায় মৎস্যগন্ধা ফিসফিস করে বলল, 'আমরাই নিয়ে এলাম। রানিকে যখন মাটি থেকে তুলছি তখন দেখলাম পালঙ্কের নীচে সিন্দুকের ডালাটা আধখোলা। রানির অভ্যেস হল ঘরে কোনও নতুন জিনিস এলেই সে সেটাকে নেড়েচেড়ে দেখে। তেমনই হয়তো পেটিকাটা নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে খুলে ফেলেছিল সে। কোনওভাবে সাপটা ঢুকে ছিল পেটিকার ভিতর। অথবা ছোট্ট সাপটা কাঠের সিন্দুকের লোহার পেটির খাঁজেও লুকিয়ে থাকতে পারে। অন্ধকারে খেয়াল করিনি আমরা। এ সাপ হল কালনাগিনী। ওই বৌদ্ধ মঠে এ-সাপ আমি একবার দেখেছিলাম।'

এস্তাদিও বলল, 'এবার আমি অনুমান করতে পারছি যে, ভারবাহী খচ্চরটা কেন প্রথমে পেটিকাটা পিঠে নিতে রাজি হচ্ছিল না। সম্ভবত প্রাণীটা সাপের উপস্থিতি বুঝতে পেরেছিল। হয়তো নিছক কৌতূহলের জন্য নয়, রানিও বিজাতীয় প্রাণীর উপস্থিতি বুঝতে পেরেই পেটিকার দিকে এগিয়ে গেছিল।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'হতে পারে। রানি নিজের প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে গেল আমাকে।'—এই বলে সে এস্তাদিওকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। এস্তাদিও তাকে সান্ত্বনা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

মৎস্যগন্ধাকে যখন অনেক বুঝিয়ে এস্তাদিও শান্ত করতে পারল তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। শ্যামাকে ডেকে মৎস্যগন্ধা নির্দেশ দিল, 'পূবদিকে আমার জানলার ঠিক নীচের জমিতে রানির কবরের ব্যবস্থা কর। যাতে নীচে তাকালেই আমি তাকে দেখতে পারি। প্রতিদিন সূর্যের প্রথম আলো এসে পড়বে রানির

BanglaBook.org

কবরের ওপর। আর জ্যোৎস্নারাতে জোয়ারের জল এসে স্নান করিয়ে দেবে রানির কবরটাকে। আর একটা কথা, আমি যতদিন-না নির্দেশ দিচ্ছি ততদিন এ বাড়ির দরজা খদ্দেরদের জন্য বন্ধ থাকবে।'

মৎস্যগন্ধার নির্দেশমতোই কাজ হল। কবরের গর্ত খোঁড়া হল সেই নির্দিষ্ট জায়গাতেই। মৎস্যগন্ধা নিজের হাতে চন্দন বেটে লেপে দিল রানির কপালে। মালা দিয়ে সাজানো হল রানিকে। তারপর নতুন কাপড় আর চাটাইতে মুড়ে রানির দেহটা নীচে নামিয়ে কবরে শোয়ানো হল। গণিকার দল সার বেঁধে এসে ফুল আর-একমুঠো করে মাটি দিতে লাগল কবরে। তারপর ঝপাঝপ করে মাটি ফেলা শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢেকে গেল রানির দেহ। কবর মাটি দিয়ে ঢেকে দেবার পর তার ওপর বসানো হল চকমেলানো পাথরের টুকরো। সব শেষে নির্বাক মৎস্যগন্ধা কবরের ওপর একগোছা ধূপ জ্বালিয়ে দিল।

সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। বিদায়ী সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল রানির কবরের ওপর। বাড়ির ভিতর ঢোকার আগে একবার নদীর দিকে তাকাল এস্তাদিও। মাঝনদীতে নোঙর করা তার জাহাজটা দেখতে পেল এস্তাদিও। মাথার ওপর ক্রুশ আঁকা পর্তুগালের লাল পতাকাটা পত পত করে উড়ছে। ম্যানুয়াল-পুত্র রাজা তৃতীয় জনের পতাকা, ভাস্কো ডা গামার পতাকা! সেদিকে তাকিয়ে রইল এস্তাদিও। হাজার হোক ওই পতাকাটা সম্বল করেই তো এতটা দূরের পথ পাড়ি দিয়েছিল এস্তাদিও। সব টান তো আর মুছে ফেলা যায় না। কে যেন পতাকাটা নামাতে শুরু করল। প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় পতাকা নামানো হয় আবার সূর্যোদয়ের মুহূর্তে পতাকা ওঠানো হয়। তার জন্য জাহাজে লোক থাকে। সব পর্তুগিজ জাহাজেই একই নিয়ম। আর তারপরই যেন মনে হল জাহাজ থেকে কয়েকজন লোক নামল, তার গায়ে লাগান নৌকাতে। তারপর দ্রুতগামী সেই নৌকাটা জল কেটে রওনা হল যেদিকে মোহনা সেদিকে। এস্তাদিওর দেখাটা অবশ্য ভুল ছিল না। ঠিক সেই মুহূর্তেই ক্যাপ্টেন পেরো, ফ্রান্সিস আর কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে রওনা হলেন মোহনার কাছে সমুদ্রে অপেক্ষমান ক্যাপ্টেন কোহেলোর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য।

পরদিন ভোরবেলা মোহনা অতিক্রম করে সাগরে পৌঁছোল তারা। কিছুটা পথ অতিক্রম করেই ক্যাপ্টেন পেরো তার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে

BanglaBook.org

পেলেন একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে দরিয়াতে। তার মাস্তুলে উড়ছে লাল পতাকা। নির্ঘাত ওটা পর্তুগিজ জাহাজ। ক্যাপ্টেন পেরো নৌকো নিয়ে এগোলেন সেদিকে।

জাহাজটার কাছে উপস্থিত হবার আগে সান্টা মারিয়ার বুদ্ধিমান ক্যাপ্টেন পেরো নৌকাতে একটা পর্তুগিজ পতাকা টাঙিয়ে দিলেন যাতে কোনও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় সেজন্য।

ক্যাপ্টেন পেরো পৌঁছে গেলেন সেই জাহাজের কাছে। জাহাজটার অগ্রবর্তী মাস্তুল। প্রধান মাস্তুল তার সংলগ্ন ও মাস্তুলে কোথাও পাল খাটানো নেই। সমুদ্রেস্রোত থাকলেও পালহীন, নোঙর করা মাঝারি আকারের জাহাজটা জগদ্দল পাথরের মতো আটকে আছে মোহনার নিকটবর্তী সমুদ্রে। রণপোতের ডেকের ওপর বসানো আছে সার সার কামাল।

ক্যাপ্টেন পেরোর নৌকাটা সেই জাহাজের কাছাকাছি আসতেই ডেক থেকে একজন হাঁক দিল, 'তোমরা কারা? কোথা থেকে আসছ?'

পেরো জবাব দিলেন, 'আমরা পর্তুগিজ। তমালিকা বন্দর থেকে আসছি। ক্যাপ্টেন কোহেলোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি হলাম ক্যাপ্টেন পেরো। তমালিকা বন্দরে নোঙর করা পর্তুগিজ জাহাজ "সান্টা মারিয়ার" ক্যাপ্টেন।'

জবাব শুনে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল সেই রণপোতের কিনারা থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডেক থেকে একটা দড়ির মই নেমে এল পর্তুগিজ জাহাজে ওঠার জন্য। সেই মই বেয়ে জাহাজে উঠে এলেন ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস।

ডেকে বেশ ভিড়। অনেক লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। ক্যাপ্টেন পেরো দেখতে পেলেন, একজন নাবিককে জাহাজের ডেকে নোঙরের শিকল বা কাছি জড়াবার লোহার স্তম্ভ অর্থাৎ ক্যাপস্টেন-এর সঙ্গে পিছমোড়া করে বাঁধা রয়েছে। আর তার পাশেই কাঠের মদের পিপের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে আর একজন নাবিক। তারা দুজনেই রক্তাক্ত।

ক্যাপ্টেন পেরোরা ডেকে উঠে আসতেই ডেকের জটলার মধ্যে থেকে বেরিয়ে একটা লোক এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিসের সামনে। লোকটা দানবাকৃতির। লাল দাড়ি, মাথার চুল কালো কাপড়ের ফেট্টি দিয়ে বাঁধা। লোকটার চেহারার মধ্যে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে তা হল, তার কপাল

BanglaBook.org

থেকে সুতো দিয়ে বাঁধা কালো কাপড়ের একটা ঠুলি ঝুলছে বাম চোখের ওপর। মুখমণ্ডল, বাহুসহ লোকটার যেসব অংশ অনাবৃত, সেসব জায়গায় অসংখ্য প্রাচীন ক্ষতচিহ্ন সাক্ষ্য দিচ্ছে লোকটার কোনও দুর্দমনীয় অতীতের। হয়তো বা বর্তমানেরও। তার হাতে-ধরা একটা চামড়ার চাবুক। চাবুকের মাথার কাছে সিসার টুকরো বাঁধা। সম্ভবত এ লোকটাই এতক্ষণ চাবকাচ্ছিল ক্যাপস্টেন আর মদের পিপেতে বাঁধা লোক-দুজনকে। লোকটা এক চোখে পেরোদের দুজনকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে কর্কশভাবে বলল, 'আমি এ জাহাজের ক্যাপ্টেন কোহেলো। আপনাদের মধ্যে বণিক এস্তাদিও কোন জন? যাকে আমার গোয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা?'

পেরো জবাব দিলেন, 'তিনি আমাদের সঙ্গে নেই। আমি সান্টা মারিয়া জাহাজের ক্যাপ্টেন পেরো, আর আমার সঙ্গী ডাক্তার ফ্রান্সিস। বাণিজ্যকুঠির মালিক দিয়াগো আমাদের আপনার এখানে আসার সংবাদ দিয়েছেন। আমরা আপনার সঙ্গে জরুরি পরামর্শ করতে এসেছি।'

ক্যাপ্টেন কোহেলো বললেন,'এস্তাদিও আসেননি। কিন্তু আর তো অপেক্ষা করতে পারব না আমি। আজই আমাকে জাহাজ ছাড়তে হবে। অ্যাডমিরাল ভাস্কো আমাকে এখানে এস্তাদিওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য চারদিন অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। সে সময় অতিক্রান্ত।'

ফ্রান্সিস বলল, 'সে ব্যাপারেই আলোচনা করতে এসেছি আমরা।'

ক্যাপ্টেন কোহেলো বললেন, 'ঠিক আছে, আমার কেবিনে চলুন।'

ক্যাপ্টেন পেরোদের নিয়ে নিজের কেবিনে পা বাড়াবার আগে ক্যাপ্টেন কোহেলোও একটু থেমে মাস্তুলগুলোর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে ডেকে জমায়েত হওয়া নাবিকদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ওদেরকে এবার নীচে নামিয়ে জলে ছুড়ে ফেল। সমুদ্রের নীচে ওরা খদ্দের ধরতে থাক।'

কোহেলোর দৃষ্টি অনুসরণ করে মাস্তুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন পেরো মৃদু চমকে উঠলেন। গ্যালন মাস্তুলের থেকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় দুটো মেয়ে ঝুলছে। সম্পূর্ণ নগ্ন। মাঝে মাঝে ছটফট করছে তারা!

ক্যাপ্টেন পেরোদের চোখ সেদিকে গেছে বুঝতে পেরে তাদের নিয়ে নিজের কেবিনের দিকে এগোতে এগোতে ব্যাপারটা যেন কিছুই না এমনভাবে কোহেলো বললেন, 'অ্যাডমিরাল ভাস্কোর নির্দেশ, তাঁর কোনও জাহাজে

BanglaBook.org

কোনও নারী তোলা যাবে না। এখানে আসার পথে একটা ছোট বন্দরে জল নিতে থেমেছিলাম। কোন ফাঁকে যেন দুজন মাল্লা ওই দুটো বেশ্যাকে জাহাজে তুলে ফেলেছিল। কিন্তু আমার একটা চোখ হলেও সে-চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। ঠিক ধরে ফেলেছি। মেয়েদুটোকে তাই জলে ফেলে দিতে বললাম, আর নাবিক দুজন আপাতত কয়েদ থাকবে। গোয়াতে ফিরে ওদের ব্যবস্থা হবে। তবে প্রদীপের নীচেও অন্ধকার থাকে। এ-দেশে আসার পথে স্বয়ং-হবু ভাইসরয়ের জাহাজ থেকেই দুজন মেয়ে ধরা পড়েছে। গোয়ার রাস্তায় প্রকাশ্যে তাদের চাবকাবার ফরমান জারি করেছেন ভাস্কো।

ক্যাপ্টেন পেরোদের নিজের কেবিনে এনে বসালেন কোহেলো। তার খাস ভৃত্য এসে দু-পাত্র ফেনা ওঠা মদ রেখে গেল অতিথি আপ্যায়নের জন্য। কোহেলো জানতে চাইলেন 'এবার বলুন ব্যাপারটা কী?'

মদের পাত্রে চুমুক দিতে দিতে ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস বলতে লাগল তাদের কথা। এমনকী শেষে সেই পেটিকা উদ্ধারের কথাও বাদ দিল না। যতটা সম্ভব বিস্তৃতভাবে তারা কথাগুলো বলল।

সব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার পর ক্যাপ্টেন কোহেলো বলল, 'দেখুন, আমি ইচ্ছা করলেই গোলা দেগে অরক্ষিত তমালিকা বন্দরের ওই বেশ্যালয় ধ্বংস করতে পারি। অ্যাডমিরালের নির্দেশ অমান্য করার জন্য এস্তাদিও নামের লোকটাকে বন্দিও করে আনতে পারি বন্দরে নেমে। আমি জলদস্যু ছিলাম। আমার জাহাজে যাদের দেখছেন সেই মানুষগুলো অনেকেই আমার সহকর্মী ছিল। অ্যাডমিরালের হাতে ভূমধ্যসাগরে ধরা পড়েছিলাম আমরা। তিনি বললেন যদি আমরা তাদের ভারতগামী নৌবহরে যোগ দিই তবে তিনি ফাঁসি দেবেন না। আমি আমার দলবল নিয়ে যোগ দিলাম তাঁর সঙ্গে। জানেন-ই তো আমাদের মতো অনেক খুনেকে সঙ্গে করে তিনি এদেশে এনেছেন। কারণ আমাদের দিয়ে যে-কাজ হবে সবার দ্বারা তা হবে না। লোকটাকে আমি ধরে আনতেই পারি কিন্তু অ্যাডমিরালের নির্দেশ ছাড়া আমি কিছু করব না। আপনারা বন্দরে ফিরে যান। আমি গোয়া ফিরে অ্যাডমিরালকে সব জানাচ্ছি। পরবর্তী নির্দেশ নিশ্চই আপনাদের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাবে। ততদিন অপেক্ষা করুন।'

ক্যাপ্টেন কোহেলের পরামর্শ নিয়ে তমালিকা বন্দরে ফেরার জন্য জলে নামলেন ক্যাপ্টেন পেরো।

BanglaBook.org

মালখানার মধ্যে তালিকাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলেন ভাস্কো। সামনে মাটিতে রাখা স্তূপাকৃতি বন্দুকগুলো গুনতি করছিল ভাস্কোর নিজস্ব একজন লোক। এই সরকারি অস্ত্রাগারের করনার বা হিসাবরক্ষক পর্তুগিজ কিছুটা তফাতে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

যে লোকটা গুনতি করছিল সে বন্দুকগুলো একপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলছিল—'দুশো পাঁচ, দুশো ছয়...।' কিন্তু দুশো ছাব্বিশে এসে থেমে গেল লোকটা। অর্থাৎ দুশো ছাব্বিশটা বন্দুক আছে এই অস্ত্রাগারে।

এরপর র‍্যাকে রাখা পিস্তলগুলো গোনার পালা। গুনে দেখা গেল, একশো ছাব্বিশটা পিস্তল আছে।

বিতৃষ্ণায় অ্যাডমিরাল মাথা নাড়লেন। তারপর হিসাবরক্ষককে প্রশ্ন করলেন, 'সরকারি হিসাবমতো চারশো বন্দুক আর দুশো পিস্তল থাকার কথা। বাকি অস্ত্রগুলো গেল কোথায়?'

প্রশ্ন শুনে হিসাবরক্ষক মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ভাস্কো এবার বলে উঠলেন, 'বলো কোথায়? নইলে সরকারি অস্ত্র চুরির অপরাধে তোমাকে ফাঁসি দেব।'

লোকটা এবার কাঁপতে-কাঁপতে বলল, 'আগের ভাইসরয়ের নির্দেশে স্থানীয় কয়েকজন শিকারি আর ব্যবসায়ীর কাছে অস্ত্রগুলো বেচে দেওয়া হয়েছে।'

আগের ভাইসরয় অর্থাৎ 'ডম ডুয়ার্তে দে মোনেজেস'। এদেশে আগে যে পাঁচ-জন ভাইসরয়কে পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে কমবেশি সবাই যে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধি করেছেন এ-তথ্য পর্তুগাল রাজসভা জানে আর ভাস্কোও জানেন। দু-দশকও হয়নি, তাঁরা ছিবড়ে করে ছেড়ে দিয়েছেন এই পর্তুগিজ উপনিবেশকে। এদেশে প্রথম ভাইসরয় হিসাবে পাঠানো হয়েছিল ফ্রান্সিসকো দ্য আলমিডাকে। যুদ্ধবাজ মানুষ ছিলেন তিনি। মূর নৌবহরকে পরাস্ত করতেই তাঁর সময় কেটে যায়। দ্বিতীয় ভাইসরয় ছিলেন আলবুকার্ক। এদেশের বুকে তিনি চরম নৃশংসতার ছাপ রেখে গেলেও তাঁর পরম কৃতিত্ব গোয়াতে পর্তুগিজদের এই উপনিবেশ স্থাপন। আর এর পরবর্তী

BanglaBook.org

তিনজন ভাইসরয় ছিলেন যথাক্রমে লোপো সোরেম সে অলবেরগরিয়া, দিয়াগো লোপেস দে মেকিরা ও ডম ডুয়ার্তে দে মোনেজেস। এই শেষোক্ত তিনজন গোয়াকে মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করানোর কোনও চেষ্টা তো করেননি, উপরন্তু পরিবেশটাকে একদম ধ্বংস করে ফেলছেন। ইউরোপ থেকে এদেশে আসার পর সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকুও যেন নিজেদের শরীর থেকে খসিয়ে ফেলেছিলেন তাঁরা। এমনকী অর্থের লোভে এখানে দাসবাজারেরও অনুমতি দিয়েছেন তাঁরা। ডিরিটা নদীর ধারে সেই দাসবাজারে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় নারী-পুরুষ বিক্রি করা হয়।

হিসাবরক্ষক সত্যি বলছে কিনা তা তখন জানার উপায় নেই ভাবী ভাইসরয়ের। কারণ, ভাস্কো গোয়াতে পদার্পণ করার কিছুদিন আগেই পূর্বতন ভাইসরয় দায়িত্ব ত্যাগ করে পারস্য উপসাগরে পাড়ি দিয়েছেন। হয়তো তিনি এটা করেছেন ভাস্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান না বলেই। তবে ভাস্কোর মনে হল হিসাবরক্ষক সত্যি কথাই বলছে। তিনি এরপর হিসাব রক্ষককে বললেন, 'তোমাকে একমাস সময় দিলাম। তার মধ্যে ওইসব ব্যবসায়ীদের থেকে সব মাল ফিরিয়ে আনতে হবে। অস্ত্র বিক্রির সময় নিশ্চই তাদের রসিদ দেওয়া হয়নি? অস্ত্র ফেরত না দিলে চোরাই মাল কেনার অপরাধে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে।'

BanglaBook.org

হিসাবরক্ষককে নির্দেশ দিয়ে কীভাবে গোয়াতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় তা ভাবতে ভাবতে তাঁর বাসস্থানের পথ ধরলেন অ্যাডমিরাল।

গোয়ার পরিবেশ যে ভালো নয় তা বণিকদের মাধ্যমে পৌঁছেছিল রাজা তৃতীয় জনের কাছে। গোয়ার পুনর্গঠনের জন্যই ভাস্কোর সব শর্ত মেনে নিয়ে পর্তুগালের রাজা ভাস্কোকে পাঠিয়েছেন এখানে। কিন্তু গোয়ার পরিস্থিতি যে এতটা অরাজক তা ধারণা করতে পারেননি ভাস্কো। দুদিন আগে স্থানীয় হাসপাতাল পরিদর্শন করতে গেছিলেন ভাস্কো। সেখানে শুধু যৌনরোগ সিফিলিস-আক্রান্ত রোগী আর মাতাল ভবঘুরের ভিড়! শেষোক্ত লোকগুলো রোগী না হয়েও হাসপাতাল কর্মীদের উৎকোচের বিনিময়ে সরকারি খরচে খাওয়া আর মাথা গোঁজার স্থান জুটিয়ে নিয়েছে। সেখানে বেশ্যাদেরও নিয়মিত আনাগোনা আছে। ভাস্কো সেখানকার অধ্যক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আগামী তিনদিনের মধ্যে অবাঞ্ছিত লোকদের তাড়িয়ে হাসপাতাল খালি করতে হবে। আর রাস্তায় মারপিট করে আহত অবস্থায় কেউ এলে সরকারি খরচে তার

চিকিৎসা চলবে না। আসলে মদ খেয়ে নাবিকদের মধ্যে রাস্তায় মারপিট করা প্রায় নিত্য-দিনের ঘটনা এখানে। উশৃঙ্খলতাই যেন গোয়ার জনজীবনের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ভাস্কোকে এগুলো বন্ধ করতে হবে। এদেশের স্থানীয় পরিবেশকে অবশ্য এ-ব্যাপারে দোষ দেওয়া যায় না। রোগটা অবশ্য এসেছিল পর্তুগাল থেকেই। এদেশে এ পর্যন্ত তিরিশ হাজার পুরুষ এসেছে পর্তুগাল থেকে। তার মধ্যে মাত্র দশ হাজার ফিরে গেছে পর্তুগালে। বাকি কুড়ি হাজার এদেশেই রয়েছে অথবা মারা পড়েছে যৌনরোগে বা নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায়। পর্তুগাল থেকে যে-মানুষগুলোকে এদেশে আনা হয়েছিল তাদের মধ্যে সিংহভাগই ছিল পর্তুগাল সমাজে অতি নিম্নশ্রেণির মানুষ অথবা ভারতে আসার শর্তে মুক্তি পাওয়া জেলবন্দি চোর-বদমাশ-খুনেদের দল। এদেশে এসে ভাইসরয়দের দুর্বল শাসনের সুযোগ নিয়ে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় মেতে উঠেছে লোকগুলো। সরকারি সম্পত্তি চুরি, মদ-জুয়া আর অবশ্য অবশ্য ভাবে নারীসঙ্গ ছাড়া আর কোনও কাজ নেই তাদের। বেশ্যালয়ে যাওয়া-আসা তো আছেই, যাদের একটু পয়সা আছে তারা এক-একজন চার-পাঁচজন করে উপপত্নী রেখেছে। তবে উপপত্নীরা কেউ পর্তুগিজ নয়। পর্তুগিজ মেয়েদের চরিত্র তাদের পুরুষদের থেকে একদম উল্টো। পর্তুগিজ পুরুষদের যেমন ঘরের প্রতি দেশের প্রতি কোনও টান থাকে না, তেমনই আবার পর্তুগিজ নারীরা ঘরকুনো। এত দূর দেশে আসার কোনও প্রশ্নই নেই তাদের।

এদেশে পর্তুগিজরা যাদের উপপত্নী রাখে তার অধিকাংশই স্থানীয় নারী অথবা আফ্রিকান। রাস্তায় চলতে চলতে যেসব শিশুদের ভাস্কো ভিক্ষা করতে দেখছেন অথবা যেসব কিশোর-কিশোরীদের দোকান-বাজারে কাজ করতে দেখছেন তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, তারা সঙ্কর গোত্রের। স্থানীয় নারীদের গর্ভে পর্তুগিজ ঔরসে তাদের জন্ম। পর্তুগিজদের লাগামহীন যৌনক্ষুধা-কামেচ্ছা ইতিমধ্যেই এদেশে বেশ কয়েকটা সঙ্কর প্রজন্ম সৃষ্টি করেছে। পর্তুগিজ ঔরসে জন্ম বলে পর্তুগিজদের বদগুণগুলো এদের মধ্যে যথেষ্ট সঞ্চারিত হয়েছে। এই সঙ্কর গোত্রের ছেলেমেয়েরাও ইতিমধ্যে ছোটখাটো চুরি-ছিনতাইয়ে হাত পাকাতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা যদিও মোটেও ভালো না তবে এদের দেখে একটা কথা মনে হয়েছে। হয়তো বা কালের নিয়মে একদিন পর্তুগিজদের এদেশ থেকে চলে যেতে হবে। কিন্তু এই সঙ্কর জাতের মানুষগুলো গোয়ার মাটিতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করে

BanglaBook.org

চলবে পর্তুগিজ রক্তের ধারা।

ভাস্কো পৌঁছে গেলেন তাঁর আস্তানায়। এখনও ভাইসরয়ের জন্য নির্দিষ্ট বিশাল বাড়িটাতে পা রাখেননি ভাস্কো। সমুদ্রতীরবর্তী সাদা রঙের এই ছোট্ট বাড়িটাকেই মাথা গোঁজার স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছেন। থামওয়ালা টানা বারান্দাতে বসলে অনেকটা সমুদ্র দেখা যায়। সমুদ্রের বাতাস আর নারকেলগাছের ছায়াঘেরা বাড়ির পরিবেশটা বেশ নিরিবিলি। শান্তিতে কাজ করার সুবিধা। প্রতিদিন মাঝরাত অব্দি নানা দলিল- দস্তাবেজ ঘাঁটতে হচ্ছে ভাস্কোকে। বিভিন্ন ধরনের দলিল। সরকারি বিভিন্ন হিসেব থেকে শুরু করে, নানান রসিদ, এমনকী পর্তুগিজ জাহাজগুলোর দিনলিপির খাতা বা লগবুক পর্যন্ত। এ কাজটা অবশ্য একটু ভালোই লাগে ভাস্কোর। তাঁর দ্বিতীয় অভিযান শেষ করে পর্তুগালে ফিরে যাবার পর এদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে যে দলিল দস্তাবেজ বা তার অনুলিপি পর্তুগালে পাঠানো হত তা রাজার অনুমতি নিয়ে মহাফেজখানায় গিয়ে নিয়মিতভাবে দেখতেন ভাস্কো। এদেশের প্রতি আকর্ষণ তাঁর কোনও দিনই কমেনি। এবার এদেশে আসার সময় তিনি তাঁর দ্বিতীয় অভিযানের সময়কার বেশ কিছু দলিল- দস্তাবেজও সঙ্গে করে এনেছেন। বাড়িতে বসে খাওয়া সেরে সরকারি গুদামের হিসাবের খাতা নিয়ে দুপুরবেলা কাজ করতে বসলেন ভাস্কো। খাতাটা দেখা শুরু করতেই ভাস্কো বুঝতে পারলেন, ছত্রে ছত্রে গরমিল আছে তার হিসেব। সর্বত্রই খালি চুরি করা হয়েছে। খাতার সে জায়গাগুলো লাল কালি দিয়ে দাগাতে লাগলেন তিনি। যখন কাজ শেষ হল তখন সূর্য ডুবতে শুরু করেছে সমুদ্রের বুকে। তার লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের জলে। দলিল দস্তাবেজের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে ভাস্কো তাকালেন সেদিকে। আর তখনই তিনি দেখতে পেলেন দূর থেকে একটা জাহাজ যেন তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। পাশে রাখা আতসকাচ লাগানো পিতলের নলটা উঁচিয়ে ধরে চোখে লাগালেন তিনি। অমনি জাহাজটা কাছে এগিয়ে এল। মাঝারি আকারের একটা পর্তুগিজ রণপোত। তার মাথায় উড়ছে পর্তুগিজ পতাকা।

জাহাজটা চিনতে পারলেন ভাস্কো। দূরবিনটা নামিয়ে রেখে ভাস্কো মনে মনে ভাবলেন, 'এস্তাদিও ছোকরাটাকে নিয়ে কোহেলো তবে ফিরে আসছে।'

তবে এস্তাদিও ফিরতে এত দেরি করল কেন তা বোধগম্য হচ্ছে না ভাস্কোর। বণিক দিয়াগো যখন ভাস্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল তখনই

BanglaBook.org

সে জানিয়েছিল, সে শুনে এসেছে যে এস্তাদিও নামের এক পর্তুগিজের জাহাজ নোঙর করেছে তমালিকা বন্দরে। তার মানে এস্তাদিও ভাস্কোর নির্দেশমতো সঠিক সময়ই তমালিকা বন্দরে পৌঁছেছিল। এস্তাদিওর ওই অঞ্চল সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে এত দেরি হল কেন তা তার মুখ থেকেই শোনা যাবে—মনে মনে ভাবলেন ভাস্কো। ইতিমধ্যে অবশ্য নদীর মোহনায় ওই অঞ্চল সম্বন্ধে বেশ কিছু খুঁটিনাটি তথ্য বণিক দিয়াগোর মাধ্যমে পেয়েছেন ভাস্কো। এস্তাদিওর কাছ থেকেও নিশ্চিতভাবে আরও তথ্য পাওয়া যাবে। এখন পর্যন্ত ভাস্কো যতটুকু শুনেছেন তমালিকা বন্দর সম্পর্কে তাতে তিনি জেনেছেন ক্ষয়িষ্ণু তমালিকা বন্দর বেশ শান্ত অঞ্চল। ভাস্কো ভেবে রেখেছেন, তেমন হলে স্থানীয় জমিদারের থেকে অনুমতি নিয়ে একটা বড় বাণিজ্যকুঠি সেখানে তিনি বানিয়ে রাখবেন। আর সে কাজের দায়িত্ব তিনি এস্তাদিওকেই দেবেন। নামে বাণিজ্যকুঠি হলেও সেটা আসলে হবে ছোটখাটো একটা দুর্গ আর পালানোর পথ। দৈবাৎ যদি গোয়াতে কোনও দিন দুর্যোগ নেমে আসে তখন যাতে সেখানে আশ্রয় নেওয়া যায় আর প্রয়োজনবোধে সেখান থেকে পর্তুগালের দিকে যাত্রা শুরু করা যায় তার সব ব্যবস্থা সেই বাণিজ্যকুঠিতে করা থাকবে। এদেশে শেষবারের অভিজ্ঞতা থেকে এবার বেশ সাবধানী ভাস্কো। আর একটু হলেই গতবার আরব নৌবহরের হাতে ধ্বংস হতে পারত তাঁর। তাই এবার নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে বেশ সাবধানী অ্যাডমিরাল।

বারান্দা থেকে উঠে পড়লেন অ্যাডমিরাল। নিজের শয়ন কক্ষে সাময়িক বিশ্রাম নিতে যাবার আগে খাসভৃত্যকে তিনি নির্দেশ দিয়ে গেলেন যদি কেউ আসে তবে যেন তাঁকে ডেকে দেওয়া হয়।

ডাক এল সন্ধ্যা নামার অনেক পরে। ভাস্কো তখন নিজের ঘরেই দ্বিতীয় দফার কাজ শুরু করার জন্য কাগজপত্র নিয়ে বসতে যাচ্ছিলেন। ভৃত্য এসে জানাল যে, ক্যাপ্টেন কোহেলো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। খবরটা শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেন গামা। কোহেলো তাঁকে দেখে টুপি খুলে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'সন্ধ্যাবেলায় ফিরেছি। আর বন্দর থেকে সোজা চলে এলাম আপনাকে বিরক্ত করতে। আমাকে মার্জনা করবেন অ্যাডমিরাল।'

ভাস্কো নিজের গদি আঁটা আসনে বসতে বসতে কোহেলোর উদ্দেশ্যে বললেন, 'জাহাজটা আসতে দেখেছিলাম। না, আমি বিরক্ত হইনি। বরং তোমাদের প্রতীক্ষাই করছিলাম।'

BanglaBook.org

কথাগুলো বলে ইশারায় কোহেলোকে সামনের আসনটায় বসতে বললেন ভাস্কো। ভাস্কো তাকে বসতে বললেন বটে কিন্তু কোহেলো বসল না। ভাস্কোকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মান প্রদর্শনের জন্য টুপি-বগলে দাঁড়িয়ে রইল। ভাস্কো মনে মনে খুশিই হলেন এ ব্যাপারটাতে। এই কোহেলো বলে লোকটা একসময় জলদস্যু সর্দার ছিল। জীবনে বহু নরহত্যা লুঠতরাজ করেছে। ভাস্কো তার শাস্তি মকুব করার পর ভাস্কোর প্রতি চরম আনুগত্য প্রকাশ করে লোকটা। ভাস্কোর কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। ইতিমধ্যে ভাস্কোর আস্থাও অর্জন করে ফেলেছে সে। এদেশে এই তিনবারের অভিযানে বহু দাগী অপরাধীকে নিজের সঙ্গী করেছেন ভাস্কো। কিন্তু তাদের কাউকেই কোনও দিন বিশ্বাস করে কোনও বড় দায়িত্ব দেননি। ব্যতিক্রম এই ভূতপূর্ব জলদস্যু সর্দার কোহেলো। তাকে তিনি একটা রণপোতের ক্যাপ্টেন বানিয়েছেন। এ লোকটা যদি ঠিকঠাক দায়িত্ব পালন করে চলে তবে ভবিষ্যতে তাকে আরও বড় দায়িত্ব দেবার ইচ্ছা আছে ভাস্কোর। এই উপনিবেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে কোহেলোর মতোই কিছু কঠিন লোকের প্রয়োজন ভাস্কোর; যারা অক্ষরে অক্ষরে নতুন ভাইসরয়ের নির্দেশ মেনে চলবে। এবং ভাইসরয়ের প্রয়োজনবোধে তাঁর নির্দেশক্রমে চরম নৃশংস হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। ভাস্কো কোহেলোকে জিগ্যেস করলেন, 'এস্তাদিও কোথায়? সে কি তোমার জাহাজেই এসেছে? নাকি তোমাদের পিছনে তাঁর নিজের বাণিজ্যপোত নিয়ে আসছে?'

কোহেলো জবাব দিল 'না, তিনি আমার জাহাজেও আসেননি। পিছনের জাহাজেও আসছেন না।'

ভাস্কো কথাটা শুনে বিস্মিতভাবে বললেন, 'কেন? আমার নির্দেশ কি তার কাছে পৌঁছোয়নি? নাকি সে অসুস্থ?'

কোহেলো জবাব দিল, 'আপনার নির্দেশ তাঁর কাছে পৌঁছেছে। এবং তিনি অসুস্থও নন।'

'তার মানে? তবে ঘটনাটা কী?' উত্তেজিত হয়ে জানতে চাইলেন ভাস্কো।

কোহেলো বলল, 'বণিক এস্তাদিও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না এলেও তাঁর জাহাজের ক্যাপ্টেন পেরো আর জাহাজের চিকিৎসক ফ্রান্সিস নামের একটা লোক আমার কাছে এসেছিলেন সাক্ষাৎ করতে ও পরামর্শ করতে।'

ভাস্কো জানতে চাইলেন, 'কী বলল তারা?'

কোহেলো এরপর বেশ কিছু সময় ধরে ভাস্কোকে বিবৃত করল তাদের

BanglaBook.org

সঙ্গে কোহেলোর কথোপকথন। খবরটা শুনে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন ভাস্কো। এস্তাদিও তাঁর দুঃসম্পর্কে আত্মীয় হয়। সেই সুবাদে প্রায় এস্তাদিওর ছেলেবেলা থেকেই ভাস্কোর পরিচিত। তাকে স্নেহও করেন তিনি। পর্তুগিজদের শরীরে যৌনক্ষুধা একটু বেশি ঠিকই, কিন্তু এস্তাদিওকে ছেলেবেলা থেকে চেনার সুবাদে ভাস্কো এতদিন জেনে এসেছিলেন যে, অন্য পর্তুগিজ নারিকদের থেকে এস্তাদিওর চরিত্র ভিন্ন প্রকৃতির। নারীদেহের প্রতি এস্তাদিওর কোনও আসক্তি নেই। বেশ্যা সঙ্গ তো অনেক দূরের ব্যাপার। যে কারণে এস্তাদিও একটু নরম স্বভাবের হলেও ভাস্কোর প্রিয় পাত্র ছিল সে। ভাস্কো ভরসা করেছিলেন তার ওপর। আর সেই এস্তাদিও কিনা সামান্য একজন বন্দরবেশ্যার জন্য স্বয়ং ভাস্কোর আদেশও অমান্য করতে দ্বিধা করছেনা! এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই তো? এ প্রশ্নটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন ভাস্কো। একসময় সে-প্রশ্নর উত্তর খোঁজার জন্য এক সময় ভাস্কো, কোহেলোকে প্রশ্ন করলেন, 'আর কিছু? আর কিছু তোমাকে বলেছে সান্টা মারিয়ার ক্যাপ্টেন?'

কোহেলো মাথা চুলকে বলল, 'না, আর তেমন কিছু নয়। তবে একটা জিনিস তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় ভেবে আপনাকে বলিনি। তা হল ক্যাপ্টেন পেরো বলছিল যে, বণিক এস্তাদিও আর বেশ্যা মৎস্যগন্ধা নাকি একটা প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ থেকে একটা সিন্দুক উদ্ধার করে গণিকালয়ে এনে রেখেছে।'

'সিন্দুক, কীসের সিন্দুক?' সোজা হয়ে বসলেন অ্যাডমিরাল।

কোহেলো বলল, 'তা ক্যাপ্টেনও বলতে পারেনি। তবে সিন্দুকটা নাকি বেশ ভারী। খচ্চরের পিঠে বহন করে গণিকালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটা প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ আছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী থাকত সেখানে। সেই অতিবৃদ্ধ সিংহলে ফিরে যাবার পর বণিক এস্তাদিও আর গণিকা রাতের অন্ধকারে পরিত্যক্ত মঠ থেকে সেই সিন্দুক উদ্ধার করে আনে। এটুকু কথাই শুধু আমাকে জানিয়েছেন ক্যাপ্টেন পেরো।'

কোহেলোর বলা এস্তাদিওর সিন্দুক উদ্ধারের কথাটা এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল ভাস্কোর মনে। তাঁর যেন মনে হতে লাগল, কী একটা ব্যাপার যেন তিনি মনে করেও করতে পারছেন না, বুঝে উঠেও বুঝে উঠতে পারছেন না। তবে একটা কথা ভাস্কোর মনে হতে লাগল, যে-ব্যাপারটা তিনি মনে করেও ঠিক মনে করতে পারছেন না, সে ব্যাপারটা যেন তার গতবারের ভারত অভিযানের সঙ্গে যুক্ত। বারবণিতার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে এস্তাদিওর

BanglaBook.org

ভাস্কোর নির্দেশ অমান্য করার ঘটনার চেষ্টার থেকেও এস্তাদিওর সিন্দুক উদ্ধারের ঘটনাটা ভাস্কোর মনে বেশি আলোড়ন তৈরি করল। এবং ব্যাপারটা যে কী তা বুঝেও বুঝে উঠতে না পেরে একটা অস্বস্তিবোধ কাজ করতে লাগল ভাস্কোর মনে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি কোহেলোকে বললেন, 'তুমি এখন যাও। অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছ, বিশ্রাম নাও। প্রয়োজন হলে তোমাকে ডেকে পাঠাব।'

কোহেলো বলল, 'আমি জাহাজেই রাত্রিবাস করব।'—কথাটা বলে মাথা ঝুঁকিয়ে ভাস্কোকে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল কোহেলো। সে চলে যাবার পর ভাস্কো তাঁর খাস ভৃত্যকে বললেন, 'আমার ঘরে একটা বড় মোমবাতি জ্বালিয়ে দাও। যতক্ষণ না আমি বলব ততক্ষণ যেন আমার ঘরে কেউ না ঢোকে, আমাকে বিরক্ত না করে। এমনকী রাতের খাবার দেবার জন্যেও না ডাকে।'

ভাস্কোর নির্দেশ পালিত হল। তাঁর শয়নকক্ষে টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে গেল ভৃত্য। ভাস্কো সে ঘরে প্রথমে দরজাতে খিল দিলেন। শয়নকক্ষেরই একপাশের দেওয়ালের গায়ের খোপে সার সার রাখা আছে নানা নথি, জাহাজের লগবুক, সেখানে ধরা আছে ভাস্কোর ইতিপূর্বে ভারত অভিযানের সময়কার নানা তথ্য। ভাস্কো তাক থেকে সেসব নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। তারপর সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন। খোলা জানলা দিয়ে সমুদ্রর বাতাস প্রবেশ করছে ঘরে। মোমবাতির শিখাটা মাঝে মাঝে কাঁপছে। তার আলোতে নথিগুলোর পাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চললেন ভাস্কো। রাত বেড়ে চলল।

এক সময় তাঁর হাতে উঠে এল এস্তাভাওর জাহাজের লগবুকটা । সেখানে স্বয়ম্ভুনাথের জাহাজ ধ্বংসের ব্যাপারটার বিবরণ লেখা আছে ঘটনার শুরু থেকেই। অর্থাৎ গণিকা নারীদের নিয়ে স্বয়ম্ভুনাথের এস্তাভাও-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাঁর পালানো থেকে শুরু করে তাঁর ময়ূরপঙ্খি ধ্বংস করার ঘটনা পর্যন্ত। একথাও সেখানে লেখা আছে যে পরদিন সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটার আশেপাশে অনেক মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখা গেলেও তার মধ্যে স্বয়ম্ভুনাথের মৃতদেহ ছিল না। সমুদ্রের সেই অংশের জল স্থির ছিল। তাই মৃতদেহগুলো জাহাজটার থেকে বেশি দূরে যেতে পারেনি।

সমকালীন 'ডি কোস্টা' নামের একটা জাহাজের লগবুক থেকে ভাস্কো

BanglaBook.org

এরপর জানতে পারলেন, যে-রাত্রে স্বয়ম্ভুনাথের ময়ূরপঙ্খিকে ডোবানো হয় তার পরদিন পর্তুগিজ পণ্যবাহী জাহাজের সঙ্গে একটা ছোট জাহাজের সাক্ষাৎ হয়। সে জাহাজে কিছু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ ছিল। তারা নাকি তমালিকা বন্দরে ফিরছিল!

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সেখান থেকে সংগ্রহ করলেন। সেটা অবশ্য জাহাজের লগবুক ঘেঁটে নয়, এদেশ থেকে পর্তুগালে পাঠানো একটা রিপোর্ট সেটা। কালিকট বন্দর থেকে শেষবার ভাস্কোকে পালাতে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু কন্নোরে তিনি কয়েকজন অনুচর ছেড়ে গেছিলেন। সামোরিনের শত্রু কন্নোররাজ, রাজনৈতিক কারণেই শত্রুশিবিরের খবর রাখার চেষ্টা করতেন। তাঁর মাধ্যমেই রিপোর্টটা পৌঁছেছিল পর্তুগালে। সে রিপোর্টে নানা কথার মধ্যে লেখা আছে যে, ভাস্কো চলে যাবার পর কালিকট শান্ত হলে সামোরিনের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি টাঙানো হয় বন্দরে। তাতে বলা হয় 'মৃচ্ছকটিক গণিকাপোতের মালিক স্বয়ম্ভুনাথের সন্ধান কেউ দিতে পারলে তাকে একশো স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।' খোলা জানলা দিয়ে আসা সমুদ্র-বাতাসে মোমবাতির শিখাটা মৃদু মৃদু কাঁপছে। যে-তথ্যগুলো দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে সংগ্রহ করলেন এতক্ষণ, তার ওপর ভিত্তি করে অতীতের ছেঁড়া সুতোগুলো নতুন করে গাঁথবার চেষ্টা করতে লাগলেন ভাস্কো।

BanglaBook.org

সামোরিন হঠাৎ স্বয়ম্ভুনাথের খোঁজে বিজ্ঞাপন দিতে গেলেন কেন? এমন হয়নি তো যে, সামোরিনই ওই সিন্দুক স্বয়ম্ভুনাথকে দিয়েছিলেন? স্বয়ম্ভু নাথের জাহাজ-ডুবি হলেও এটা তো হতেই পারে যে, রাত্রির অন্ধকারে তিনি ওই সিন্দুকসমেত পালিয়ে ছিলেন এবং ওই বৌদ্ধ জাহাজে সেটা পৌঁছে দিয়েছিলেন, যা নিয়ে বৌদ্ধরা চলে যায় তমালিকা বন্দরে। সারারাত ভাবার পর ভাস্কো এমনই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। আর যদি এমন না-ও হয়ে থাকে তবুও ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে ক্ষতি কী? কী আছে ওই সিন্দুকে? সোনা? নাকি কোনও গোপন দলিল দস্তাবেজ?

রাত্রিশেষে একসময় ভোরের আলো ফুটতে শুরু করল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন ভাস্কো। ব্যাপারটা তাঁকে তদন্ত করে দেখতে হবে। সকাল হতে না হতেই তিনি লোক পাঠালেন কোহেলোকে ডেকে পাঠাবার জন্য।

ভাস্কোর ডাক পেয়ে যথাসম্ভব দ্রুত হাজির হয়ে গেল কোহেলো। ভাস্কো তাকে বললেন, 'কালই আবার তোমাকে রওনা হতে হবে তমালিকা বন্দরের

দিকে। গ্রেপ্তার করে আনতে হবে এস্তাদিওকে। তবে কৌশলে। এ নিয়ে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কোনও বিবাদে যাওয়া চলবে না। কারণ ওই অঞ্চলে আমার একটা বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হলে সে কাজ ব্যাহত হতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এস্তাদিওদের কাছে যে-সিন্দুক আছে সেটা উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে তোমাকে। তার জন্য যা করার তা করবে। তবে সবটাই কৌশলে। প্রয়োজনে সান্টা মারিয়ার ক্যাপ্টেন আর বণিক দিয়াগোর সাহায্য নেবে তুমি। সিন্দুকটা যদি উদ্ধার করতে পারো তবে সেটা খুলবে না। তার ভিতরে কী আছে তা কাউকে দেখতে দেবে না। কাপড়ে মুড়ে গালা দিয়ে মোহর করে সেটা আমার কাছে নিয়ে আসবে। ভাবতে পারো এ-কাজের দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে তোমার একটা পরীক্ষা নিচ্ছি আমি। কাজটা যদি ঠিকভাবে তুমি করতে পারো তবে তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কোনওদিন চিন্তা করতে হবে না তোমাকে।'

ভাস্কোর নির্দেশ শুনে কোহেলো বলল, 'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব আপনার নির্দেশ পালন করার।

ভাস্কো এরপর খাজাঞ্চিকে ডেকে কোহেলোকে তার সমুদ্রযাত্রার খরচ দিয়ে দিতে বললেন। পরদিন ভোরবেলা কোহেলো তার রণপোত নিয়ে গোয়া ছেড়ে সমুদ্রে ভাসল তমালিকার উদ্দেশ্যে।

BanglaBook.org

১৬

রানির মৃত্যুর পর প্রায় একমাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে। তার মৃত্যুশোকে বেশ কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে মৎস্যগন্ধা। এবং তা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রতিনিয়ত তাকে সঙ্গ দিয়েছে এস্তাদিও। যৌনতা নয়, প্রতিনিয়ত সে মৎস্যগন্ধাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যা ঘটবার তা ঘটে গেছে। আর তারা দুজনে তো নতুন জীবন তৈরি করতে চলেছে। এটা ঠিকই যে রানির মৃত্যু মৎস্যগন্ধার জীবনে এক অপূরণীয় ক্ষতি। কিন্তু শোক আঁকড়ে ধরলে তো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। জীবনে দুঃখ আছে, কিন্তু জীবন থেমে থাকে না। এগিয়ে চলার নামই জীবন। আর মৎস্যগন্ধা মোটেই একা নয়। এস্তাদিও তার সঙ্গে আছে। আমৃত্যু সে তার সঙ্গে থাকবে। যে কারণে ভবিষ্যত জীবনের ঝুঁকি

নিয়েও সে অগ্রাহ্য করেছে স্বয়ং ভাস্কোর নির্দেশ। জীবনে-মরণে মৎস্যগন্ধার সঙ্গী এস্তাদিও। আর কিছুদিনের মধ্যেই তো সে মৎস্যগন্ধাকে নিয়ে নতুন দেশে চলে যাবে। যেখানে তারা দুজন ঘর বাঁধবে। রানির মৃত্যুর পর মৎস্যগন্ধা সবার সঙ্গে কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। এমনকী এস্তাদিও যখন তার ঘরে আসত তখনও সে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত তার জানলার নীচে রানির কবরের দিকে। মর্মর সেই কবরের ওপর সমুদ্র-বাতাস পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দেয়, রাতের চন্দ্রিমা স্নিগ্ধ আলো ছড়ায়, সমুদ্রের জল জোয়ারের সময় স্নান করিয়ে দিয়ে যায় রানির কবরকে। জানলায় বসে নিশ্চুপভাবে এসবই শুধু দেখত মৎস্যগন্ধা। তবে এস্তাদিওর প্রচেষ্টায় আবার সব কিছু স্বাভাবিক হতে চলেছে। বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর গণিকালয়ের দরজা আবার খুলেছে, খদ্দেরের আনাগোনা আবার শুরু হয়েছে। অবশ্য খদ্দের সামলানো থেকে শুরু করে গণিকালয়ের মেয়েদের দেখভালের কাজ এখন শ্যামাই করছে। অত্যন্ত জরুরি কোনও বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন হলে তবেই সে মৎস্যগন্ধাকে বিরক্ত করে।

সেদিন বিকেলে এস্তাদিওর জন্য নিজের কক্ষে অপেক্ষা করছিল মৎস্যগন্ধা। আজ এস্তাদিওর এক বণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তারপর মৎস্যগন্ধার কাছে আসার কথা। সে বণিকের বেশ কয়েকটা জাহাজ আছে। রঘুপতি নামে সেই বণিক এক সময় মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ের খদ্দের ছিল। লোকটা বৃদ্ধ হয়েছে এখন। আর সমুদ্রযাত্রায় যাবে না সে। জাহাজগুলো বেচে দিতে চায়। তারই একটা কেনার ব্যাপারে তার সঙ্গে আলোচনা করতে যাওয়ার কথা এস্তাদিওর। নতুন জাহাজ আর তমালিকা বন্দরে বানানো হয় না। কারণ এই ক্ষয়িষ্ণু বন্দরে জাহাজ কেনার লোক আজকাল আর পাওয়া যায় না। যারা জাহাজ বানায় তারা চার-পাঁচ পুরুষ আগেই পাড়ি দিয়েছে সাতগাঁও বা চট্টগ্রামে। বাংলার প্রধান বন্দর তো এখন সেগুলোই। তাছাড়া নতুন জাহাজ বানাতে অন্তত চারমাস সময় লাগে। ততদিন আর এ-বন্দরে থাকতে রাজি নয় মৎস্যগন্ধা।

পালঙ্কে বসেছিল প্রতীক্ষারত মৎস্যগন্ধা। শ্যামা এসে প্রবেশ করল তার ঘরে। মৎস্যগন্ধা তাকে দেখে জানতে চাইল, 'কিছু বলবি?'

মৎস্যগন্ধার কথার জবাবে শ্যামা বলল, 'গত রাতে হংসরাজ এসেছিল আমার ঘরে।'

হংসরাজ, অর্থাৎ শ্যামার সেই নাগর।

BanglaBook.org

কথাটা শুনে মৎস্যগন্ধা বলল, 'ও, তুই নাটক দেখতে যেতে চাস বুঝি?'

শ্যামা জবাব দিল, 'না।' তারপর হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, পর্তুগিজরা নাকি ভালো লোক হয় না?'

প্রশ্নটা শুনে মৎস্যগন্ধা বেশ অবাক হয়ে গেল। কার ব্যাপারে আশঙ্কিত হয়ে প্রশ্নটা করছে তা অবশ্য বুঝতে অসুবিধা হল না মৎস্যগন্ধার। সে বলল, 'ভালো, খারাপ সব জাতের মানুষের মধ্যেই আছে। তোর মনে হঠাৎ এ-প্রশ্ন জাগল কেন? নাবিককে কি তোর খারাপ লোক বলে মনে হয়?'

শ্যামা বলল, 'আমার তো তাকে ভালো মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু হংসরাজের কাছ থেকে কাল একটা ব্যাপার শুনলাম।'

'কী শুনলি?' কৌতূহলের সঙ্গে জানতে চাইল মৎস্যগন্ধা।

শ্যামা বলল, 'জমিদারের সেরেস্তায় নাকি আলোচনা হচ্ছিল আপনার নাবিককে নিয়ে। সেখানে জমিদার ছিলেন, নগরপাল ছিল, শুল্ক দারোগা ছিল, আরও অনেকেই ছিল। হংসরাজ বলল, তারা নাবিকের এখানে এতদিন থাকা নিয়ে আলোচনা করছিল। তাদের ধারণা নাবিক নাকি শুধু আপনার জন্য নয়, আসলে অন্য কোনও মতলবে এ-বন্দরে পড়ে আছেন। আপনার কাছে যাওয়া-আসা নাকি শুধুমাত্র বাইরের লোককে ধোঁকা দেবার জন্য। শুল্ক দারোগা জমিদারকে বলেছে যে, নাবিক নাকি একদিন ভরা দুপুরে গিয়ে নানা ব্যাপারে খোঁজখবর করছিল। বন্দরে কত জাহাজ আসে? কত আয় হয়? ইত্যাদি ব্যাপারে। আরও কয়েকজন স্থানীয় বণিকও নাকি একই ব্যাপার জানিয়েছে তাঁকে...

শ্যামার কথা শুনে মৎস্যগন্ধার মনে পড়ে গেল, এস্তাদিও যখন প্রথমবার তার কাছে এসেছিল তখনও এমন নানা প্রশ্ন করেছিল তাকে।

শ্যামা বলল, 'ব্যাপারটা নিয়ে জমিদার খুব চিন্তিত। কারণ পর্তুগিজরা নাকি এদেশের যে সবজায়গাতে গেছে সেখানেই স্থানীয় লোকদের সঙ্গে তাদের লড়াই-ঝগড়া হয়েছে। এদেশে তারা নাকি ইতিমধ্যে বেশ কিছু জায়গা দখল নিয়েছে, প্রচুর মানুষকে খুনও করেছে। আসলে এরা জলদস্যু। নেতার নাম ভাস্কো ডা গামা। সে নাকি ভয়ঙ্কর লোক। জমিদার ভয় পাচ্ছেন এই কারণে যে, হঠাৎ যদি পর্তুগিজরা এসে হামলা করে তখন কী হবে? তারা নাকি নারীদের ধরে নিয়ে যায়। ছোট ছোট ছেলেদের ধরে নিয়ে যায় বীভৎসভাবে। একটা সরু লম্বা শিক ছেলেদের হাতের তালু ফুটো করে তার মধ্যে ঢুকিয়ে

BanglaBook.org

একসঙ্গে গেঁথে তারপর তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। ক্রীতদাস হিসাবে তাদের দূরদেশে বিক্রি করার জন্য। সেরেস্তার কারো কারো ধারণা, এমনও হতে পারে যে, নাবিকের পিছনে নৌবহর আছে, তারা সমুদ্রে অপেক্ষা করছে।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'আর কী আলোচনা হয়েছে?'

শ্যামা বলল, 'যতটুকু শুনলাম তাতে তারা হয়তো কথা বলবে নাবিকের সঙ্গে। হয়তো বা নাবিককে বন্দর ছেড়ে চলে যেতে বলবে।'

'আর কিছু জেনেছিস এ-ব্যাপারে?'

শ্যামা বলল, 'না, আর কিছু নয়।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'হংসরাজকে বলবি, এ ব্যাপারে আর কিছু শুনলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তোকে জানায়। এর জন্য তাকে পয়সাও দেব আমি।'

শ্যামা হেসে বলল, 'না, তাকে পয়সা দেবার দরকার হবে বলে মনে হয় না। লোকটা আমাকে ভালোবাসে। আমি বললে সে কথা রাখবে। আমি তাকে বলে রাখব।

শ্যামা চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই মৎস্যগন্ধার কাছে এসে উপস্থিত হল এস্তাদিও। একেবারে ঘেমে নেয়ে এসেছে সে। পালঙ্কে বসে টুপি খোলার পর মৎস্যগন্ধা তাকে হাতপাখার বাতাস করতে করতে বলল, 'কী কথা হল বণিকের সঙ্গে?

এস্তাদিও বলল,'হ্যাঁ, সে আমাকে জাহাজ বিক্রি করতে রাজি। জাহাজটা ছোট হলেও বেশ শক্তপোক্ত। সমুদ্রযাত্রার উপযোগী। শুধুমাত্র একটা পাল নাকি একটু মেরামত করতে হবে। বৃদ্ধ বণিক শেষজীবনে এক রূপসিকে বিয়ে করেছে। তরুণী তার কাছে বায়না করেছে একটা হীরকখণ্ডের জন্য, যেটা সে কণ্ঠহারে পরবে। লোকটার টাকা চাই না। একটা হীরকখণ্ড চাই। লোকটাকে হীরে দিলেই সে জাহাজটার কাগজ আমার হাতে দিয়ে দেবে।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'তুমি দ্রুত সব কাজ সেরে ফেলো। বিপদ অন্য দিক থেকেও আসতে পারে বলে মনে হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের তমালিকা বন্দর ছেড়ে চলে যাওয়া দরকার।'

এস্তাদিও বিস্ময়াভূত হয়ে জানতে চাইল, 'অন্য দিকের বিপদ মানে?'

মৎস্যগন্ধা, এস্তাদিওকে বলল শ্যামার মুখে সদ্য শোনা কথা গুলো।

খবরটা শুনে এস্তাদিও বলল, 'পেড্রো আমাকে কিছুদিন আগে বলেছিল বটে যে, শুল্ক বিভাগের একটা লোক নাকি আমার ব্যাপারে খোঁজখবর করছিল

BanglaBook.org

তার কাছে। এবার বুঝলাম ব্যাপারটা।'

এরপর একটু থেমে সে বলল, 'এবার বাকি রইল জাহাজের চালক আর নাবিকদের সংগ্রহ করার ব্যাপারটা। তাতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না। কর্মহীন, বেকার, ভবঘুরে, নাবিকের দল তো সব বন্দরেই ঘুরে বেড়ায়, এখান থেকে বেরিয়ে আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের আড্ডায় যাব।'

সব যদি ঠিক থাকে তবে হয়তো এ-বন্দর ছাড়তে এক সপ্তাহের বেশি দেরি হবে না?

মৎস্যগন্ধা জানতে চাইল, 'আমাকে নিয়ে কোন দিকে পাড়ি দেবে তুমি?'

খোলা জানলা দিয়ে বন্দরের দিকে তাকিয়ে এস্তাদিও বলল, 'যদিও এখনও তা নির্দিষ্টভাবে ঠিক করিনি। কিন্তু ভাবছি ভূমধ্যসাগরের দিকে কোনও দ্বীপে চলে যাব। নানা, ছোট ছোট দ্বীপ আছে ওদিকে। শান্ত, চারপাশে সমুদ্রঘেরা দ্বীপগুলো। স্থানীয় লোকজনও খুব নিরীহ প্রকৃতির। চাষবাস আর পশুপালন নিয়ে থাকে। কারও সঙ্গে কোনও বিবাদে যাব না। কোনও সময় যদি কোনও জাহাজ সেখানে ভেড়ে তবে তাদের মিষ্টি জল সংগ্রহ করে দেবার বিনিময়ে টাকাপয়সা নয়, কাপড় ইত্যাদি কিছু জিনিসপত্র পায়, তাতেই তারা খুশি। আমি একবার এমনই এক দ্বীপে মিষ্টি জল সংগ্রহের জন্য নেমেছিলাম। অলিভ আর নারকেলগাছে ঘেরা ছবির মতো সুন্দর দ্বীপ। সমুদ্রের ঊর্মিমালা এসে চুম্বন করে যায় তার সোনালি বালুতটকে। গাছে গাছে কত পাখি। স্থানীয় দ্বীপবাসীরা ছোট ছোট জেলে ডিঙি নিয়ে মাছ ধরে। আমার খুব ভালো লেগেছিল সেই দ্বীপটা। ইচ্ছা হলে সেখানেও যাওয়া যেতে পারে। আমি চিনতে পারব সে জায়গা।'

মৎস্যগন্ধা, এস্তাদিওর হাতদুটো জড়িয়ে ধরল। তার চোখে ভেসে উঠল তার স্বপ্নে দেখা সেই দ্বীপের ছবি। সেখানে সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত সোনালি বালুতটে দাঁড়িয়ে আছে সে আর এস্তাদিও। মৎস্যগন্ধা বলে উঠল, 'যেন আমি এমন একটা দ্বীপের ছবি স্বপ্নে দেখেছি। তাহলে চলো আমরা সেখানেই যাই?'

এস্তাদিও বলল, 'তবে তাই হবে। ওর কাছাকাছি আরও বেশ কিছু ছোট ছোট দ্বীপ আছে। তেমন হলে ওখানে যাবার পর আশেপাশের কোনও দ্বীপেও বসতি গড়ে তুলতে পারি আমরা।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের কাছে যা অর্থ আছে তা দিয়ে অনায়াসে আমরা একটা দ্বীপ কিনতে পারি।'

BanglaBook.org

এস্তাদিও বলল, 'কেনার দরকার নেই। এসব মালিকানাহীন দ্বীপ। শুধু দখল নিলেই হবে। সে-দ্বীপে বসতি স্থাপন করে দ্বীপের একটা নতুন নামকরণ করব।'

'কী নাম? জানতে চাইল, মৎস্যগন্ধা।

এস্তাদিও হেসে বলল, 'দ্বীপের নাম হবে "মৎস্যগন্ধা"। দ্বীপের পাশ দিয়ে যখন কোনও জাহাজ ভেসে যাবে তারা তখন দূর থেকে দ্বীপটাকে দেখিয়ে বলবে, 'ওই দেখো, ওই দ্বীপের নাম হল "মৎস্যগন্ধা"। কালের নিয়মে আমরা হয়তো একদিন থাকব না। কিন্তু দ্বীপের নামটা থেকে যাবে।'

এস্তাদিওর কথা শুনে মৎস্যগন্ধার খুব ভালো লাগলেও সে এস্তাদিওর মুখে আঙুল চাপা দিয়ে বলল, 'এখনই এসব মৃত্যুর কথা বোলোনা। আমার পুনর্জন্ম হতে চলেছে। তোমাকে নিয়ে আমার আরও হাজার বছর বাঁচার ইচ্ছে।'

এস্তাদিও হেসে ফেলল তার কথা শুনে। এ যেন তমালিকা বন্দরের গনিকালয়ের মালিকিণী মৎস্যগন্ধা নয়, যে প্রয়োজনবোধে রাস্তায় কোমর থেকে ছুরি খুলে ঝাঁপিয়ে পড়তেও পিছপা হয় না, যে অক্লেশে শায়েস্তা করতে পারে নাবিক-খদ্দেরদের। এ-মৎস্যগন্ধা যেন শিশুর মতো সরল এক মেয়ে। নিষ্পাপ এক নারী।

বেশ কিছুক্ষণ পরস্পরকে আলিঙ্গন করে সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল তারা দুজন। আলো সরে আসতে লাগল বাইরে। এক সময় এস্তাদিও বলল, 'আমাকে এবার উঠতে হবে। নাবিকদের মহল্লা হয়ে ঘরে ফিরতে হবে। নইলে দেরি হয়ে যাবে।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'হ্যাঁ, যাও। তবে যাবার আগে হীরকখণ্ডটা নিয়ে যাও। সম্ভব হলে কালই সেই বনিকের কাছে গিয়ে তার বিনিময়ে জাহাজের দখল নাও। বলা যায় না মানুষের মন কখন ঘুরে যায়!'

এস্তাদিও বলল, 'হ্যাঁ, দাও।'

মৎস্যগন্ধা পালঙ্কের নীচে গিয়ে ঢুকল পেটিকা খুলে হীরকখণ্ড বের করে আনার জন্য। এস্তাদিও গিয়ে দাঁড়াল জানলার সামনে। বাইরে সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। তারই মধ্যে বন্দরে নোঙর করা জাহাজ-নৌকাগুলোর ভিড়ে তার জাহাজটাকেও দেখতে পেল এস্তাদিও। সেদিন ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিসকে ফিরিয়ে দেবার পর থেকে তারা আর কেউ দেখা করতে আসেনি এস্তাদিওর সঙ্গে। আর এস্তাদিও-ও তাদের ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখায়নি। মৎস্যগন্ধা একদিন বলছিল যে, সান্টা মারিয়ার

BanglaBook.org

নাবিকরাও নাকি আর এখন গণিকালয়ে আসে না। হয়তো বা ক্যাপ্টেনের নির্দেশেই তারা এখানে আসা বন্ধ করেছে। তবে একটা দিক থেকে সে ব্যাপারটা ভালোই। তাতে চরবৃত্তির সুযোগ কম। ক্যাপ্টেন পেরো নিশ্চই এস্তাদিওর খবরাখবর রাখার ব্যাপারে আগ্রহী। তার জাহাজটার দিকে তাকিয়ে এস্তাদিও ভাবল, জাহাজটা এখনও বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে কেন? তার জন্যই কি ক্যাপ্টেন এখনও সত্যি অপেক্ষা করছেন? নাকি এখনও তাদের বন্দর ত্যাগ না করার পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে?'

সিন্দুক থেকে বেশ কয়েকটা হীরের টুকরো বের করে আনল মৎস্যগন্ধা। এস্তাদিও বলল, 'এতগুলো কী হবে?'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'আরও কয়েকটা রেখে দাও। যদি হঠাৎ করে কোনও প্রয়োজন পড়ে তখন কাজে লাগবে।'

নাবিকরা মূল্যবান জিনিস লুকিয়ে রাখার জন্য নানারকম ফন্দিফিকির করে রাখে। এস্তাদিওর জামার ওপর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঝুলের যে জামাটা চাপানো আছে তার বড় বড় বোতামগুলো আসলে ফাঁপা, মূল্যবান রত্ন লুকিয়ে রাখার জন্য। সেই বোতামগুলোর প্রতিটাতে একটা করে হীরের টুকরো ভরে নিল এস্তাদিও। তারপর মৎস্যগন্ধার কপালে চুমু খেয়ে কক্ষ ত্যাগ করল।

এস্তাদিও যখন পথে নামল তখন অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। বন্দর অঞ্চল ফাঁকা হতে শুরু করেছে। ঝাঁপ বন্ধ হতে শুরু হয়েছে গুদামঘরগুলোর। কিছুটা এগিয়ে নদীর পাড় বরাবর চলতে শুরু করল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে জায়গাটাতে পৌঁছে গেল। তমালিকা বন্দরের সবচেয়ে ঘিঞ্জি আর নোংরা অঞ্চল এটা। ঢুকলেই নাকে পূতিগন্ধ লাগে। চারপাশে শুধু আবর্জনার স্তূপ এখানে। তমালিকা অঞ্চলের সবচেয়ে সহায়সম্বলহীন মানুষদের বসবাস এখানে। কর্মহীন নাবিক, মাতাল আর ভবঘুরের দল। নদী বরাবর গেছে সার সার খোপের মতো খোলার ঘর। দারিদ্র এতটাই যে অনেক ঘরের দরজা পর্যন্ত নেই। অবশ্য হয়তো বা তার দরকারও নেই। হয়তো সম্পত্তি বলতে কোনও ঘরে আছে খড়ের বিছানা। শুধু রাতে ঘুমোবার জন্যই এই ঘরগুলো ব্যবহার করা হয়। দিনেরবেলা এখানকার পুরুষরা কাজের আশায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে বন্দরে, যেভাবে বেশ্যারা দাঁড়িয়ে থাকে খদ্দেরদের আশায়। তবে এখানকার লোকগুলোর অবস্থা বেশ্যাদের থেকেও খারাপ। দৈবাৎ যদি কোনও কাজ মিলে যায় তবে দিনের শেষে তারা সেই টাকা দিয়ে মদ আর

BanglaBook.org

রুটি কেনে। এভাবেই তাদের খেয়ে না-খেয়ে দিন কেটে যায়। এসব নাবিকদেরই দরকার এস্তাদিওর। যাদের কোনও ঘরসংসার বা পিছুটান নেই। পয়সা দিলে যারা এস্তাদিওর সঙ্গে সমুদ্রে ভেসে পড়তে দ্বিধা করবে না।

অন্ধকার রাস্তায় কোথাও কুকুরের দল খাবারের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, গরু বা ষাঁড়েরা রাস্তা আটকে কোথাও শুয়ে জাবর কাটছে। খোলার ঘরগুলো অধিকাংশই অন্ধকারে ডুবে আছে। দু-একটা ঘরে হয়তো বা টিমটিমে বাতি জ্বলছে। এদেশের নাবিকদের মধ্যে তেঁতুলবিচি দিয়ে এক ধরনের জুয়া খেলা হয়, হয়তো তেমনই খেলা হচ্ছে সেখানে। এসবের পাশ কাটিয়ে এস্তাদিও উপস্থিত হল মহল্লার শেষপ্রান্তে বেশ বড় একটা কাঠের ঘরের সামনে। এখানে এস্তাদিও কখনও না এলেও স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর মুখ থেকে সে শুনেছে এই জায়গার কথা। বিরাট ঘরটার জানলার ভিতর থেকে আলো আর লোকজনের কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসছে। এস্তাদিও প্রবেশ করল ঘরটাতে। বেশ বড় একটা ঘর। অনেক লোক সেখানে বসে আছে মদের পাত্র নিয়ে। দু-একজন লোক আবার মাতাল হয়ে গড়াগড়িও দিচ্ছে মেঝেতে। এঘরে যারা বসে আছে তাদের পোশাক দেখলেই বোঝা যায়, তারা সমাজের নিম্নবর্ণের লোক। মাঝে মাঝে ঘরের একোণ-ওকোণ থেকে ভেসে আসছে মাল্লাসুলভ অশ্লীল গালিগালাজও। দরজার পাশেই এই নিকৃষ্ট পানশালার মালিক বসে আছে একটা কাঠের আসনে। তার চারপাশে থরে থরে রাখা নানা আকারের কাঠের তৈরি সস্তা মদের পিপে। কর্মচারীদের সে নানারকম নির্দেশ দিচ্ছে। এস্তাদিও সে-ঘরে প্রবেশ করতেই দোকান মালিক একটু বিস্মিত হয়ে গেল। সাধারণত ভদ্রজনের পদার্পণ ঘটে না তার এই শুঁড়িখানায়। ব্যাপারটা কী?'

এস্তাদিও সটান গিয়ে হাজির হল তার সামনে। তারপর প্রশ্ন করল, 'তোমার এখানে ভালো মদ আছে?'

লোকটা বলল, 'এখানে ভালো মদ তো থাকে না। কেনার লোক কই? হ্যাঁ, তবে অনেকদিন আগে এক ভিনদেশি নাবিক আমাকে কিছুটা দামি মদ দিয়েছিল। সেটা আমি আপনাকে দিতে পারি।'

এস্তাদিও বলল, 'হ্যাঁ, দাও।' কথাটা বলে একটা চকচকে রুপোর টাকা ঠক করে রাখল দোকানদারের সামনে। এতটা আশা করেনি দোকানদার। টাকাটা নিয়ে সে তার উঁচু আসনের নীচে হাত ঢুকিয়ে মদপূর্ণ একটা ছিপি-আঁটা কাচের বোতল বের করে তার সামনের কাঠের পাটাতনের ওপর রাখল।

BanglaBook.org

এস্তাদিও বলল, 'সুরাপানের জন্য দুটো পাত্র আনো।'

দোকানির নির্দেশে দুটো পাত্রও চলে এল। রংচটা দুটো মাটির বাটি। মদ পরিবেশনের জন্য এর চেয়ে ভালো পাত্র তাদের কাছে আর নেই। অন্য যারা এখানে খাচ্ছে তারা সব মাটির ভাঁড়েই খাচ্ছে।

দুটো পাত্রে নিজের হাতেই মদ ঢালল এস্তাদিও। তারপর একটা পাত্র দোকানদারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও। তুমিও পান করো।'

বেশ খুশি হল পানশালার মালিক। একে তো সে না চাইতেই একটা গোটা রুপোর টাকা পেয়েছে, তার ওপর আবার মদের ভাগও পাচ্ছে!

সুরাপূর্ণ বাটিটা হাতে নিয়ে এস্তাদিওকে ধন্যবাদ জানিয়ে পানশালার মালিক বলল, 'আমি কী আপনাকে কোনও সাহায্য করতে পারি?'

এস্তাদিও প্রশ্ন করল, 'তোমার এখানে কি কোনও নাখোদা আসে যে সমুদ্রে জাহাজ চালাতে পারে?'

পানশালার মালিক বলল, 'হ্যাঁ, একজন আছে। ওই যে ওই কোনায় বসে পান করছে। ওর নাম আব্বাস। একসময় ও বড় বড় জাহাজ নিয়ে জাভা, মরক্কো এমনকী মোম্বাসা বন্দর পর্যন্ত গেছে। তবে বেশ কয়েক বছর কোনও কাজ নেই।'

এস্তাদিও জানতে চাইল, 'ওর সঙ্গে কথা বলা যাবে?'

পানশালার মালিক বলল, 'হ্যাঁ, কথা বলুন।'

এস্তাদিও পানপাত্র আর সুরাপূর্ণ পাত্রটা নিয়ে হাজির হল ঘরের কোনায় বসে থাকা লোকটার সামনে। প্রায় বৃদ্ধ হতে চলেছে সেই লোকটা। তবে নাখোদা বা নাবিক যত বেশি বয়সি হয় ততই তাদের অভিজ্ঞতাও বেশি হয়। লোকটার মাথায় একটা ছেঁড়া জাহাজি টুপি আর পরনে লম্বা ঝুলের নোংরা পোশাক। তবে তার শিরাওঠা পেশিবহুল হাতগুলো যে এখনও সক্ষম তা দেখলে বোঝা যায়।

এস্তাদিও তার সামনে পাত্রটা নামিয়ে রেখে বসল। লোকটা একবার তাকাল এস্তাদিওর দিকে। তারপর চীনামাটির বাটিটা গলায় ঢেলে দিয়ে বলল, 'ফলের রসের তৈরি খাঁটি মদ বলে মনে হচ্ছে। কতদিন পর এ মদ খেলাম। শেষ এমন মদ খেয়েছিলাম মনে হয় মোম্বাসা বন্দরে বছর দশেক আগে।'

এস্তাদিও বলল, 'তুমি ভূমধ্যসাগরে জাহাজ চালিয়েছ?'

লোকটা হেসে বলল, 'তবে মোম্বাসা বন্দরে গেলাম কীভাবে?'

BanglaBook.org

এস্তাদিও জানতে চাইল, 'এখন আর জাহাজে ওঠো না কেন তুমি?'

আব্বাস নামের প্রাক্তন নাখোদা বলল, 'এখন আর এ বন্দর থেকে তেমন জাহাজ ছাড়ে কই? আমি যে জাহাজের নাখোদা ছিলাম তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। অবশ্য কেউ কেউ আমাকে বড় নৌকাতে কাজ করার কথা বলেছিল। কিন্তু আমি রাজি হইনি। যে একদিন বড় বড় জাহাজ নিয়ে দূর দেশে বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছে সে কিনা আজ কাপড়ের গাঁটরি পৌঁছে দিতে যাবে সাতগাঁ বন্দরে? যত বড় নৌকাই হোক, আসলে তো সেটা নৌকাই। আমি রাজি হইনি। নাখোদার পদমর্যাদার আত্মাভিমান ফুটে উঠল লোকটার গলাতে। এর পর সে তাকাতে লাগল মদপূর্ণ কাচপাত্রের দিকে। তা দেখে এস্তাদিও বলল, 'এটা তোমার জন্যই। নিঃসংকোচে পান করতে পারো।'

বোতলটা তুলে নিয়ে লোকটা সটান মদ ঢালল গলাতে। তারপর তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বলল, 'তুমি কে বলো তো? কোন দেশের লোক?'

এস্তাদিও বলল, 'আমি পর্তুগিজ বণিক এস্তাদিও। বেশ কিছুদিন তমালিকা বন্দরে আছি।'

ভূতপূর্ব নাখোদা তার পরিচয় পেয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল, 'ও, আপনি সেই পর্তুগিজ বণিক! আপনার কথা শুনেছি। তবে আজ প্রথম দেখলাম।'

এস্তাদিও তাকে প্রশ্ন করল, 'তোমার সমুদ্রে আবার জাহাজ নিয়ে ভাসতে ইচ্ছা করে না?'

আব্বাস বলল, 'করে তো। আজও আমাকে সমুদ্র ডাকে। কিন্তু জাহাজ কই? কত দূর দূর দেশে আমি গেছি। এখন তো চোখ বন্ধ করে সেসব দিনগুলোর কথাই ভাবি।'

এস্তাদিও এবার বললে, 'শোনো আব্বাস। খুব দ্রুত আমি একটা ছোট জাহাজ নিয়ে ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দেব। তুমি সে জাহাজের দায়িত্ব নেবে? মোটা টাকাও দেব তার জন্য।'

আব্বাস আবার কাচপাত্র থেকে সুরা ঢালতে যাচ্ছিল মুখে, কিন্তু এস্তাদিওর কথা শুনে তার হাত নেমে গেল। বিস্মিত ভাবে সে বলে উঠল, 'আপনি সত্যি বলছেন? মশকরা করছেন না তো? জাহাজ আর তার সঙ্গে টাকা পেলে এই আব্বাস পৃথিবীর যে কোনও জায়গায় যেতে পারে। তা আপনার জাহাজটা কই? চলুন, এখনই একবার দেখে আসি।' কথাগুলো বলে প্রচণ্ড উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়াল লোকটা।

BanglaBook.org

এস্তাদিও তাকে বসতে বলে বলল, 'জাহাজটা বন্দরেই আছে। তবে এখনও আমার হস্তগত হয়নি। সম্ভবত কালই হয়ে যাবে। তারপর তোমাকে জাহাজ দেখাতে নিয়ে যাব। সামান্য কিছু মেরামতিও করতে হতে পারে। সে-কাজের তদারকিও তোমাকেই করতে হবে। আরও একটা বড় ব্যাপার আছে। জনা কুড়ি মতো নাবিকও তোমাকে সংগ্রহ করতে হবে। সে কাজ তুমি পারবে তো?'

আব্বাস বলল, 'নিশ্চই পারব। নিশ্চই পারব। কত নাবিক এখানে কাজের জন্য ঘুরে বেড়ায়। কাজের কথা শুনলে তারা বর্তে যাবে।'

এস্তাদিও হেসে বলল, 'ঠিক আছে। এই মুহূর্ত থেকেই তোমাকে আমি আমার জাহাজের নাখোদা বা ক্যাপ্টেন পদে বহাল করলাম।' কথাটা বলে এস্তাদিও উঠে দাঁড়িয়ে পোশাকের ভিতর থেকে একটা রেশমের থলি বার করে বাড়িয়ে দিল তার দিকে। বেশ কিছু টাকা আছে তাতে।

এস্তাদিও বলল, 'কাল সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর, তখন তুমি জাহাজঘাটায় আসবে। আমি তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা করব।'

আব্বাসও উঠে দাঁড়াল। মাথার থেকে টুপি খুলে অভিবাদন জানিয়ে সে বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর আমি আজ রাত থেকেই নাবিক সংগ্রহের কাজে নেমে পড়ছি। কাল সূর্য মাথার ঠিক ওপরে ওঠার অনেক আগেই আমি জাহাজঘাটায় উপস্থিত থাকব।'

এস্তাদিও এরপর শুঁড়িখানা ছেড়ে বাইরে যাবার জন্য দরজার দিকে তাকাল। ঠিক তখনই সে দেখতে পেল পেড্রো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল এস্তাদিও। সে এখানে কেন? পেড্রোর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। পেড্রোও বুঝতে পারল তার, তথাকথিত মনিব তাকে দেখেছেন। সে হাসি ফুটিয়ে তুলল তার মুখে। পানশালার মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল এস্তাদিও। পেড্রোকে প্রশ্ন করল 'তুমি এখানে?'

BanglaBook.org

পেড্রো ভালোমানুষের মতো বলল, 'প্রভু যিশুর দয়ায় আর মাতা মেরির আশীর্বাদে আপনি আশ্রয় দেবার আগে আমি তো এই ভবঘুরে নাবিকদের আস্তানাতেই থাকতাম। এখানে এক পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আপনি এখানে এলেন। তাই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। যদি আপনি আমার সঙ্গে ঘরে ফেরেন।'

এস্তাদিও তার কথা বিশ্বাস করল। তারপর তাকে নিয়ে এগোল ঘরে ফেরার জন্য।

ঘরে ফিরে এল এস্তাদিও। তাকে খাবার পরিবেশন করার সময় পেড্রো জানতে চাইল। 'আপনি কী আবার বাইরে বেরোবেন?'

পেড্রোর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে অসুবিধা হল না এস্তাদিওর। অন্যদিন সে মৎস্যগন্ধার কাছেই রাত কাটায়। তাই কথাটা জানতে চাইছে পেড্রো।

সে জবাব দিল 'না। ঘরেই থাকব। আজ সারা দিন অনেক পরিশ্রম গেছে।'

নৈশ আহার শেষ করে বিছানাতে শুয়ে পড়ল এস্তাদিও। কিছু সময়ের মধ্যেই ঘুম নেমে এল তার চোখে। পেড্রো কিন্তু ঘুমোল না। বাতি [illegible] সে প্রতীক্ষা করতে লাগল কারও জন্য।

একসময় তার প্রতীক্ষার অবসান হল। রাত্রির প্রথম প্রহরে নদীর পাড় থেকে শিয়ালের ডাক ভেসে আসার পরই দরজায় কে যেন মৃদু টোকা দিল। পরপর তিনবার। এটাই সংকেতধ্বনি। শব্দটা শোনামাত্রই পেড্রো উঠে গিয়ে নিঃশব্দে পাল্লা দুটো একটু ফাঁক করে তার মধ্যে দিয়ে গলা বের করল। তার সামনে অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে কালো কাপড়ে নিজেকে মুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন। যদিও টুপি আর নাক পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা তার দেহ, তবুও তাকে চিনতে অসুবিধা হল না পেড্রোর। লোকটা সান্টা মারিয়া জাহাজের চিকিৎসক, ক্যাপ্টেন পেরোর বিশ্বস্ত অনুচর ফ্রান্সিস। মাঝে মাঝেই লোকটা এস্তাদিওর ব্যাপারে খবর নিতে আসে তার কাছে। তাকে দেখে পেড্রো চাপা স্বরে বলল, 'তিনি কিন্তু আজ ঘরেই আছেন।'

ফ্রান্সিস বলল, 'তাই নাকি! কোনও খবর আছে?'

পেড্রো বলল, 'আজ তিনি স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কাছে গেছিলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করেছিলাম। সে ব্যবসায়ী নাকি তার জাহাজ বিক্রি করবে বলে শুনলাম। তা কেনার জন্যই সম্ভবত এস্তাদিও কথা বলতে গেছিলেন। কারণ, তারপর তিনি মৎস্যগন্ধার গণিকালয় হয়ে ভবঘুরে নাবিক-মাল্লাদের পানশালাতে

BanglaBook.org

গেছিলেন। সেখানে আব্বাস নামের এক আরব নাখোদার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলতে দেখেছি। আমার ধারণা তিনি জাহাজ কিনে তমালিকা বন্দর ত্যাগ করে অন্য কোনও বন্দরে চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।'

'ফ্রান্সিস জানতে চাইল, 'কোন বন্দরে?'

পেড্রো বলল, 'তা আমার জানা নেই। এবার আপনি যান, তিনি জেগে উঠতে পারেন।'

ফ্রান্সিস বলল, 'আচ্ছা। তবে নতুন কোনও খবর হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবে।'

পেড্রো দরজা বন্ধ করে দেবার পর ফ্রান্সিস দ্রুত এগোল নদী পাড়ের দিকে। আজই একজন কোহেলোর অনুচর নৌকা নিয়ে এসে খবর দিয়ে গেছে, কোহেলো ফিরেছেন। ফ্রান্সিসের জন্য অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন পেরো। ফ্রান্সিস ফিরলেই তিনি তাকে নিয়ে রওনা হবেন ক্যাপ্টেন কোহেলোর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য।

১৭

শেষপর্যন্ত দুটো হাতি ভাড়া করে আনতে হল এস্তাদিওকে। যদিও জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীবক্ষে, তবুও দীর্ঘদিন চড়াতে থাকার ফলে মকরবাহিনীর নীচের অংশটা বেশ কিছুটা গেঁথে আছে কাদার মধ্যে। হ্যাঁ, জাহাজটার নাম 'মকরবাহিনী'। এস্তাদিওকে, মৎস্যগন্ধা বলেছে এটা নাকি এক হিন্দু জলদেবীর নাম। দিন তিনেক আগেই জাহাজটা হস্তগত হয়েছে এস্তাদিওর। কোনও সমস্যা হয়নি। দুদিন ধরে কিছুটা মেরামত করা হয়েছে জাহাজটা। আরও কোনও কাজ আছে কিনা তা বোঝা যাবে জাহাজ জলে ভাসার পর। আর এইসব কাজেরই তদারকি করছে নাখোদা আব্বাস। লোকটা কর্মঠ। এস্তাদিও ভুল লোককে নির্বাচন করেনি।

সকালবেলা। বন্দর অঞ্চলে বেশ লোকজন আছে। যদিও জাহাজটা যে জায়গাতে আছে সেটা জাহাজঘাটার থেকে বেশ কিছুটা তফাতে। তবুও হাতিদুটো আসার সময় তাদের পিছু পিছু বেশ কিছু লোক হাজির হয়ে গেছে জাহাজটার কাছে। কর্মহীন ভবঘুরের দল আর কিছু বাচ্চাকাচ্চা। যাদের কোনও

BanglaBook.org

কাজ নেই। বন্দর এলাকায় ঘুরে ঘুরে নানা জিনিস দেখে বেড়ায় তারা।

জাহাজটার কাছেই দাঁড়িয়ে এস্তাদিও। আজ পেড্রোকেও সে সঙ্গে এনেছে। আব্বাসের নির্দেশে জাহাজের বিভিন্ন অংশে কাছি বাঁধা চলছে। সে নির্দেশ দিচ্ছে, 'বড় কাছিটা ফোর মাস্টের সঙ্গে বাঁধো। ক্যাপ্টেনের রশিটা একটু হালকা করো, দেখো, রশি টানতে গিয়ে জাহাজ হেলে না যায়'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

একসময় রশি বাঁধার কাজ শেষ হল। হাতিদুটো টানতে শুরু করল জাহাজের রশি। আর দুপাশে মজুরেরা রশি ধরে রেখেছে যাতে জাহাজ কোনও দিকে হেলে না যায়। হাতিগুলো বেশ কয়েকবার হ্যাঁচকা টান দেবার পর দীর্ঘদিনের ঘুম ভেঙে প্রথমে কেঁপে উঠল জাহাজটা। তারপর মড়মড় করে নেমে গেল জলে। ভালো করে তাকে জলে ভাসাবার জন্য নদীর ভিতর বেশ আরও কিছুটা টেনে নিয়ে যাওয়া হল তাকে। এবার সত্যিই জলে ভাসল মকরবাহিনী। উল্লাসধ্বনি করে উঠল সবাই। আব্বাস জলের মধ্যে ভাসতে থাকা জাহাজটাকে এপাশ-ওপাশ থেকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে বলল, 'সব ঠিকই আছে মনে হয়। খোলের গায়ে বা পাটাতনের জোড়ে যদি কোনও ছিদ্র থাকে তবে তা তামা আর আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে দিলে ঠিক হয়ে যাবে। পালও সেলাই হচ্ছে, চিন্তার কোনও কারণ নেই।' আব্বাসের নির্দেশে কয়েকজন নাবিক এবার সাঁতরে উঠে পড়ল জাহাজে। জোয়ারের জলে যাতে জাহাজটা ভেসে না যায় সেজন্য জলে নোঙর ফেলে দিল তারা।

আব্বাস এরপর বলল, 'আমি এখন থেকে জাহাজেই থাকব। এমনকী রাতেও। যাত্রা শুরুর আগে খুঁটিনাটি নানা জিনিস পরীক্ষা করে নিতে হবে। আপনি রসদপত্তর জাহাজে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। সেগুলো আমি তুলে নেব।'

এস্তাদিও বলল, 'ঠিক আছে, আমি এখন ফিরে যাই। ঘরে ফিরে আবার কাজে বেরোতে হবে।' কথাগুলো বলে পেড্রোকে নিয়ে নদীর পাড় বরাবর হাটতে শুরু করল বন্দরে ফেরার জন্য। চলতে চলতে পেড্রো এবার তাকে জিগ্যেস করল, 'জাহাজটা কিনলেন কেন? কোথায় যাবেন এ-জাহাজ নিয়ে?'

এস্তাদিও বলল, 'শোনো পেড্রো, তোমাকে এবার কথাটা জানাই। আমি মনস্থির করেছি, আমি আর পর্তুগালে ফিরব না। সে-দেশে আমার কেউ নেই। হয়তো বা অতি দ্রুত আমি এ-বন্দর ছেড়ে চলে যাব। আমার সঙ্গে থাকলে তোমার দেশে ফেরা হবে না। সান্টা মারিয়া এখনও বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো বা আমার জন্যই অপেক্ষা করে আছে তারা। তুমি তাদের কাছে চলে

BanglaBook.org

যাও। তাদের জানিয়ে দিও আমার জন্য তারা যেন অপেক্ষা না করে তোমাকে নিয়ে ফিরে যায়। তুমি এতদিন আমাকে সঙ্গ দিলে। ঘরে ফিরে তোমার প্রাপ্য বেতন আমি মিটিয়ে দিচ্ছি।'

তার কথা শুনে পেড্রো তার কণ্ঠে ছদ্ম দুঃখের ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, 'ঠিক আছে, তবে তাই হবে। ভেবেছিলাম, আপনার সঙ্গেই সারাজীবন থাকব। কিন্তু তা আর হল না। আমি নিরুপায়। দীর্ঘদিন আমি দেশছাড়া, আমাকে দেশে ফিরতেই হবে।'

ঘরে ফিরে এল তারা দুজন। পেড্রোকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিল। কুম্ভীরাশ্রু মোচন করে এস্তাদিওর থেকে বিদায় নিয়ে পেড্রো এগোল বন্দরের দিকে।

পেড্রোর ইচ্ছা ছিল যে, নৌকা ধরে সান্টা মারিয়াতে গিয়ে উঠবে। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হল না। যে দেখতে পেল নৌকা থেকে বন্দরে নামছেন ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হল তাদের সামনে। ক্যাপ্টেন কোহেলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আগের রাতেই সান্টা মারিয়াতে ফিরেছে তারা। বণিক দিয়াগোও ছিলেন সেখানে। কোহেলো তাঁদের ভাস্কোর নির্দেশের কথা জানিয়েছিলেন। ধূর্ত জলদস্যু কোহেলো একটু বাড়িয়েই ক্যাপ্টেনকে বলেছে কথাগুলো। যাতে কাজটা করার জন্য চাপ তৈরি হয় ক্যাপ্টেনের মনে। তাদের কোহেলো বলেছে যে, এস্তাদিওকে যদি বন্দি করে গোয়াতে নিয়ে যাওয়া না যায়, বিশেষত, যদি ওই সিন্দুক উদ্ধার না করা যায়, তবে ক্যাপ্টেন পেরোদের পক্ষে পর্তুগালে ফেরার ব্যাপার তো দূরের কথা, ভবিষ্যতে এস্তাদিওকে সাহায্য করার অপরাধে সান্টা মারিয়ার সব নাবিকদের জাহাজের মাস্তুল থেকেও ঝুলিয়ে দেওয়া হতে পারে, যেমন ভাস্কোর নির্দেশে বহু মানুষকে ঝোলানো হয়েছে।

ব্যাপারটা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেছেন ক্যাপ্টেন পেরো আর তার সঙ্গীরা। কীভাবে কাজটা সম্পন্ন করা যায় তা নিয়ে সারারাত ধরে উপায় খোঁজার চেষ্টা করেছেন দুজন মিলে। উপায় অবশ্য তেমন মেলেনি। আর তাই সকালবেলা তারা চলে এসেছেন পেড্রোর খোঁজে, যদি তার থেকে কোনও সংবাদ পাওয়া যায় আর তার থেকে যদি কোনও পথ বার করা যায় সেজন্য।

পেড্রোর কাঁধে তার বিছানাপত্তর দেখে অবাক হলেন ক্যাপ্টেন পেরো। জানতে চাইলেন, 'তুমি চললে কোথায়?'

পেড্রো জবাব দিল, 'আপনাদের জাহাজেই উঠতে যাচ্ছিলাম।'

BanglaBook.org

ফ্রান্সিস বলল, 'কেন? এস্তাদিও কী তোমাকে তাড়িয়ে দিল?'

তার প্রশ্ন শুনে পেড্রো নদীর ধারে মাঝি-মাল্লাদের ঝড়-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য যে ফাঁকা ছাউনিগুলো আছে সেগুলো দেখিয়ে বলল, 'চলুন, ওর নীচে বসে কথা বলা যাক।'

তিনজনে কোলাহল থেকে দূরে সরে গিয়ে ছাউনির নীচে বসল। পেড্রো খুলে বলল সব কথা। ক্যাপ্টেন শুনে প্রশ্ন করলেন, 'কবে সে এ-বন্দর ছাড়ছে, আর কোথায়ই বা যাচ্ছে?'

পেড্রো জবাব দিল, 'সম্ভবত খুব দ্রুত। কারণ যা বুঝলাম তাতে আজ-কালের মধ্যেই জাহাজে রসদ ওঠানো শুরু হবে।

কোথায় যাচ্ছেন তা তিনি আমাকে বলেননি। তবে নদীপথে গেলে তো বড় নৌকা হলেই চলতো। তাছাড়া বন্দর অঞ্চলে নাবিক মহল্লাতে থাকার সুবাদে আমি ওই নাখোদা আব্বাসকে চিনি। এস্তাদিও যদি সমুদ্রযাত্রা না করতেন তবে সে কিছুতেই রাজি হত না তাঁর সঙ্গে যেতে। সমুদ্রে জাহাজ চালাত বলে লোকটার মধ্যে একটা অহংবোধ আছে। লোকটা বন্দর অঞ্চলে প্রায় না খেয়ে এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছে কিন্তু নদীপথে কোনওদিন জাহাজ বা নৌকা চালায়নি। আমার ধারণা, নদীপথ দিয়ে মোহানায় গিয়ে তারা সাগরে পাড়ি দেবে।'

পেড্রোর কথা শুনে চকিতে একটা ভাবনা খেলে গেল ক্যাপ্টেন পেরোর মাথায়। তিনি বললেন, 'তোমাকে আবার ফিরে যেতে হবে এস্তাদিওর কাছে। তারপর যা করতে হবে তা তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যা বলব তা যদি তুমি করতে পারো তবে দেশে ফেরার বন্দোবস্ত তোমার পাকা। আর তার সঙ্গে আর্থিক পুরস্কার জুটে যাবার সম্ভবনাও প্রচুর। একটা কথাই শুধু মনে রেখো যে, আমরা যা করছি, তোমাকে যা করতে বলছি, তা আমাদের সর্বময় কর্তা অ্যাডমিরাল ভাস্কোর নির্দেশেই করছি।'

একথা বলার পর ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস মিলে পেড্রোকে বুঝিয়ে দিলেন তাকে কী কী করতে হবে। সবকিছু বুঝে নেবার পর পেড্রো আবার রওনা হয়ে গেল এস্তাদিওর আস্তানায় ফেরার জন্য। আর ক্যাপ্টেন পেরোও রওনা হয়ে গেলেন জাহাজে ফেরার জন্য। পেড্রো যখন এস্তাদিওর বাড়িতে পৌঁছোল তখন অবশ্য এস্তাদিও ঘর ছেড়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। পেড্রো অপেক্ষা করে রইল এস্তাদিওর ফিরে আসার জন্য।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বন্দর সংলগ্ন বাজারের পথে হাঁটছিল এস্তাদিও। অনেক

BanglaBook.org

রসদ সংগ্রহ করতে হবে তাকে। তারপর সেগুলো বলদের গাড়িতে চাপিয়ে পাঠাতে হবে নদীর পাশে। যেখান থেকে নৌকাতে রসদ তোলা হবে জাহাজে। শেষ কাজটা অবশ্য আব্বাস-ই করবে।

বাজারের পথে হাঁটতে হাঁটতে এস্তাদিও একটা চালের আড়তে ঢুকতে যাচ্ছিল, ঠিক সেইসময় হঠাৎই একদল অশ্বারোহী এসে ঘিরে ধরল তাকে। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা লোকগুলোর মধ্যে দুজনকে সে চিনতে পারল। একজনের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। শুল্ক দারোগা। আর অন্যজনের সঙ্গে এস্তাদিওর পরিচয় না থাকলেও লোকটাকে সে বন্দর অঞ্চলে রক্ষীবাহিনী নিয়ে টহল দিতে দেখেছে। লোকটা নগরপাল। এস্তাদিও তাদেরকে এভাবে ঘিরে ধরতে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল। শুল্ক দারোগা আর নগরপাল এস্তাদিওর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তারপর দারোগা তাকে প্রশ্ন করল, 'তোমার কাজ তো অনেকদিন হয়ে গেছে? কবে তমালিকা বন্দর ছাড়বে তুমি?'

প্রশ্নটা শুনে এস্তাদিও হেসে বলল, 'আপনাদের আর আশঙ্কিত হবার কোনও কারণ নেই। আমি নতুন একটা জাহাজ কিনেছি—'মকরবাহিনী'। যথাসম্ভব দ্রুত তমালিকা বন্দর ছেড়ে চলে যাব আমি। আর যে-জাহাজটায় আমি এসেছিলাম সে জাহাজকে আমি অনেক দিন আগেই ফিরে যেতে বলেছিলাম। তারা ফেরেনি কেন বা কবে ফিরবে সেটা তাদের ক্যাপ্টেন বলতে পারবেন। সে ব্যাপারে আমার আর কোনও দায় নেই। সান্টা মারিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে।

শুল্ক দারোগা বললেন, 'তুমি দ্রুত ফিরে যাবে বলতে কী বোঝাচ্ছ তা আমরা জানি না। জমিদারের নির্দেশ আগামী তিন দিনের মধ্যে বন্দর ত্যাগ করে চলে যেতে হবে তোমাকে। নইলে নৌকায় চাপিয়ে মোহনায় নিয়ে গিয়ে তোমাকে আমরা ছেড়ে আসব।'

এস্তাদিও বলল, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

শুল্ক দারোগা জানতে চাইলেন, 'নতুন জাহাজে এখান থেকে কী কী পণ্য নিয়ে যাচ্ছ তুমি?'

এস্তাদিও জবাব দিল, 'ব্যবসার জন্য কোনও পণ্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। শুধু নাবিকদের খাবারের জন্য রসদ নিয়ে যাচ্ছি।'

জবাবটা শুনে শুল্ক দারোগা তাকালেন নগরপালের দিকে। একটা কৌতুকের হাসি যেন ফুটে উঠল দারোগার ঠোঁটের কোণে। কোটাল এবার তাঁর গোঁফ

BanglaBook.org

চুমড়ে বললেন, 'আমরা শুনতে পাচ্ছি; গণিকা মৎস্যগন্ধাও নাকি তোমার সঙ্গে যাচ্ছে? তার গণিকালয় নাকি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আগামীকাল থেকে?'

দারোগারা ব্যাপারটা কী করে অনুমান করল তা আন্দাজ করতে পারল এস্তাদিও। সে তার গণিকালয় ত্যাগ করার কথা ঘোষণা না করলেও আগামীকাল থেকে যে দরজা বন্ধ থাকবে তা জানিয়ে দিয়েছে। যাত্রা শুরুর আগে তারও কিছু প্রস্তুতির দরকার। যাতে সে-কাজে কোনও বিঘ্ন না ঘটে সেজন্যই মৎস্যগন্ধা এ-নির্দেশ দিয়েছে, আর মৎস্যগন্ধার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা তো বন্দর অঞ্চলে এখন সবাই জানে।

নগরপালের কথা শুনে চুপ করে রইল এস্তাদিও। কিন্তু কোটাল এরপর যা বললেন তাতে চমকে উঠল এস্তাদিও। তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারটা কিন্তু আমরা হতে দেবনা। এ বন্দর এখন মরে গেছে বললেই চলে। তেমন জাহাজও আর আসে না। সব চলে যায় সাতগাঁ বা চট্টগ্রামে। যে-ক'টা জাহাজ এখানে আসে তার মধ্যে বেশিরভাগই আসে ওই মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ের টানে। সে যদি ব্যবসা বন্ধ করে চলে যায় তবে জাহাজ আসবে না। সে-ব্যাপারটা আমরা হতে দেব না। কাল থেকে আমাদের লোক থাকবে জাহাজের কাছে। তুমি যদি মৎস্যগন্ধাকে নিয়ে জাহাজে ওঠার চেষ্টা করো তবে জমিদারের নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের দুজনকে কয়েদ করা হবে। কথাটা মনে থাকে যেন।'

কথাগুলো বলার পর তাঁরা আর দাঁড়ালো না। এস্তাদিওকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তারা ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে গেল অন্যদিকে।

খবরটা মৎস্যগন্ধাকে তাড়াতাড়ি দিতে হবে। বাজারে যে-কাজ ছিল তা দ্রুত সেরে ফেলার চেষ্টা করল এস্তাদিও। সে বুঝতে পারল, পণ্য কেনার ব্যাপারে তার তাড়াহুড়ো দেখে বাড়তি দর হাঁকছে দোকানীরা। কিন্তু দরদাম করে নানা আড়ত ঘুরে মাল কেনার সময় আর এস্তাদিওর হাতে নেই। ফলে কিছুটা চড়া দামেই রসদ সংগ্রহ করে তার জাহাজ যেখানে আছে সেদিকে বলদের গাড়ি করে পাঠাতে পাঠাতেই বিকেল হয়ে গেল। আর তারপরই সে ছুটল মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ে।

ঘর্মক্লান্ত এস্তাদিও মৎস্যগন্ধার ঘরে ঢুকল। তাকে দেখেই মৎস্যগন্ধা প্রশ্ন করল, 'জাহাজের খবর কী?'

এস্তাদিও ঘাম মুছতে মুছতে জবাব দিল, 'জাহাজ জলে ভেসেছে আজ।'

কথাটা শুনেই মৎস্যগন্ধার মুখে হাসি ফুটে উঠল ঠিকই কিন্তু এর পরক্ষণেই

BanglaBook.org

এস্তাদিওর মুখমণ্ডলে চিন্তার ভাব ফুটে উঠতে দেখে সে জানতে চাইল, 'জাহাজ জলে ভেসেছে। কিন্তু তোমার মুখ গম্ভীর কেন?'

এস্তাদিও বলল, 'জমিদারের লোকজন তোমাকে বন্দর ছেড়ে যেতে দেবে না বলছে। তুমি বেশ্যালয় বন্ধ করলে জাহাজ আসা বন্ধ হয়ে যাবে, তাই।' এস্তাদিও এরপর দারোগা আর কোটালের সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথাটা বিস্তারিত ভাবে জানাল তাকে।

কথাগুলো শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মৎস্যগন্ধার মুখ। সে এস্তাদিওর হাতদুটো আঁকড়ে ধরে বলল, 'তবে কী হবে? আমার কী মুক্তি নেই এই পাপপুরী থেকে? সারাজীবন কী আমাকে বন্দর সুন্দরী হয়েই কাটাতে হবে? আমাকে রেখেই কী চলে যেতে হবে তোমাকে? ওরা তো তোমাকে এ-বন্দরেও আর থাকতে দেবে না বলছে!'

এস্তাদিও মৎস্যগন্ধার মাথায় আশ্বাসের হাত রেখে বলল, 'তুমি চিন্তা কোরো না। কোনও একটা উপায় বের করতে হবে আমাদের। সমস্যা একটাই, হাতে সময় বড় কম। আর তোমার এই গণিকালয়ের দরজা খোলা রাখো। তাহলে জমিদারের লোকজনের সন্দেহ একটু কাটতে পারে। তুমি গণিকালয় ত্যাগ করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ যেন বুঝতে না পারে, তুমি এ-জায়গা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছ।'

মৎস্যগন্ধা এবার বলল, 'আরও একটা কাজ করা যেতে পারে। আমাদের গণিকাদের দেবতা কার্তিকেয়। আমার এ গণিকালয়ে খুব ধূমধাম করে কার্তিকেয়র পুজো করা হয়। গরিব দুখীকে পেট পুরে খাওয়ানো হয়। ঢেড়া পিটিয়ে সে-খবর জানিয়ে দেওয়া হয় বন্দরের ভবঘুরে মহল্লায়। এখানে এ পুজোর জন্য কোনও গ্রহ-নক্ষত্র-তিথি আমার মানি না। সুবিধামতো পুজো করি। আমি কালই ঢেরা পিটিয়ে দিচ্ছি যে, সাতদিন পর কার্তিকেয়র পুজো হবে এখানে। তবে আমি দেবতার নাম করে লোক ঠকাব না। পুজোর সব ব্যবস্থা করেই যাব। নির্দিষ্ট দিনেই পুজো হবে। কেবল আমিই থাকব না সেদিন। কাল ঢেড়া দিলেই সবাই ভাববে আমার চলে যাবার ব্যাপারটা নেহাতই গুজব ছিল।'

কথাটা শুনে এস্তাদিও বলল, 'ব্যাপারটা মন্দ নয়। তবে তুমি সে-ব্যবস্থাই করো।'

এস্তাদিও এরপর জানলার কাছে গিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল

BanglaBook.org

মৎস্যগন্ধাকে কীভাবে জমিদার লোকদের চোখ এড়িয়ে জাহাজে তোলা যায়, সে ব্যাপারে। সে-চিন্তা করতে করতেই হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ল এস্তাদিওর। শেষ বিকালে সান্টা মারিয়া নোঙর তুলে ধীরে ধীরে নদীপথ ধরে এগিয়ে চলেছে মোহনার দিকে। এস্তাদিওর মনে হল, হয়তো বা কোটাল আর শুল্ক দারোগা তাদের বন্দর ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই তারা বন্দর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন পেরো যাবার আগে তার সঙ্গে দেখা করে যাবেন বললেও হয়তো শেষে আর তার প্রয়োজন বোধ করেননি। ক্রুশলাঞ্ছিত পর্তুগালের রক্তপতাকাটা যতক্ষণ এস্তাদিওর চোখে পড়ল ততক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। এক সময় সান্টা মারিয়া হারিয়ে গেল তার দৃষ্টিপথের বাইরে। এস্তাদিও বুঝতে পারল, জন্মভূমির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল তার। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠিক সেই মুহূর্তে এসে মৎস্যগন্ধা তার গলা জড়িয়ে ধরল। সান্টা মারিয়াকে চলে যেতে দেখে, স্বদেশের সঙ্গে সব সম্পর্কের চিহ্ন মুছে যাওয়াতে এস্তাদিওর বুকে কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা চিন্‌চিনে ব্যথা অনুভূত হচ্ছিল, মৎস্যগন্ধা তার গলা জড়িয়ে ধরতে তা মুছে গেল। এস্তাদিওর চোখের সামনে এখন শুধু মৎস্যগন্ধা আর কল্পনায় ভূমধ্যসাগরের সেই স্বপ্নের দ্বীপ। যেখানে এস্তাদিও হারিয়ে যাবে মৎস্যগন্ধার সঙ্গে। ধীরে ধীরে এস্তাদিওর ঠোঁট নেমে এল মৎস্যগন্ধার ঠোঁটের ওপর। সে এক দীর্ঘ চুম্বন। যেন দুটো দেহ, দুটো মন এক হয়ে গেল সে চুম্বনে। এক অপূর্ব ভালোবাসার অনুভূতি যেন সঞ্চারিত হল দুজনেরই মনে।

এক সময় হুঁশ ফিরল এস্তাদিওর। এখন সুখবিলাসে ডুবে থাকার সময় নয় তার। হাতে মাত্র তিনদিন সময়। যা ব্যবস্থা করার তাকে এর মধ্যেই করতে হবে। মৎস্যগন্ধার ঠোঁট থেকে সে ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে বলল 'এবার আমাকে যেতে হবে। নদীর পারে যেখানে জাহাজটা আছে সেখানে গিয়ে দেখি, রসদগুলো ঠিকমতো সেখানে পৌঁছোল কিনা?'

মৎস্যগন্ধা এস্তাদিওকে আলিঙ্গনমুক্ত করে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি যাও। আজ আর তোমাকে আটকাব না।'

এস্তাদিও এরপর তার থেকে বিদায় নিয়ে গণিকালয় ত্যাগ করে রওনা হল নদীতটের দিকে।

এস্তাদিও যখন তার জাহাজ যেখানে নোঙর করেছে সে জায়গাতে পৌঁছল তখন পৃথিবীর বুকে অন্ধকার নেমেছে। জলের মধ্যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে

BanglaBook.org

তার জাহাজটা। তবে তার ডেকে একটা বাতি জ্বলছে। যেটা জানান দিচ্ছে যে জাহাজে কেউ আছে।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আব্বাসের নাম করে বারকয়েক হাঁক দিল এস্তাদিও। জাহাজের ডেক থেকে আব্বাসের গলা শোনা গেল, 'কে? মালিক? আমি আসছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ থেকে নেমে একটা নৌকা নিয়ে পাড়ে এসে উঠল আব্বাস।

এস্তাদিও তাকে প্রশ্ন করল, 'রসদ ঠিকমতো পৌঁছেছে তো?'

আব্বাস জবাব দিল, 'হ্যাঁ, মালিক। শুধু জল সংগ্রহ করা বাকি। সেটা আমি কাল তুলে নেব। জাহাজটা ভালোই। খুব সামান্য কাজ বাকি আছে। আশা করছি আগামী কালের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যাবে।'

আব্বাস বলে লোকটা বহুদর্শী। এস্তাদিওর কেন জানি মনে হল যে, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে তার সঙ্গে। একটু ভেবে নিয়ে তাই সে আব্বাসকে বলল, 'আচ্ছা, তোমাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি তো?'

নাখোদা আব্বাস হেসে বলল, 'তিনদিনের জন্য হলেও আপনার নুন খেয়েছি। আর যাই হোক বিশ্বাসভঙ্গের কোনও কাজ আমি করব না।'

এস্তাদিও এবার খুলে বলল নগরপাল আর শুল্ক দারোগার ব্যাপারটা। মৎস্যগন্ধাকে তারা বন্দর ছেড়ে যেতে দেবে না। আর মৎস্যগন্ধাকে রেখে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

আব্বাস বেশ কিছুক্ষণ ভাবার পর বলল, 'একটা কাজ করা যেতে পারে। মৎস্যগন্ধা আমাদের সঙ্গে বন্দর থেকে জাহাজে উঠবে না। আমরা এখান থেকে গিয়ে মোহনায় দাঁড়াব। মৎস্যগন্ধা রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে নদীর পাড় বরাবর মোহনার দিকে এগিয়ে নৌকাতে উঠবে। সে নৌকা তাকে পৌঁছে দেবে আমাদের জাহাজে। একবার মোহনার কাছে পৌঁছে গেলে জমিদারের লোকজন আমাদের কিছু করতে পারবে না।'

এস্তাদিও শুনে বলল, 'কিন্তু কার ভরসায় আমি তাকে ছেড়ে যাব? বিশ্বাস করার মতো লোক আমার কই? হয়তো সে মৎস্যগন্ধাকে মোহনায় পৌঁছে দিল না, অথবা জমিদারের লোকের হাতে তাকে ধরিয়ে দিল পুরস্কারের লোভে, অথবা নির্জন নদীতটে রাতে একলা নারীকে পেয়ে আরও খারাপ

BanglaBook.org

কিছু করল, তখন? আমার তো আর ফেরার উপায় নেই।'

এস্তাদিওর কথা শুনে আব্বাস আবারও বেশ কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, 'আপনি অনুমতি দিলে আমি সে দায়িত্ব নিতে পারি। এখান থেকে দু-ক্রোশ দূরে নদীর পাড়ে এক প্রাচীন বটগাছ আছে। মকরসংক্রান্তিতে মেলা বসে সেখানে। বছরের বাকি সময় সে-জায়গা নির্জনই থাকে। মৎস্যগন্ধা নিশ্চই জায়গাটা চেনে। মকরবাহিনীকে পরশু সূর্যাস্তের সময় বন্দর ত্যাগ করতে হবে। জাহাজ এগিয়ে যাবে। আর আমিও অন্ধকার নামলে নৌকা নিয়ে ওই গাছের তলায় অপেক্ষা করব মৎস্যগন্ধার জন্য।'

এস্তাদিও বলল, 'কিন্তু তবে জাহাজ মোহনা পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবে কে?'

নাখোদা আব্বাস বলল, 'ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। ইসমাইল নামে আমার যে সহকর্মী আছে, সে মোহনা পর্যন্ত জাহাজ চালিয়ে নিতে পারবে। পাল খাটালেই তর তর করে মোহনার দিকে বয়ে যাবে জাহাজ। হাল ধরে বসে থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। তারপর মোহনার থেকে সাগরে ভাসার সময় আমি দায়িত্ব নেব।'

এস্তাদিও এরপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'আচ্ছা, এই জাহাজে জিনিস লুকিয়ে রাখার মতো কোনও গোপন জায়গা পাওয়া যাবে?'

আব্বাস প্রশ্ন করল, 'কতটা জায়গা?'

এস্তাদিও হাত দিয়ে পেটিকার আকারটা দেখাল।

আব্বাস বলল, 'চিন্তা নেই। জাহাজের গায়ে যে ফেরানো চোখ আঁকা আছে তার আড়ালে আমি অমন একটা খোপ বানিয়ে দেব। ভিতর থেকে তো সেটা খোলাই যাবে আর বাইরে থেকেও ঠিক ওই চোখের মাঝখানে কাঠের পাটাতনে ধাক্কা দিলেও সেটা পড়ে যাবে। আসলে ওই চোখের জায়গাটা এদেশের মাঝি-মাল্লারা স্পর্শ করে না, দেবতা ভেবে। আমি আগে যে-বণিকের জাহাজ চালাতাম, সে-ও ওখানে খোপ বানিয়ে টাকাকড়ি নিয়ে যেত। আজ রাতেই তবে খোপটা বানিয়ে ফেলব। কেউ জানতে পারবে না।'

এস্তাদিও বলল, 'কাজগুলো যদি সব তুমি করতে পারো তবে তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা থাকবে না। আমাকে ঠিক জায়গামতো পৌঁছে দেবার পর আমি তোমাকে এই জাহাজটা দিয়ে দেব। কিছু অর্থও দেব। যাতে তুমি বাকি জীবনটা তোমার ইচ্ছামতো নিজের জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে, বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াতে পারো।'

BanglaBook.org

নাখোদা হেসে বলল, 'আমি কোনও প্রত্যাশা নিয়ে ও-কাজ করব না। আপনি যে ভরসা করে, বিশ্বাস করে আমার মতো লোককে কাজের দায়িত্ব দিচ্ছেন সে জন্যই করব। রাত বাড়ছে। নদীতট নির্জন হয়ে আসছে। তস্কর লুঠেরা আছে। এবার আপনি ফিরে যান।'

নাখোদা আব্বাসের থেকে বিদায় নিয়ে নির্জন নদীতট থেকে ঘরে ফেরার পথ ধরল এস্তাদিও।

কিন্তু বাড়ির সামনে এসে তার দরজার সামনে পেড্রোকে বসে থাকতে দেখে এস্তাদিও বেশ অবাক হয়ে গেল। তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে টুপি খুলে অভিবাদন জানাল পেড্রো। এস্তাদিও বিস্মিতভাবে বলল, 'তুমি যাওনি! আজ বিকালেই তো সান্টা মারিয়া তমালিকা বন্দর ছেড়ে সমুদ্রের দিকে রওনা দিল!

পেড্রো তার কণ্ঠে কাতরতা ফুটিয়ে বলল, 'তারা আমাকে জাহাজে উঠতে দিল না। ক্যাপ্টেন পেরো বললেন, তিনিই এখন জাহাজের মালিক। আমি পর্তুগিজ হলেও জাহাজের নাবিকদের তালিকাতে আমার নাম নেই। তিনি আমাকে তার জাহাজে নিতে বাধ্য নন। তাছাড়া আপনার ওপর রাগের কারণে আমাকে তারা যথেচ্ছ গালিগালাজ করল, আপনাকেও করল।'

এরপর এস্তাদিওকে পেড্রো বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি দেশে ফেরা আমার কপালে নেই। দোহাই আপনার, আপনি আমাকে তাড়াবেন না। এই তমালিকা বন্দরে আমার আর কেউ নেই। আপনি আমাকে আশ্রয় দিন। আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলুন। বাকি জীবনটা আমি আপনার সেবা করেই দিন কাটাতে পারব। পর্তুগালে ফিরতে না পারি, নিজের দেশের লোকের সঙ্গে তো অন্তত জীবনটা কাটাতে পারব।' এই বলে কাঁদতে শুরু করল সে।

পেড্রোর কথা শুনে আর তার অবস্থা দেখে বেশ মায়া হল এস্তাদিওর। পেড্রো এতদিন সঙ্গ দিয়েছে তাকে। সত্যি লোকটাকে এভাবে ফেলে যাওয়া উচিত হবে না তার। কাজেই এস্তাদিও, পেড্রোকে বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে আমার সঙ্গী করে নিয়ে যাব। আমার সঙ্গেই যাবে তুমি। আমি এখন খুব পরিশ্রান্ত। দ্রুত আমার জন্য রান্নার ব্যবস্থা করো। কাল আমার অনেক কাজ আছে। ভোরবেলা বেরোতে হবে।'

তার কথা শুনে পেড্রো চোখের জল মুছে বলল, 'আপনার অসীম করুণা। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।'

BanglaBook.org

রাতে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে বিছানায় চলে গেল এস্তাদিও। সারা দিনের ক্লান্তিতে মৎস্যগন্ধার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুম নেমে এল তার চোখে।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল এস্তাদিও। আজ তার অনেক কাজ। বিশেষত, একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। মৎস্যগন্ধা তো সেই ভারী সিন্দুকটা বহন করে নদীতটে একলা নিয়ে যেতে পারবে না। আজই তাকে সে-সিন্দুকটা বহন করে জাহাজে নিয়ে তুলতে হবে। পরদিনই তমালিকা বন্দর ছেড়ে চলে যাচ্ছে তারা। যা কাজ করার তা আজই সেরে ফেলতে হবে।

প্রথমে বাজার অঞ্চলে গিয়ে হাজির হল এস্তাদিও। জাহাজে রসদ পৌঁছে গেছে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত কিছু জিনিস কেনা প্রয়োজন। যা সেই অনামী দ্বীপে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া সেই দ্বীপবাসীদের জন্য কিছু উপহারও কিনতে হবে তাকে। যাতে সেই দ্বীপবাসীরা খুশি হয়। ছোট ছোট আয়না, সস্তার অলঙ্কার, কিছু পোশাক, এসব জিনিস।

বাজারে ঢুকেই এস্তাদিও ঢেঁড়া পেটার শব্দ শুনতে পেল। মৎস্যগন্ধা ঢেঁড়া পিটিয়ে সবাইকে খবরটা জানাচ্ছে। প্রথমে একটা ছইঅলা বলদের গাড়ি জোগাড় করল এস্তাদিও। তারপর নানা দোকান ঘুরে মালপত্র বস্তাবন্দি করে বলদের গাড়িতে বোঝাই করতে লাগল। সে কাজ মিটতে মিটতে বেশ দেরি হল। সে-গাড়ি নিয়েই এস্তাদিও রওনা হল মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ের দিকে। গণিকালয়ের পিছনের দরজাতে গিয়ে দাঁড়াল বলদের গাড়িটা।

গতকাল এস্তাদিও কথাগুলো বলে যাবার পর আশঙ্কায় দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি মৎস্যগন্ধা। সারা বাড়িটা এখন ঘুমিয়ে থাকলেও সে জেগে বসেছিল। তার খালি মনে হচ্ছিল যে, যদি জমিদারের লোকদের চোখ এড়িয়ে পালাতে না পারে, তখন কী হবে? এস্তাদিওকে তো জমিদারের নির্দেশে কাল বন্দর ছাড়তেই হবে। তার ফিরে আসার পথও বন্ধ। শেষ মুহূর্তে বিপদটা যে এদিক থেকে আসতে পারে তা জানা ছিল না মৎস্যগন্ধার।

এস্তাদিও তার কক্ষে প্রবেশ করতেই সে ব্যগ্রভাবে জানতে চাইল, 'সমস্যা সমাধানের কিছু উপায় মিলল?'

এস্তাদিও বলল, 'বন্দর থেকে দূরে একটা প্রাচীন বটগাছ আছে নদীর পারে, যেখানে মেলা বসে, সে জায়গা তুমি চেনো?'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'হ্যাঁ, চিনি।'

BanglaBook.org

পালঙ্কে বসে এস্তাদিও এরপর তাকে নাখোদা আব্বাসের পরিকল্পনার কথা খুলে বলল।

মৎস্যগন্ধা শুনে বলল, 'হ্যাঁ, আমি পৌঁছে যেতে পারব সেখানে।'

এস্তাদিও বলল, 'খুব সাবধানে। কেউ যেন টের না পায়। তোমার গণিকালয়ের দরজা কিন্তু আগের মতোই খোলা রাখবে। প্রতিদিনের মতো আজও, কালও সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপমালায় সাজিয়ে তুলবে গণিকালয়। সূর্যাস্তের সময় নোঙর তুলব আমি। আমার জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে যাবার পর যখন তোমার গণিকালয়ে একটার পর একটা প্রদীপ জ্বলে উঠবে তখন সবাই জেনে যাবে যে, তুমি এখানেই রয়ে গেলে। আর তারপর...

মৎস্যগন্ধা বলল, 'ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সিন্দুকটা তো আমি বহন করে নিয়ে যেতে পারব না।'

এস্তাদিও বলল, 'সেটা আমি আজই জাহাজে নিয়ে তুলব।'

মৎসগন্ধা বলল, 'কিন্তু কোনও কারণে যদি জমিদারের লোকরা জাহাজে তল্লাসী চালায়? খোঁজ পেয়ে যায় সেই সিন্দুকের?'

এস্তাদিও বলল, পাবে না। সেটা গোপন স্থানেই থাকবে।'

এস্তাদিও এরপর মৎস্যগন্ধাকে জানাল সেই ফেরানো চোখের আড়ালে গোপন জায়গার ব্যাপারটা।

মৎস্যগন্ধা আশ্বস্ত হল তার কথা শুনে।

এস্তাদিও বলল, 'আজ এই সিন্দুকটা নিয়ে চলে যাবার পর আমি কাল আর তোমার সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসব না। লোকজনের সন্দেহ হতে পারে। তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে কাল মধ্যরাতে জাহাজের ডেকে। তারপর আমরা ভেসে যাব সমুদ্রে।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'সেই নতুন দেশের দিকে, তাই না?' কথাটা বলে চোখের পাতা মুদল মৎস্যগন্ধা। চোখ বন্ধ করে সে যেন দেখার চেষ্টা করল সেই নতুন দেশটাকে। সবুজ একটা দ্বীপ, সোনালি বালুতট, ঊর্মিমালা এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে...

এস্তাদিও মৃদু স্বরে বলল, 'হ্যাঁ। সেই নতুন দেশের দিকে।' তারপর সে ঠোঁট নামিয়ে আনল চোখ বন্ধ করা মৎস্যগন্ধার ঠোঁটের ওপর। মৎস্যগন্ধাও প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরল এস্তাদিওকে। এস্তাদিওর ঠোঁট এরপর ছুঁয়ে যেতে লাগল মৎস্যগন্ধার স্তনবৃন্ত, নাভিকূপ..। মিলেমিশে যেতে লাগল তাদের

BanglaBook.org

দেহ-মন। এই তমালিকা বন্দরে এটাই শেষমিলন তাদের।

এস্তাদিও যখন আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে উঠে বসল তখন সূর্য ডুবে গেছে। এবার পেটিকাটা নিয়ে ফিরতে হবে তাকে। পালঙ্কের নীচ থেকে বাইরে বের করা হল পেটিকাটা। তারপর সেটাকে কাপড়ে মুড়ে ফেলা হল ভালো করে। এবার বিদায় নেবার পালা। সিন্দুকটা কাঁধে তুলে নেবার আগে এস্তাদিও বলল, 'এই যে সিন্দুকটা আমাকে দিচ্ছ এটা নিয়ে যদি আমি তোমাকে ফেলে পাড়ি দিই এখন?'

মৎস্যগন্ধা এ-কথার জবাবে শুধু তার ঠোঁট তুলে ধরল এস্তাদিওর ঠোঁট স্পর্শ করার জন্য। এস্তাদিও সে ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল শেষবারের জন্য। গভীর ভালোবাসা আর বিশ্বাসের চুম্বন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই এস্তাদিও বলদের গাড়িতে সিন্দুকটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল নদীর পাড় বরাবর যেখানে তার জাহাজ আছে, সেদিকে। যতক্ষণ তার বলদের গাড়িতে ঝোলানো বাতিটা অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল, ততক্ষণ মৎস্যগন্ধা চেয়ে রইল তার যাত্রাপথের দিকে।

জাহাজটা যেখানে রাখা আছে তার কাছাকাছি পৌঁছে সে-জায়গাতে নদীর চরে বেশ কয়েকটা মশালের আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতে পেল এস্তাদিও। বলদের গাড়ি নিয়ে এস্তাদিও মশালের আলোকে আলোকিত স্থানে পৌঁছোতেই সেই আলোগুলো ঘিরে ধরল তাকে। জনাদশেক বর্শা আর তলোয়ারধারী লোক। এস্তাদিও গো-শকট থেকে নামতেই তাদের মধ্যে একজন বলল, 'আমরা জমিদারের পেয়াদা। গাড়ির ছইয়ের ভিতর কোনও মেয়ে আছে নাকি আমরা দেখব।'

এস্তাদিও বুঝতে পারল যে, মৎস্যগন্ধারই খোঁজ করছে তারা। যাতে সে রাতের অন্ধকারে জাহাজে উঠে লুকিয়ে থাকতে না পারে তাই পাহারা দেবার জন্য লোক নিয়োগ করা হয়েছে ইতিমধ্যে।

এস্তাদিও বলল, 'দেখো।'

তার মশালের আলো দিয়ে ভালো করে প্রথমে দেখে নিল যে ছইয়ের ভিতরে কেউ আছে কিনা? তারপর নদীর পাড় থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে লক্ষ করতে লাগল এস্তাদিওকে।

এস্তাদিওকে জাহাজ থেকে দেখতে পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকা নিয়ে পাড়ে চলে এল আব্বাস। দূরে দাঁড়ানো জমিদারের পেয়াদাগুলোকে দেখিয়ে

BanglaBook.org

সে বলল, 'আজ ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা এখানে হাজির হয়েছে। সম্ভবত, কাল আমরা নোঙর তুলে চলে না-যাওয়া পর্যন্ত তারা এখানেই থাকবে। তবে চিন্তার কিছু নেই। সব ঠিক আছে। আলোচনামতোই কাজ হবে।'

গাড়োয়ান, এস্তাদিও আর নাখোদা মিলে এরপর মালপত্রগুলো উঠিয়ে ফেলল নৌকাতে। গাড়োয়ানের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতেই সে ফেরার পথ ধরল। নৌকা নিয়ে জাহাজের গায়ে পৌঁছোল এস্তাদিওরা। আব্বাস প্রথমে জাহাজে উঠে রশি ফেলে নৌকা থেকে জিনিসগুলো ডেকে টেনে তুলল। কাপড়-মোড়া সিন্দুকটাও জাহাজে তোলা হল। এস্তাদিও সবশেষে উঠে পড়ল জাহাজে। প্রথমেই সিন্দুকটাকে নামিয়ে আনা হল খোলের ভিতর। কাপড়ের আবরণ খুলে ফেলা হল তার গা থেকে। জাহাজের বাইরের গায়ে চোখটা যেখানে আঁকা তার ভিতরের দিকের পাটাতন সরিয়ে খোলের বাইরের আর ভিতরের পাটাতনের মাঝে রাখা হল সিন্দুকটাকে। চমৎকার জায়গা। ভিতরদিকের পাটাতন আটকে দিলে বোঝাই যাবে না কিছু। দু-দিকের পাটাতন খোলা যায়। বিপদের সময় এই পাটাতন দুটো সরিয়ে জলেও ভেসে যাওয়া যায়।

সিন্দুকটা লুকিয়ে ফেলে ডেকে ফিরে এল তারা। আব্বাস নৌকা করে পাড়ে পৌঁছে দেবার সময় বলল, 'কাল ইসমাইল থাকবে এখানে। চিন্তার কিছু নেই। সে আপনাকে মাঝি-মাল্লাসমেত মোহনায় পৌঁছে দেবে। মৎস্যগন্ধাকে নিয়ে সেখানে আপনার সঙ্গে মিলিত হব আমি।'

আব্বাসের থেকে বিদায় নিয়ে ফেরার পথ ধরল এস্তাদিও। ঘরে ফিরে সে পেড্রোকে বলল, 'কালই এই তমালিকা বন্দর ছেড়ে চলে যাব আমরা।'

১৮

প্রতিদিনের মতোই এদিনও ভোরের প্রথম আলো এসে পড়ল প্রাচীন এই তমালিকা বন্দরে, স্পর্শ করল মৎস্যগন্ধার ঘরের জানলা। ভোর হল বন্দরনগরীর বুকে। মৎস্যগন্ধা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নতুন সূর্য উঠেছে নদীর বুকে, স্নিগ্ধ বাতাস বইছে। নদী পাড়ের গাছগুলোর মাথায় ঘুম ভেঙে পাখির দল ওড়াউড়ি করছে। কুয়াশার আবরণ ধীরে ধীরে সরে গিয়ে ফুটে

BanglaBook.org

উঠছে তমালিকা বন্দর। নতুন সূর্যের দিকে তাকিয়ে মৎস্যগন্ধার মনে হল, জীবনে প্রথম এত সুন্দর সূর্যোদয় দেখল সে। মৎস্যগন্ধার জীবনের অন্ধকার মুছে গিয়েও আজ সূর্যোদয়ের সূচনা হতে চলেছে। এই গণিকালয়, এই প্রাচীন বন্দর ত্যাগ করে সে আজ পাড়ি দেবে নতুন এক দেশের খোঁজে, যে-দেশে রোজই এমন সুন্দর সকাল হবে।

মৃদু বিষণ্ণতাও যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে মৎস্যগন্ধাকে। এই প্রথম যেন এই মৃত বন্দরের প্রতি একটা টান অনুভব করছে মৎস্যগন্ধা। কোন ছেলেবেলায় সে ভর্তিকার হাত ধরে উঠে এসেছিল এখানে। এই তমালিকা বন্দরই তাদের সেদিন তার বুকে আশ্রয় দিয়েছিল। এখানেই তার বেড়ে ওঠা। তারপর অনেক কষ্ট দুঃখ সহ্য করে এই গণিকালয়কে গড়ে তোলা। ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন এই গণিকালয়, এই তমালিকা বন্দরের সঙ্গে এতদিন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল মৎস্যগন্ধার জীবন। কত স্মৃতি তার জড়িয়ে আছে এই বন্দরের সঙ্গে। সবচেয়ে তার কষ্ট হচ্ছে রানির জন্য। তার প্রিয় সহচরীকে এই তমালিকা বন্দরে মৎস্যগন্ধা ফেলে রেখে যাচ্ছে। গতকাল মাঝরাত পর্যন্ত নীচে নেমে বহুদিন পর খদ্দেরদের নিজে আপ্যায়ন করেছে সে। খদ্দেরদের অনেকে জানতে চেয়েছে যে, মৎস্যগন্ধা এ-বন্দর ছেড়ে চলে যাচ্ছে কিনা? তার গণিকালয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিনা? কারণ খবরটা বেশ ছড়িয়েছে বন্দরে।

মৎস্যগন্ধা তাদের এই বলে আশ্বস্ত করেছে যে, তেমন কোনও ব্যাপার নয়। তার বন্দর ছেড়ে চলে যাবার ব্যাপারটা নেহাতই গুজব। সে খদ্দেরদের আমন্ত্রণও জানিয়েছে কার্তিক পুজোর দিন তার গণিকালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য। মাঝরাত পর্যন্ত সবার সঙ্গে কথা বলার পর সে ফিরে এসেছিল নিজের ঘরে। খুব সুন্দর চাঁদ উঠেছিল গত রাতে। সেই চাঁদের আলো আর জোয়ারের জল এসে ছুঁয়ে যাচ্ছিল রানির কবর। প্রায় সারা রাতই সেই কবরের দিকে তাকিয়ে মৎস্যগন্ধা ভেবেছে রানির কথা, ভর্তিকার কথা, এ-বন্দরে সে যাদের ছেড়ে রেখে যাচ্ছে তাদের কথা...

সূর্যোদয়ের পর নদীর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মৎস্যগন্ধা। এক সময় কুয়াশা মুছে গিয়ে জেগে উঠল তমালিকা বন্দর। মৎস্যগন্ধা এরপর জানলা থেকে সরে এসে ভাবতে লাগল এস্তাদিওর কথা।

এস্তাদিওর অবশ্য ঘুম ভাঙল বেশ বেলা করে। বন্দরের কর্মচাঞ্চল্য তার অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। এস্তাদিওর আজ সকালে আর কোনও কাজ

BanglaBook.org

নেই। বিকেল হলে সে রওনা হবে বন্দরের দিকে। আজই এই তমালিকা বন্দরে তার শেষ দিন। এস্তাদিও এ-বন্দরে তার জাহাজ ভিড়িয়েছিল ভাস্কোর নির্দেশে বাণিজ্য করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্য খবর সংগ্রহ করতে। বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে মূল্যবান পণ্য সংগ্রহ করে নাবিকরা। কিন্তু এ-বন্দর থেকে এস্তাদিও যা নিয়ে যাচ্ছে তা অমূল্য। হীরা-চুনী-পান্না দিয়ে তার পরিমাপ করা যায় না। সে নিয়ে যাচ্ছে মৎস্যগন্ধাকে। সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে তার ভালোবাসাকে। তমালিকা বন্দরের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে এস্তাদিও।

ঘুম ভাঙলেও বিছানা ছেড়ে উঠল না এস্তাদিও। আলস্যে গা ডুবিয়ে সে ভাবতে লাগল মৎস্যগন্ধার কথা, তার সঙ্গে এস্তাদিওর প্রথম সাক্ষাতের কথা। এখানে সে যে-বন্দরজীবন অতিবাহিত করে গেল তার কথা।

সময় এগিয়ে চলল।

সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর তখন বিছানা ছাড়ল এস্তাদিও। স্নানাহার শেষ করে ঘরে যা জিনিসপত্র ছিল, গুছিয়ে নিল। বাড়ির মালিককে দ্বিপ্রহরে আসতে বলেছিল এস্তাদিও। সে এসে ভাড়ার টাকা বুঝে নিয়ে গেল। সব কাজ মিটে যাবার পর সে পেড্রোকে একটা বলদের গাড়ি ডেকে আনতে বলল। গাড়ি নিয়ে হাজির হল পেড্রো। তখন বিকাল হতে চলেছে, ঘরে সামান্য যা কিছু মালপত্র ছিল তা বলদের গাড়িতে উঠিয়ে পেড্রোকে নিয়ে নদীতটের দিকে রওনা হয়ে গেল এস্তাদিও।

তারা যখন নদীর পাড়ে পৌঁছোল তখন বিকেল হয়ে গেছে। মনোরম বিকেল। সূর্যদেব সারাদিন ধরে আকাশ পরিক্রমার শেষে এগোচ্ছে নদীর বুকে এদিনের মতো আশ্রয় নেবার জন্য। জোয়ার শুরু হবার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মৃদুমৃদু কাঁপছে নদীর জল। সার সার পালতোলা দিশি নৌকা দাঁড়িয়ে আছে বন্দরে। দু-চারটে জাহাজও। বন্দরে নামা নাবিক, মাঝি-মাল্লার দল পাড় থেকে ছোট ছোট নৌকাতে ফিরে যাচ্ছে জাহাজ বা বড় বড় নৌকাতে রাত্রিবাসের জন্য। কিছু নৌকা আবার নাবিকদের নিয়ে পাড়ের দিকেও আসছে। হয়তো বা তারা রাত্রিবাস করবে নারীসংসর্গে, মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ে। সব মিলিয়ে চারপাশের পরিবেশে কোনও অস্থিরতা নেই। দিনের শেষে বেশ সুন্দর বাতাস ভেসে আসছে মোহনার দিক থেকে।

তবে নদীর পাড়ে জাহাজ যেখানে আছে সেখানে আজও জমিদারের পেয়াদাদের উপস্থিতি দেখল এস্তাদিও। জায়গা ছেড়ে তারা নড়েনি। এস্তাদিও

BanglaBook.org

বেশ কৌতুক বোধ করল তাদের দেখে। গো-শকট থেকে নেমে সে নিজেই তাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'গাড়িতে কোনও মেয়ে এনেছি কিনা দেখে যাও।'

তার কথা শুনে একজন প্রহরী এল ঠিকই। কিন্তু সে একবার দায়সারা ভাবে গাড়ির চারপাশে পাক খেয়ে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল। স্পষ্টতই বিমর্ষ দেখতে লাগছে পেয়াদাগুলোর মুখ। তারা হয়তো ভেবেছিল যে তারা পাকড়াও করতে পারবে মৎস্যগন্ধাকে। আজ সেই সুবাদে কিছু অর্থ লাভ হবে।রাত্রি জাগরণ তাদের বৃথা গেল। তবুও যতক্ষণ না জাহাজ ছাড়ছে ততক্ষণ তাদের ওই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বলা যায় না, জাহাজ ছেড়ে যাবার মুহূর্তেই হয়তো মৎস্যগন্ধা জাহাজে উঠে পালিয়ে গেল! তখন তাদের গর্দান যাবে।

এস্তাদিও দেখতে পেল তার ছোট্ট জাহাজের মাস্তুলগুলোর গায়ে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে ফেলেছে দিশি নাবিকরা। কয়েকজন নাবিক আবার দুধ-কলা ইত্যাদি নিক্ষেপ করছে নদীর জলে। এসব করার নির্দেশ এস্তাদিও দেয়নি। জাহাজের মঙ্গলকামনায় দীর্ঘদিনের সংস্কারবশত তারা এ-কাজ করছে।

এস্তাদিওকে দেখতে পেয়ে ইসমাইল নামের নাবিক এগিয়ে এসে সেলাম ঠুকলো। এস্তাদিও জানতে চাইল। 'সব ঠিক আছে তো?'

ইসমাইল বলল, 'হ্যাঁ, মালিক। নাখোদা আমাকে সব নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আপনার কোনও চিন্তা নেই।'

বলদের গাড়ি থেকে পেড্রো মালপত্র নামিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মালপত্র নিয়ে নৌকা করে জাহাজে পৌঁছে গেল সবাই। মকরবাহিনীর ডেকে উঠে দাঁড়াল পেড্রো। ডেকে দাঁড়িয়ে এস্তাদিও একবার দেখার চেষ্টা করল মৎস্যগন্ধার গণিকালয়টা। মৎস্যগন্ধাও নিশ্চই এখন তার জানলা দিয়ে বন্দরের দিকেই তাকিয়ে আছে। ঘর-বাড়ির ভিড়ে এস্তাদিও মৎস্যগন্ধার গণিকালয়টা জাহাজের ডেক থেকে দেখতে না পেলেও মৎস্যগন্ধা হয়তো বা দেখতে পাবে এই জাহাজটাকে। ইসমাইলের লোকজন রশি টেনে পাল খাটাতে শুরু করল। নাখোদা আব্বাসের অনুপস্থিতিতে ইসমাইল-ই এখন নাখোদা।

দিনের শেষে বন্দর ফাঁকা হতে শুরু করেছে। দিনশেষের আলো এসে পড়েছে জনশূন্য হয়ে যাওয়া বন্দরের ওপর। সেদিকে তাকিয়ে এস্তাদিওর মনে হল, কেমন যেন এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে সারা বন্দর জুড়ে। মৎস্যগন্ধা চলে যাবার পর কাল থেকে আরও শূন্য, নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে এ-বন্দর।

BanglaBook.org

তারপর এক সময় হয়তো আর কোনও জাহাজই ভিড়বে না এ-বন্দরে। ইতিহাসের পাতায় শুধু লেখা হয়ে থাকবে তাম্রলিপ্ত বন্দরের নাম।

পাল খাটানো হয়ে গেল। বেশ বাতাসও আছে। ফুলে উঠছে পাল। উল্টো দিক থেকে ভেসে আসা বাতাস জাহাজটাকে ঠেলে নিয়ে যাবে মোহনার দিকে। নদীর জলে সূর্য অর্ধেক ডুবে গেছে। তার লাল আভা রাঙিয়ে দিচ্ছে ফুলে ওঠা সাদা পালকে। যাত্রা শুরু করতে হবে এবার। একজন নাবিক এস্তাদিওকে নিয়ে এসে দাঁড় করাল ডেকের মাঝে যে-লোহার স্তম্ভ বা ক্যাপস্টেন বসানো থাকে তার সামনে। জাহাজের নাবিকরা ঘিরে দাঁড়াল এস্তাদিওকে। তার হাতে তুলে দেওয়া হল একটা নারকেল। নাবিকদের কথামতো এস্তাদিও ক্যাপস্টেনের গায়ে নারকেলটা আছড়ে ফাটাতে ইসমাইল হাঁক দিল, 'নোঙর তোলো।'

ক'জন নাবিক মিলে কাছি টেনে নোঙরটা তুলে ফেলল। প্রথমে একটু দুলে উঠল জাহাজটা, তারপর পাল তাকে তরতর করে ঠেলে নিয়ে চলল নদীবক্ষে। সমুদ্র-দেবতার নামে, নিজেদের ইষ্টদেবতার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল নাবিকরা। তমালিকা বন্দর ছেড়ে রওনা হল মকরবাহিনী। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে এস্তাদিওর চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল তমালিকা বন্দরের মাটি। মোহনার দিকে এস্তাদিও ভেসে চলল আবার সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামল তমালিকা বন্দরের বুকে।

মৎস্যগন্ধাও ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়েছিল তার জানলার সামনে। বিকেল থেকেই সে অমনভাবেই দাঁড়িয়েছিল জানলার ধারে, এস্তাদিওর জাহাজটাকে দেখার প্রতীক্ষায়। জাহাজটা যেখানে নোঙর করা ছিল সে জায়গাটা মূল বন্দর থেকে বেশ কিছুটা তফাতে মৎস্যগন্ধার দৃষ্টির বাইরে। বেশ অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর জাহাজটা যখন নোঙর তুলে মোহনার দিকে রওনা হল, তখন দিনের শেষ আলোতে শেষপর্যন্ত জাহাজটা চোখে পড়ল মৎস্যগন্ধার। সাদা পাল তোলা ছোট্ট জাহাজটা রাজহংসীর মতো এগিয়ে চলেছে নদীপথ ধরে। যতক্ষণ সেই জাহাজটা বিন্দুর মতো ছোট হতে হতে হারিয়ে না-গেল, ততক্ষণ সেদিকেই তাকিয়ে রইল মৎস্যগন্ধা। আর এরপরই সূর্য ডুবে গিয়ে সন্ধ্যা নামতে শুরু করল। মৎস্যগন্ধা ডাক দিল শ্যামাকে।

শ্যামা ঘরে ঢুকতেই মৎস্যগন্ধা বলল, 'আজ অন্য দিনের থেকে অনেক বেশি প্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা কর। একটা অলিন্দ-গবাক্ষও যেন বাদ না যায়। যেন দূর দূর থেকে দেখা যায় এই আলো।'

BanglaBook.org

শ্যামা বলল, 'আচ্ছা। সে ব্যবস্থা করছি।'

এরপর শ্যামা বলল, 'জমিদারের দুজন পাইক সকাল থেকেই সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝেই তারা খোঁজখবর নিচ্ছে আপনি বাড়িতে আছেন কিনা? বাড়ির ভিতর ঢোকার সময় তারা দু-চারজন খদ্দেরকেও বলেছে যে, আপনি বাড়িতে আছেন কিনা বাইরে বেরিয়ে তা তাদের জানাতে।'

মৎস্যগন্ধা ব্যাপারটা শুনে হেসে বলল, 'তুই তাড়াতাড়ি সারা বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা কর। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি নীচে নামছি, সদর দরজায় দাঁড়িয়ে খদ্দেরদের আপ্যায়ন করব আমি, ওই দুজন লোককেও করব। সন্দেহভঞ্জন হবে তাদের।'

শ্যামা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল নির্দেশ পালন করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধীরে ধীরে প্রদীপ জ্বলে উঠতে শুরু করল সারা বাড়িটা জুড়ে। চারপাশের অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে ঝলমল করে উঠল মৎস্যগন্ধার গণিকালয়। বহু দূর থেকে দেখা যেতে লাগল সে-আলোর রোশনাই। যারা ভেবেছিল মৎস্যগন্ধার গণিকালয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তারা এই আলো দেখে গণিকালয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

এক সময় মৎস্যগন্ধাও তৈরি হয়ে নীচে নেমে এল। আজ খুব সুন্দর সেজেছে মৎস্যগন্ধা। পরণে রেশমের স্বচ্ছ পোশাক। মাথায় টায়রা, গলায় নয় প্যাঁচের মুক্ত মালা। হাতে অঙ্গদ, পায়ে নূপুর। বন্দর সুন্দরীর এ-রূপ দেখলে লজ্জা পেত উর্বশী, রম্ভার মতো সুরসুন্দরীরাও।

দুজন চপলা স্বভাবের গণিকাকে নিয়ে সদর দরজায় এসে দাঁড়াল মৎস্যগন্ধা। খদ্দেরদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। মৎস্যগন্ধা দেখতে পেল বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা জমিদারের সেই দুজন পেয়াদাকে। তাদের দেখে মজা করার ইচ্ছা হল মৎস্যগন্ধার। সে তাদের উদ্দেশ্য বলল, 'নাগরেরা শুনলাম সকাল থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছ? তা বাইরে কেন? ভিতরে এসো।'

লোকদুটো তার কথার কোনও জবাব দিল না।

মৎস্যগন্ধা আবারও তাদের বলল, 'এসো, এসো, ভিতরে এসো, লজ্জা কোরো না। তোমাদের পয়সা দিতে হবে না আজ।'

এবার সে দুজনের একজন বলল, 'আমরা জমিদারের পাইক। আমরা ভিতরে যাব না।'

এবার মৎস্যগন্ধা তার সঙ্গিনীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'ওরে, এ-লোকগুলো জমিদারের পাইক বলে কথা। আমার দরজার সামনে যখন এসেছে তখন একটু

BanglaBook.org

আদর আপ্যায়ন না করে কী ছাড়া যায়! যা, তোরা গিয়ে ওদের আদর করে ভিতরে নিয়ে আয়।'

মৎস্যগন্ধার কথা শুনে তার সঙ্গিনী দুজন চপলস্বভাবা গণিকা গিয়ে জাপ্টে ধরল সেই পাইক দুজনকে।

শুরু হল তাদের নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া। মুহূর্তের মধ্যে তাদের ঘিরে আগত খদ্দের আর পথচারীদের ভিড় জমে গেল গণিকালয়ের সামনে। গণিকা দুজন খিল খিল করে হাসতে-হাসতে নানা চটুল কথা বলে জাপ্টে ধরে টানাটানি করছে পেয়াদা দুজনকে। জমিদারের পাইক বরকন্দাজদের অপদস্থ হতে দেখলে সবাই আমোদ পায়। জনতাও সেই মজাদার দৃশ্য দেখে খুব আমোদ উপভোগ করতে লাগল। একসময় মৎস্যগন্ধার নির্দেশেই দুজনকে ছেড়ে দিল গণিকারা। পাইকরা আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালো না। এরপর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো রাস্তাতেই তাদের পোশাক খুলে নেবে লজ্জাহীনা গণিকারা। তাছাড়া যার খোঁজে তারা এখানে এসেছিল তাকে তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে তারা। আর তাদের এখানে থাকার প্রয়োজনও নেই। কাজেই গণিকাদের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সে জায়গা ছেড়ে চলে যাবার জন্য। জনতার মধ্যে আরও একবার হাসির রোল উঠল গণিকাদের ভয়ে পলায়মান পাইকদের দেখে। মৎস্যগন্ধা নিশ্চিন্ত হল।

এদিন খদ্দেরদের আনাগোনা যেন একটু বেশিই মনে হল মৎস্যগন্ধার। সম্ভবত কিছু লোক জানতে এসেছিল যে গণিকালয় সত্যি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিনা? দরজা খোলা দেখে তারাও ভিতরে ঢুকে পড়েছে। খদ্দেরদের হাঁকডাক, তাদের সঙ্গে গণিকাদের রঙ্গতামাশায় মুখরিত হয়ে উঠল মৎসগন্ধার গণিকালয়। বাইরে চাঁদ উঠতে শুরু করল। একসময় শ্যামার সেই নাগর, জমিদারের সেরেস্তোর কর্মচারীও উপস্থিত হল গণিকালয়ে। শ্যামা তাকে নিয়ে হাজির হল মৎস্যগন্ধার সামনে। হংসরাজ মৎস্যগন্ধাকে বলল, 'আমি সেরেস্তা থেকে সোজা এখানে আসছি। জমিদারমশাই নিশ্চিন্ত হয়েছেন আপনি এখানে আছেন বলে। জমিদারবাড়ির ছাদ থেকে গণিকালয়ের আলো দেখা গেছে। সবাই ভয় পেয়ে গেছিল আপনার এই গণিকালয় বন্ধ হয়ে যাবে ভেবে।'

মৎস্যগন্ধা হেসে জবাব দিল, 'আমার কী আর কোথাও যাবার মতো কোনও জায়গা আছে? এখানেই আছি, এখানেই থাকব।'

শ্যামার সঙ্গে এরপর অন্যত্র চলে গেল লোকটা।

BanglaBook.org

চাঁদ যত মাথার ওপর উঠতে লাগল, তত জমে উঠতে লাগল গণিকালয়ের পরিবেশ। একসময় মৎস্যগন্ধা যখন বুঝতে পারল যে, সমবেত নারী-পুরুষরা নিজেদের নিয়ে মেতে উঠেছে, তাকে তেমন কেউ খেয়াল করছে না, তখন ওপরে উঠে এল মৎস্যগন্ধা। গায়ের আবরণ খুলে দ্রুত সাধারণ পোশাক পরে নিল সে। তারপর কালো চাদরে নিজেকে আবৃত করে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে যেতেই শ্যামার মুখোমুখি হয়ে গেল। শ্যামার একই সঙ্গে ঠোঁটের কোণে হাসি আর চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। শ্যামা তার উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি এমনই আন্দাজ করেছিলাম। আপনি আর নাবিক কেউ কাউকে ছাড়া বাঁচবেন না। জমিদারের লোকরা আপনাকে আটকাতে পারবেন না। আপনারা যেখানেই থাকুন সুখে থাকুন, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।'—এই বলে ঝুঁকে পড়ে মৎস্যগন্ধার পা স্পর্শ করল শ্যামা।

মৎস্যগন্ধার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গিনী শ্যামা। এই শেষসময় আর তাকে মিথ্যা বলতে ইচ্ছা হল না মৎস্যগন্ধার। শ্যামার উদ্দেশ্যে সে বলল, 'তোরাও ভালো থাকিস। এই পাপজন্ম থেকে সবাইকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। কিন্তু কাল সকালের আগে আমার অনুপস্থিতির খবর যেন কেউ জানতে না পারে। আর কার্তিকপুজোটা যেন হয়। গরিব দুঃখীরা যেন সেদিন খেতে এসে ফিরে না যায়।'

মৎস্যগন্ধা এরপর আর দাঁড়াল না। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেমে পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়ল। আকাশে চাঁদ আছে। তবে মেঘও আছে। সে মেঘ মাঝে-মাঝে উড়ে যাচ্ছে চাঁদের গা বেয়ে। চারপাশ কয়েক মুহূর্তের জন্য ঢেকে যাচ্ছে অন্ধকারে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে নদীর পাড় বরাবর দ্রুত এগোতে লাগল মৎস্যগন্ধা। রাস্তা বলতে যা বোঝায় এটা ঠিক তা নয়। চারপাশে অসংখ্য ঝোপঝাড়, তারপর কর্দমাক্ত নদীতট নেমে গেছে জলের দিকে। এদিকে কোনও বসতি নেই, কোথাও কোনও লোকজনও নেই। নদীবক্ষে জেলে নৌকার দু-একটা টিমটিমে আলো ছাড়া কোথাও কোনও আলোকরেখা নেই। সঙ্গে আনার মধ্যে দুটো জিনিস শুধু এনেছে মৎস্যগন্ধা। তার বুকের মধ্যে রাখা আছে সেই বুদ্ধমূর্তিখোদিত চন্দনকাঠের টুকরোটা,যেটা এস্তাদিও তাকে উপহার দিয়েছিল। আর রয়েছে তার সর্বক্ষণের সঙ্গী কোমরের আড়ালে গোঁজা ছুরিটা। এ-দুটো জিনিস নিয়ে এগিয়ে চলল মৎস্যগন্ধা।

বেশ অনেকক্ষণ চলার পর যখন সে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছোল তখন শিয়ালের

BanglaBook.org

দল ডেকে উঠল নদীপাড়ের শুকনো কাশবন থেকে। রাত্রি এক প্রহর হল। মৎস্যগন্ধা দেখতে পেল নদীর দিকে হেলে পড়া বিশাল বুড়ো বটগাছটার ঠিক নীচেই দাঁড়িয়ে আছে একটা নৌকা। মৎস্যগন্ধা হাজির হল তার সামনে। আব্বাস লোকটা অপেক্ষা করছিল সেখানে মৎস্যগন্ধার জন্য। তমালিকা বন্দরের অন্য সবাইয়ের মতো আব্বাসও মৎস্যগন্ধাকে চেনে। ছোট একটা নৌকা। তবে তার পাল থাকলেও সেটা গোটানো আছে দণ্ডের গায়ে। নদীর স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে আব্বাস বলল, 'চিন্তা করবেন না। আর এক প্রহরের মধ্যেই আমরা মোহনায় পৌঁছে যাব। আমি নাখোদা আব্বাস। উত্তাল সমুদ্রে তিরিশ বছর জাহাজ চালিয়েছি। দরকার হলে আমি এই ছোট নৌকা নিয়েই সাগরে নামতে পারি। সে হিম্মত আমার আছে। এ তো সামান্য নদী।'

মৎস্যগন্ধা আশ্বস্ত হল তার কথা শুনে।

পিছনে পড়ে রইল তমালিকা বন্দর, পড়ে রইল তার গণিকালয়। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে সবাইকে পিছনে ছেড়ে মোহনার দিকে এগিয়ে চলল নৌকা। মৎস্যগন্ধা ভাবতে লাগল কতক্ষণে তারা পৌঁছোবে মোহনায়। সেখানে মকরবাহিনীর ডেকে তার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে এস্তাদিও। কাল যখন তমালিকা বন্দরে সূর্যোদয় হবে তখন মৎস্যগন্ধা আর এস্তাদিও সমুদ্রে ভেসে চলেছে এক নতুন পৃথিবীর দিকে।

সত্যিই রাত্রির দুই প্রহরে মোহনার কাছে পৌঁছে গেল মৎস্যগন্ধার নৌকা। বেশ অনেক ক'টা ছোট-বড় নদী এসে মিশেছে এই মোহনাতে। তারপর তাদের সম্মিলিত জলধারা গিয়ে মিশেছে সাগরে। অনেক কটা খাঁড়িমুখও আছে সে-জায়গাতে। ঠান্ডা বাতাস আর জলোচ্ছ্বাসের অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে সমুদ্রের দিক থেকে। তেমনই একটা খাঁড়ি বেয়ে নৌকা নিয়ে এগোতে লাগল আব্বাস। তাহলে তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যাবে মোহনা সংলগ্ন সমুদ্রর মুখে, যেখানে অপেক্ষা করে আছে মকরবাহিনী। খাঁড়িতে ঢোকার পরই টিপটিপ করে বৃষ্টিপাত শুরু হল। ভিজতে ভিজতেই এগোল তারা। খাঁড়িটা যেখানে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে ঠিক সে জায়গাতে পৌঁছে সাগরে নামতে গিয়েও হঠাৎ লগি মেরে আব্বাস নৌকা থামিয়ে দিল। মৎস্যগন্ধা জানতে চাইল, 'এখানে থামলে কেন?'

আব্বাস আঙুল তুলে দেখাল সামনের দিকে, যেখানে কিছু দূরে চাঁদের আলোতে নদী আর সমুদ্র পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে।

BanglaBook.org

এস্তাদিওরা তমালিকা বন্দরকে পিছনে ফেলে এগোবার পরই সূর্য ডুবে গেল। সন্ধ্যা নেমে এল নদীর বুকে। ডেকে দাঁড়ানো এস্তাদিওর চোখের সামনে থেকে মুছে যেতে লাগল দু-পাশের নদীর চর। অন্ধকার গ্রাস করে নিল সব কিছু। তারপর ধীরে ধীরে আবার আকাশে চাঁদ উঠতে শুরু করল। দেখা যেতে লাগল দু-পাশের জনহীন চরাচর। বাতাসই জাহাজটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মৃদু-মন্দ গতিতে। শুধু হাল ধরে বসে আছে হালিরা। মোহনাতে পৌঁছোবার খুব বেশি তাড়া নেই এস্তাদিওর। কারণ, মোহনাতে গিয়ে তাকে তো মৎস্যগন্ধার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। এস্তাদিও মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করতে লাগল, এসময় মৎস্যগন্ধা কী করছে? নিশ্চই এতক্ষণে তার গণিকালয়ের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। খদ্দেরদের আনাগোনাও শুরু হয়ে গেছে। হয়তো মৎস্যগন্ধা তাদের তদারকিতে ব্যস্ত, নাকি ইতিমধ্যে অন্ধকার নামতেই সে বেরিয়ে পড়েছে তার গণিকালয় ছেড়ে? মাঝে-মাঝে একটা আশঙ্কাও কাজ করছে এস্তাদিওর মনে। শেষ মুহূর্তে যদি সে গণিকালয় ছেড়ে বেরোতে না পারে? অথবা জমিদারের লোকেরা যদি গণিকালয় ছেড়ে বেরোবার পর মৎস্যগন্ধাকে ধরে ফেলে, তখন? এস্তাদিও মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করতে লাগল—'না, না, এমন কিছু ঘটবে না। মৎস্যগন্ধা ঠিক পৌঁছে যাবে নদীপাড়ের সেই বটগাছের কাছে, তারপর আব্বাস তাকে নিয়ে আসবে তার জাহাজে।'

আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ আছে, তারা মাঝে মাঝে চাঁদকে ঢেকে দিচ্ছে। অন্ধকার নেমে আসছে চারপাশে। পরক্ষণেই আবার মেঘমুক্ত হয়ে আলো ছড়াচ্ছে চাঁদ। ঠিক তেমনই মাঝে-মাঝে আশঙ্কার আলো-অন্ধকার খেলা করাতে লাগল এস্তাদিওর মনে। এগিয়ে চলল মকরবাহিনী।

রাত্রির প্রথম প্রহরের অনেক আগেই মোহনাতে পৌঁছে গেল এস্তাদিও। বিভিন্ন দিক থেকে নদী এসেছে মিশেছে এখানে। অনেকগুলো খাঁড়ি। নদীর জলপ্রবাহগুলো পাক খেতে খেতে মিশে গেছে সমুদ্রের জলরাশির সঙ্গে। চাঁদের আলোতে জেগে আছে বিশাল মহার্ণব। মৎস্যগন্ধাকে নিয়ে এস্তাদিও পাড়ি দেবে সেই মহাসমুদ্রে। তার জলোচ্ছ্বাসের শব্দ যেন হাতছানি দিয়ে

BanglaBook.org

ডাকছে এস্তাদিওকে। মোহনায় প্রবেশ করে বিস্তীর্ণ জলরাশির ঠিক মাঝখানে নোঙর করল মকরবাহিনী। অপেক্ষা করতে হবে তাদের। বাতাস পালটাকে ঠেলে সমুদ্রের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে জাহাজটাকে। তাই পাল নামিয়ে ফেলা হল। পেড্রোও ডেকে ঘোরাঘুরি করছিল। সে এস্তাদিওর কাছে এসে জানতে চাইল, 'এখানে জাহাজ থামালেন?'

এস্তাদিও বলল, 'কাল ভোরে আমরা সমুদ্রযাত্রা করব। তাছাড়া নাখোদা আব্বাস একটা কাজে আটকে গিয়ে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেনি। তার জন্য তমালিকা বন্দরে আমাদের অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কারণ, জমিদারের নির্দেশে সূর্যাস্তের পর আমরা আর বন্দরে থাকতে পারতাম না। নাখোদা আব্বাস এখানে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। তারপর সে আমাদের নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবে।'

এস্তাদিওর কথা শুনে ফিরে গেল পেড্রো।

শুরু হল প্রতীক্ষা। এস্তাদিও ভাবতে লাগল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই মৎস্যগন্ধা আব্বাসের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নৌকা নিয়ে তারা এগিয়ে আসছে মোহনার দিকে। ডেকে দাঁড়িয়ে সে দিকেই তাকিয়ে রইল এস্তাদিও। আর এরপরই হঠাৎ খণ্ড খণ্ড মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। প্রথমে টিপ টিপ করে, তারপর মুষলধারে বৃষ্টি নামল। মোহনা অঞ্চলে এ-ধরনের বৃষ্টিপাত মাঝে মাঝেই হয়। ডেক ছেড়ে নাবিকরা প্রবেশ করল খোলের মধ্যে। এস্তাদিও বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য ডেক সংলগ্ন কেবিনে গিয়ে ঢুকল। একটা মোমবাতি জ্বলছে কেবিনে। ঘরে রাখা বালি ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে মৎস্যগন্ধার আসার প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। বালি ঘড়ি থেকে একটু একটু করে বালি ঝরে পড়তে লাগল, সময় এগিয়ে চলতে লাগল। ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠতে লাগল এস্তাদিও। মাঝে মাঝেই সে জানলা দিয়ে বাইরে ডেকের দিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎই ডেকের এক কোণে একটা আলো চোখে পড়ল এস্তাদিওর। নড়ছে আলোটা। মৎস্যগন্ধারা তবে পৌঁছোল নাকি? কেবিন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল এস্তাদিও। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। নাবিকরা ডেকে কেউ নেই। আর বৃষ্টির মধ্যে ডেকের কোণের কার্নিশে দাঁড়িয়ে লণ্ঠন দোলাচ্ছে একটা লোক!

'কে ওখানে? কী করছে?'

এস্তাদিও হাঁক দিতেই লোকটা তাড়াতাড়ি কার্নিশ ছেড়ে এগিয়ে এসে এস্তাদিওর সামনে দাঁড়াল। পেড্রো!

BanglaBook.org

এস্তাদিও অবাক হয়ে বলল, 'বৃষ্টির মধ্যে লণ্ঠন নিয়ে ওখানে তুমি কী করেছিলে?'

পেড্রো বলল, 'আমার বেতন বাবদ আপনি যে রুপোর মুদ্রাগুলো দিয়েছিলেন সেগুলো কোমরে গেঁজের মধ্যে রেখেছিলাম। গেঁজ ছিঁড়ে কয়েকটা মুদ্রা পড়ে গেছে। সম্ভবত ডেকের ও-জায়গার আশেপাশেই কোথাও পড়েছে। ওখানেই তো সন্ধ্যা থেকে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। যদি মুদ্রাগুলো অন্য কেউ কুড়িয়ে নেয় তাই বৃষ্টির মধ্যেই সেগুলো খুঁজছিলাম আমি।'

এস্তাদিও বলল, 'খুঁজে পেলে?'

বিষণ্ণমুখে পেড্রো বলল, 'একটা পেলাম। যাই, এবার খোলের ভিতর খুঁজি গিয়ে।' এই বলে সে কিছুটা এগিয়ে খোলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি ধরে এল। যদিও বৃষ্টি একদম থামল না। তার মধ্যেই এস্তাদিও ডেকের ধারে এসে দাঁড়াল। যে-পথে মৎস্যগন্ধার আসার কথা সেই নদীপথের দিকে তাকিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আরও দু-চারজন নাবিকও ডেকে এসে দাঁড়াল। সময় এগিয়ে চলল।

এক সময় এস্তাদিও অনুমান করল, রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হতে চলল। এবার নিশ্চই যে-কোনও মুহূর্তে দেখা দেবে মৎস্যগন্ধার নৌকা। এস্তাদিও জাহাজের ডেকের কার্নিশে ঝুঁকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করতে লাগল নদীর দিকটা।

হঠাৎ ডেকে দাঁড়ানো একজন নাবিক চিৎকার করে উঠল, 'আরে! ওটা কী?'

তার চিৎকার শুনে পিছন ফিরল এস্তাদিও। একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল তার। সমুদ্রের দিকের কুয়াশার আবরণ ভেদ করে ভূতের মতো একটা জাহাজ ধেয়ে আসছে মকরবাহিনীর দিকে! দুটো জাহাজের মধ্যে কয়েকরশি মাত্র ব্যবধান!

ব্যাপারটা ভালো করে কেউ বুঝে উঠতে না উঠতেই সেই জাহাজটা হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল তাদের ওপর। দুটো জাহাজের সংঘর্ষে থরথর করে কেঁপে উঠল মকরবাহিনী। দু-একজন নাবিক পড়ে গেল নিজেদের সামলাতে না পেরে। এর পরমুহূর্তেই একসঙ্গে অনেক ক'টা মশালের আলো জ্বলে উঠল সেই জাহাজটার থেকে। আর সেই মুহূর্তেই এস্তাদিও চিনতে পারল জাহাজটাকে। আরে, এ যে 'সান্টা মারিয়া'!

কিন্তু তার ডেকে যে লোকগুলো দাঁড়িয়ে তারা সান্টা মারিয়ার নাবিক নয়।

BanglaBook.org

তাদের মাথায় ফেট্টি বাঁধা, কোমরবন্ধের নীচে ঢিলে পাজামা, গায়ে হাতকাটা জামা। হিংস্র অভিব্যক্তি তাদের চোখে-মুখে। কারও হাতে খাপ-খোলা তলোয়ার, কারও হাতে লম্বা নলঅলা হাত-বন্দুক, যা সাধারণত জলদস্যুরা ব্যবহার করে!

এস্তাদিওর ডেক থেকে কোনও এক নাবিক চিৎকারও করে উঠল, 'জলদস্যু! জলদস্যু!'

তবে কি মোহনা থেকে সমুদ্রে প্রবেশ করার পর জলদস্যুর কবলে পড়েছিল সান্টা মারিয়া? জলদস্যুরা দখল নিয়েছে জাহাজটার? এস্তাদিও তলোয়ার খুলে ফেলল। ইসমাইলও ডেকে বেরিয়ে এল একটা তলোয়ার নিয়ে। সান্টা মারিয়া থেকে কাঠের পাটাতন ফেলা হল এস্তাদিওর জাহাজের ডেকে। আর সেই কাঠের পাটাতন বেয়ে মকরবাহিনীর ডেকে লাফিয়ে নামতে লাগল অস্ত্রধারী লোকগুলো। এস্তাদিওর জাহাজ থেকে কোনও প্রতিরোধ আসতে পারে তা হয়তো ভাবেনি লোকগুলো। প্রথম যে লোকটা পাটাতন বেয়ে নেমেছিল, ইসমাইল ছুটে গিয়ে তরোয়াল বিঁধিয়ে দিল তার পেটে। আর্তনাদ করে ডেকে গড়িয়ে পড়ল লোকটা। একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল ডেক জুড়ে। দু-পক্ষের চিৎকার, তলোয়ারের ঝনঝনানি, বন্দুকের শব্দ আর বারুদের ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে ভরে উঠল ডেক। এস্তাদিওর দিকেও এগিয়ে এল কয়েকজন। তাদের সঙ্গে শুরু হল তলোয়ারের লড়াই। ভালোই লড়ছিল ইসমাইল। সাহস আর শক্তি দুটোই আছে তার দেহে। আরব রক্ত প্রবাহিত তার দেহে, যে রক্তের ভয়ে একদিন স্বয়ং ভাস্কোকেও পালাতে হয়েছিল ভারত মহাসাগর ছেড়ে। আক্রমণকারীদের মধ্যে আরও দুজন ধরাশায়ী হল তার তুর্কি তলোয়ারের আঘাতে। কিন্তু অসম লড়াই বেশিক্ষণ চলে না। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরতে লাগল সান্টা মারিয়ার লোকগুলো। হঠাৎ-ই একটা গুলি এসে ফুঁড়ে দিল ইসমাইলের বুক। ডেকে গড়িয়ে পড়ল তার দেহটা। এরপর তারা এগোল এস্তাদিওর দিকে। এস্তাদিও পাকা তলোয়ারবাজ নয়। কিছুক্ষণ সে লোকগুলোকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল ঠিকই। কিন্তু একসময় তার হাত থেকে তলোয়ার ছিটকে পড়ল। টাল সামলাতে না পেরে নিজেও মাটিতে পড়ে গেল এস্তাদিও। তলোয়ার-হাতে লোকগুলো একটা বৃত্ত রচনা করে এগিয়ে আসতে লাগল এস্তাদিওর দিকে। ক্রমশ সেই বৃত্ত ছোট হয়ে আসতে লাগল। লোকগুলোর চোখে-মুখে ফুটে

BanglaBook.org

উঠেছে হিংস্র উল্লাস। মশালের আলোতে ঝিলিক দিচ্ছে উদ্যত তলোয়ারগুলো। বেশ কয়েকটা লোক একসঙ্গে তলোয়ার ওঠাতে যাচ্ছিল এস্তাদিওকে গেঁথে ফেলার জন্য। ঠিক সেইসময় একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'থামো, ওকে মেরো না।'

সেই কণ্ঠস্বর শুনে লোকগুলো থেমে গেল।

ভিড় ঠেলে এরপর যে-দুজন লোক এস্তাদিওর সামনে এসে দাঁড়াল তাদের দেখে বিস্ময়ে উঠে বসল এস্তাদিও!

সান্টা মারিয়ার ক্যাপ্টেন পেরো আর চিকিৎসক ফ্রান্সিস!

এস্তাদিও ক্যাপ্টেন পেরোকে প্রশ্ন করল, 'এসব কী হচ্ছে? এ লোকগুলো কারা?'

পেরো জবাব দিল, 'এরা সব প্রাক্তন জলদস্যু! পর্তুগিজ রণপোতের ক্যাপ্টেন কোহেলোর অনুচর। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।'

'গ্রেপ্তার! কেন? কার নির্দেশে?' প্রশ্ন করল এস্তাদিও।

ফ্রান্সিস এবার জবাব দিল, 'এদেশে আমাদের সর্বময় কর্তা, পর্তুগালের মহামান্য সম্রাট দ্বিতীয় জনের প্রতিনিধি ভাস্কোর নির্দেশে। অ্যাডমিরালের নির্দেশ অমান্য করেছেন আপনি।'

পেরো এরপর বলল, 'আপনাকে আমরা ক্যাপ্টেন কোহেলোর হাতে তুলে দেব। তারপর আপনাকে গোয়া নিয়ে যাওয়া হবে। ভাইসরয় ভাস্কো-ডা-গামার দরবারে আপনার বিচার হবে।'—কথাগুলো বলে ক্যাপ্টেন পেরো তার লোকদের নির্দেশ দিলেন, 'ওকে বেঁধে ফেলো। তারপর খোলের কয়েদঘরে নিয়ে যাও। সারা জাহাজটার তল্লাসী নাও। আর যে-ক'টা লোক বেঁচে আছে তাদেরও বেঁধে ফেলো।

তার নির্দেশে দুজন লোক দড়ি নিয়ে এসে বাঁধতে শুরু করল এস্তাদিওকে। আর অন্য লোকগুলোও নানা দিকে ছুটল কর্তব্য সম্পাদনের জন্য। এরপর হঠাৎ ফ্রান্সিস বলল, 'পেড্রো কোথায় গেল? তাকে দেখছি না কেন?'

ফ্রান্সিস এরপর হাঁক দিল পেড্রোর নাম ধরে।

মাথার ওপর থেকে সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, 'এই যে আমি। আসছি।'

এস্তাদিও ওপরদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল জাহাজের প্রধান মাস্তুল বেয়ে নীচে নেমে আসছে পেড্রো। ডেকে যখন লড়াই চলছিল তখন সম্ভবত মাস্তুলে উঠে পড়েছিল পেড্রো।

BanglaBook.org

দড়ি-বাঁধা অবস্থায় এস্তাদিওকে দাঁড় করানো হল। পেড্রোও নীচে নেমে সেখানে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে এস্তাদিও ক্যাপ্টেন পেরোদের বলল, 'পেড্রোর কোনও দোষ নেই। ওর কোনও ক্ষতি তোমরা কোরো না।'

কথাটা শুনেই হেসে উঠল ফ্রান্সিস। সে বলে উঠল, 'না, করব না। ওকে আমরা পুরস্কৃত করব ঠিকমত কাজটা করার জন্য। পেড্রোই তো লণ্ঠন নেড়ে আমাদের সংকেত দিল এখানে আসার জন্য।'

ফ্রান্সিসের কথায় হতভম্ব হয়ে গেল এস্তাদিও। কথাগুলো বলার পর ক্যাপ্টেন পেরো, পেড্রোকে নিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন। দুজন লোক এবার এস্তাদিওকে টানতে টানতে জাহাজের খোলের ভিতর নামিয়ে আনল। অবাধ্য নাবিকদের শাস্তি দেবার জন্য প্রত্যেক জাহাজের খোলেই একটা করে লোহার গরাদ দেওয়া খোপ থাকে। যাকে গরাদঘর বলে। সেই ঘরেই আটক করা হল এস্তাদিওকে। পুরো জাহাজের দখল নিল ক্যাপ্টেন পেরোর লোকরা। সারা জাহাজের আনাচে কানাচে তল্লাসি শেষ হলে বেশ অনেকক্ষণ পর সেই গরাদঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস। পেরো গরাদের বাইরে থেকে এস্তাদিওকে প্রশ্ন করলো, 'সেই সিন্দুকটা কই?'

'কোন সিন্দুক?' পাল্টা প্রশ্ন করল এস্তাদিও।

পেরো জবাব দিল, 'যে সিন্দুকটা মাঝরাতে পেড্রো তোমাকে আর মৎস্যগন্ধাকে নিয়ে আসতে দেখেছিল।'

ক্যাপ্টেনের কথা শুনে চমকে উঠল এস্তাদিও। তার মানে পেড্রো অনুসরণ করত তাকে!

এস্তাদিও বলল, 'ওসব আমি জানি না। পেড্রো বানিয়ে বলেছে সিন্দুকের কথা।'

BanglaBook.org

ক্যাপ্টেন বিশ্বাস করলেন না কথাটা। তিনি বললেন, 'কী ছিল ওই সিন্দুকে?'

এস্তাদিও বলল, 'বলছি তো ওই সিন্দুকের কথা আমার জানা নেই।'

ফ্রান্সিস বলল, 'সে সিন্দুক কি তবে মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ে আছে?'

তার কথার কোনও জবাব দিল না এস্তাদিও।

ফ্রান্সিস ক্যাপ্টেনকে এরপর বলল, 'উনি যখন কিছু আমাদের বলতে চাইছে না তখন থাক। আমরা ওকে ক্যাপ্টেন কোহেলোর সামনে হাজির করাই। আশা করি তার কাছে উনি সব কিছু খুলে বলবেন। আমার ধারণা কথা বের করার কৌশল তিনি জানেন।'

ক্যাপ্টেন পেরো এরপর সে জায়গা ত্যাগ করে খোল ছেড়ে ডেকে উঠে এলেন ফ্রান্সিসকে নিয়ে। পেড্রো ডেকেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে হাঁক দিলেন পেরো। পেড্রো তাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই ক্যাপ্টেন বললেন, 'বণিক তো বলছে সিন্দুকের ব্যাপারটা তোমার বানানো গল্প?'

পেড্রো টুপি খুলে বলল, 'যিশুর দিব্যি। এটা বানানো গল্প নয়। আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম সিন্দুক খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে তুলে আনতে। আমার কথা মিথ্যা হলে আমাকে আপনারা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।'

ফ্রান্সিস, পেরোকে বলল, 'সারা জাহাজ, মালপত্র ইত্যাদি তল্লাসী করেও তো কোনও পেটিকা বা সিন্দুক পাওয়া গেল না। ওটা যদি মৎস্যগন্ধার গণিকালয়ে থেকে থাকে তবে তা উদ্ধার করা মুশকিল হবে।'

পেড্রো এবার বলল, 'আমার একটা ধারণা হচ্ছে ক্যাপ্টেন।'

'কী ধারণা?' জানতে চাইলেন পেরো।

পেড্রো বলল, 'এখানে আমাদের জাহাজ নোঙর করা হয়েছিল নাখোদা আব্বাসের জন্য। রাতেই তার এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার কথা। সে আমাদের সঙ্গে এল না কেন সে ব্যাপারে আমার এখন সন্দেহ জাগছে। যে মৎস্যগন্ধার জন্য বণিক আপনাদের ত্যাগ করল, সবচেয়ে বড় কথা, স্বয়ং অ্যাডমিরালের নির্দেশও অমান্য করল, তার পক্ষে কি এত সহজে সেই বেশ্যাকে ত্যাগ করা সম্ভব? এমনও হতে পারে যে, নাখোদা আব্বাস জমিদারের লোকজনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মৎস্যগন্ধাকে এখানে নিয়ে আসছে! হয়তো সেই সিন্দুকও তাদের সঙ্গে আছে। সেই সিন্দুকে যদি সত্যিই মূল্যবান কিছু জিনিস থেকে থাকে তো নিশ্চই তারা সেই সিন্দুক বা তার ভিতরের জিনিসগুলো সঙ্গে করেই আনবে।'

BanglaBook.org

পেরো কথাগুলো শুনে নিয়ে তাকে বললেন, 'ঠিক আছে। এবার তুমি যাও।'

পেড্রো চলে যাবার পর ফ্রান্সিস বলল, 'ওর কথায় কিন্তু যুক্তিও আছে। আমরা বরং অপেক্ষা করি এখানে। দেখা যাক তারা এখানে এসে পৌঁছোয় কিনা? রাত শেষ হতে তো আর একটা মাত্র প্রহর বাকি।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'কিন্তু দুটো জাহাজকে একসঙ্গে দেখলে যদি ওরা আমাদের কাছে না ঘেঁষে?'

ফ্রান্সিস বলল, 'দেখুন, এস্তাদিওর ফেরা-না-ফেরা নিয়ে আমাদের সঙ্গে তর্ক হলেও সেভাবে লড়াই-ঝগড়া হয়নি। এমনও তো তারা ভাবতে পারে যে, মোহনায় এসে এস্তাদিওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের। দু-পক্ষর মধ্যে সমস্যা মিটে গেছে। তাই আমরা একসঙ্গে আছি। অপেক্ষা করেই দেখা যাক না কী হয়?'

ক্যাপ্টেন পেরো বললেন, 'তবে তাই হোক।'

প্রতীক্ষাপর্ব শুরু হল ডেকে। আর খোলের অন্ধকার ঘরে বন্দি এস্তাদিও ভাবতে লাগল ডেকে কী ঘটছে? মৎস্যগন্ধাকে নিয়ে আব্বাস কী হাজির হয়েছে এ-জাহাজে? তাদের কী বন্দি করা হয়েছে? কী ঘটছে মৎস্যগন্ধার সঙ্গে? অন্ধকার কক্ষে বসে এস্তাদিও মৎস্যগন্ধার কথা ভেবে অসহায়ের মতো ছটফট করতে লাগল।

ক্যাপ্টেন পেরোদের অপেক্ষাই সার হল। রাত কেটে গিয়ে ভোর হল এক সময়। দিগন্তবিস্তৃত জলরাশিকে উদ্ভাসিত করে সূর্যদেব একসময় উদিত হলেন। সারা ডেক জুড়ে ছড়িয়ে আছে গতরাতের লড়াইয়ের চিহ্ন। ক্ষতবিক্ষত সব লাশ। জনা কুড়ি নাবিক ছিল এ-জাহাজে। তার মধ্যে তিন-চারজন বেঁচে আছে দড়ি-বাঁধা অবস্থায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের তাপে আর নোনা বাতাসে লাশগুলো ফুলে উঠতে লাগল। শেষপর্যন্ত যখন সূর্য ঠিক মাথার উপর উঠল তখনও দেখা মিলল না মৎস্যগন্ধার। ক্যাপ্টেন কোহেলোর লোকগুলোর মধ্যে দলনেতা এসে ক্যাপ্টেন পেরোকে বলল, 'তিনদিন ধরে আপনাদের সঙ্গে আছি। এবার আমরা জাহাজে ফিরতে চাই। আপনারা বলেছিলেন কোনও প্রতিরোধ হবে না এ-জাহাজ থেকে। অথচ আমাদের তিনজন লোক মারা পড়ল। বেশ কয়েকজন আহত। ক্যাপ্টেন কোহেলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এরপর যা করার করবেন।'

BanglaBook.org

কিছুটা দূরেই সমুদ্রের মধ্যে নোঙর করে আছে ক্যাপ্টেন কোহেলোর রনপোত। এ জাহাজদুটো যেখানে আছে তাদের দৃষ্টিশক্তির বাইরে হলেও বেশি দূরে নয় সে জায়গা। তিনদিন আগে ক্যাপ্টেন পেরো সমুদ্রের বুকে মিলিত হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। সান্টা মারিয়ার নাবিকরা কেউ প্রয়োজনবোধে লড়াইতে পারদর্শী নয়। তাদেরকে জাহাজে ক্যাপ্টেন কোহেলোর কাছে রেখে কোহেলোর ভূতপূর্ব জলদস্যু সঙ্গীদের নিয়ে এসে তিনদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন ক্যাপ্টেন পেরো। এ-লোকগুলো সাধারণ নাবিক নয়। নৃশংসতা এদের রক্তে। বলা যায় না, অধৈর্য হয়ে এরা হয়তো শেষপর্যন্ত হামলা করে বসল ক্যাপ্টেন পেরোর ওপরেই।

ফ্রান্সিসের সঙ্গে আলোচনা করে ক্যাপ্টেন পেরো সিদ্ধান্ত নিলেন, ক্যাপ্টেন কোহেলোর সঙ্গে দেখা করাই ভালো। তারপর এস্তাদিওকে তার হাতে তুলে দিয়ে তার কথামতো যা সিদ্ধান্ত নেবার নেওয়া যাবে।

দুটো জাহাজেরই নোঙর তোলার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন পেরো।

নোঙর তোলার মুহূর্তে যে ঝাঁকুনি হয় তা অনুভব করে অন্ধকার কক্ষে বন্দি এস্তাদিও বুঝতে পারল জাহাজ আবার চলতে শুরু করেছে। কিন্তু মৎস্যগন্ধা কোথায়? সে কি এল না? নাকি তাকে নিয়েই চলতে শুরু করেছে এ-জাহাজ? ভাবতে লাগল শঙ্কিত এস্তাদিও। ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস মকরবাহিনীর ডেকেই রইলেন। সান্টা মারিয়ার পিছন পিছন এগিয়ে চলল মকরবাহিনী।

সমুদ্রের একটু ভিতরেই নোঙর করা ছিল পর্তুগিজ রণপোতটা। বেশিক্ষণ লাগল না সে জায়গাতে পৌঁছতে। রণপোতের দু-পাশে দাঁড় করানো হল সান্টা মারিয়া আর মকরবাহিনীকে। রণপোত থেকে গায়ে লাগানো দুটো জাহাজের মধ্যেই কাঠের পাটাতন ফেলা হল। একসঙ্গে জুড়ে গেল তিনটে জাহাজ। মকরবাহিনীর ডেকে ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিসকে দেখতে পেয়ে ক্যাপ্টেন কোহেলো পাটাতন বেয়ে নেমে এলেন মকরবাহিনীর ডেকে।

ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ক্যাপ্টেন কোহেলোর কাছে বিবৃত করল সব কথা। সব শুনে ক্যাপ্টেন কোহেলো বললেন, 'চলুন, আগে বণিক এস্তাদিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। আর এ-জাহাজের যে-লোকগুলো বেঁচে আছে, তাদের আর বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। ওদের কে খাওয়াবে? ওদের বরং হাঙরের খাদ্য করা হোক।'

BanglaBook.org

ক্যাপ্টেন কোহেলোর পিছন পিছন আরও কয়েকজন লোক নেমেছিল মকরবাহিনীর ডেকে। কোহেলোর কথা শোনামাত্রই তারা ছুটে গিয়ে রজ্জুবদ্ধ তিনজন মাল্লাকে উঠিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সমুদ্রে। জলরাশির মধ্যে হারিয়ে গেল তাদের আর্তনাদ। ক্যাপ্টেন কোহেলোকে নিয়ে ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস এরপর এগোল খোলের ভিতর।

বাইরে দিনের আলো আছে। খোলের গায়ে যে ছোট ছিদ্র বা গবাক্ষগুলো আছে তা দিয়ে কিছুটা আলো ঢুকছে খোলের ভিতর। সেই আলোতে ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিসের সঙ্গে এক চোখে কালো পট্টিবাঁধা যে-লোকটা এস্তাদির গরাদঘরের সামনে হাজির হল তাকে চিনতে পারল না এস্তাদিও।

ক্যাপ্টেন পেরোই তার পরিচয় দিলেন। তিনি বললেন, 'ইনি হলেন ক্যাপ্টেন কোহেলো। অ্যাডমিরাল ভাস্কোই ক্যাপ্টেন কোহেলোকে রণপোত দিয়ে পাঠিয়েছেন আপনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য। উনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।'

ক্যাপ্টেন কোহেলো এরপর এস্তাদিওর উদ্দেশ্যে হেসে বললেন, 'আমি দুঃখিত, এভাবে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে হল বলে। কিন্তু এছাড়া উপায় ছিল না।'

এস্তাদিও ব্যঙ্গের সুরেই জবাব দিল, 'আমাকে সমবেদনা জানাবার জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।'

কোহেলো বললেন, 'আশা করি আমার কথা শুনে চললে গোয়া পর্যন্ত যাত্রাপথে আমি এ সৌজন্য বজায় রাখতে পারব।'

'সেই সিন্দুকটা এখন কোথায়?' সরাসরি প্রশ্ন করলেন কোহেলো।

এস্তাদিও বলল, 'আমি ক্যাপ্টেন পেরোকে আগেই বলেছি এখন আপনাকেও বলছি, ওই সিন্দুকের কোনও অস্তিত্ব নেই। পেড্রো মিথ্যা বলেছে।'

ক্যাপ্টেন কোহেলো ধূর্ত হেসে বললেন, 'দেখুন এস্তাদিও, আপনি যতটা আমাকে বোকা ভাবছেন আমি ততটা নই। যদি ধরেও নিই যে, সিন্দুকের গল্পটা বানানো ছিল, তবে ওই বানানো গল্প শুনেই কি অ্যাডমিরাল আমাকে সিন্দুকটা উদ্ধারের জন্য পাঠালেন? তাঁকে কি আপনি এতটা শিশুসুলভ মনে করেন? নিশ্চিত অমন কোনও সিন্দুকের অস্তিত্ব আছে, যে-ব্যাপারটা আমরা না জানলেও অ্যাডমিরাল জানেন। পেড্রো কথাটা বানিয়ে বলেনি। কারণ সে জানে যে, এই মিথ্যা বলার জন্য আমরা তাকে হাঙরের মুখে ফেলে দিতে

BanglaBook.org

পারি বা মাস্তুল থেকে ঝুলিয়ে দিতে পারি। আর একটা ব্যাপার। আপনি বলতেই পারতেন যে সে-রাতে আপনারা অমন একটা সিন্দুক উদ্ধার করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তা খোলার পর দেখেছেন তার মধ্যে পাথরের মূর্তি বা পুঁথির মতো কিছু বাজে জিনিস ছিল। কিন্তু আপনি সরাসরি অস্বীকার করছেন ব্যাপারটা। এটাই প্রমাণ করছে ওই সিন্দুকে মূল্যবান কিছু জিনিস আছে।'

একটানা কথাগুলো বলে এক চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে ক্যাপ্টেন কোহেলো এস্তাদিওর মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাব পাঠ করার চেষ্টা করলেন।

এস্তাদিও নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

ক্যাপ্টেন কোহেলো প্রশ্ন করলেন, 'সেই সিন্দুক বা তার ভিতরের জিনিসগুলো কোথায়? সেগুলো কি নাখোদা আব্বাস আর মৎস্যগন্ধা নামের গণিকা বহন করে আনছে?'

এবারও তার কথার জবাব দিল না এস্তাদিও।

ক্যাপ্টেন কোহেলো বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি একটু ভেবে নিন কথাগুলো বলবেন কিনা? তারপর দেখি কী করা যায়?'

এরপর খোল ছেড়ে ডেকের ওপর উঠে এলেন কোহেলো।

ক্যাপ্টেন পেরো বললেন, 'ও যদি কথাগুলো বলতে না চায় তবে কী করবেন?'

কোহেলো বললেন, 'অন্য কেউ হলে রোজ ওর হাতের আঙুল একটা করে কেটে নিতাম। এভাবে অনেকেরই পেট থেকে কথা আদায় করেছি আমি। একসময় কাটা-আঙুল জমানো নেশা ছিল আমার। কিন্তু ওকে সেটা করা যাবে না। কারণ অ্যাডমিরাল ওকে তাঁর সামনে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছেন।'

ফ্রান্সিস বলল, 'তবে কী আমরা এখানে অপেক্ষা করব মৎস্যগন্ধারা আসে কিনা তা দেখার জন্য?'

ক্যাপ্টেন কোহেলো বললেন, 'ওই সিন্দুকটা আমাদের উদ্ধার করতেই হবে। এমন হতে পারে যে আপনারা যখন বণিকের জাহাজ আক্রমণ করলেন তখন ওরা কাছেই ছিল। ব্যাপারটা ওরা দেখেছে। এমনও হতে পারে ওরা এদিকেই আসছে। ওদেরকে টোপ দিয়ে এখানে আমাদের কাছে আনতে হবে।'

'কী টোপ?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন পেরো।

একটু ভাবার পর ক্যাপ্টেন কোহেলোর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল।

BanglaBook.org

তিনি বললেন, 'লোকটার বুকে দড়ি বেঁধে রয়াল মাস্ট থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া যাক। তারা যদি এদিকে আসে তবে নিশ্চই দূর থেকে দেখতে পাবে মাস্তুলে ঝুলন্ত-এস্তাদিওকে। আর ওই বন্দর সুন্দরী যদি সত্যি বণিককে ভালোবাসে তবে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা দেখামাত্রই ছুটে আসবে তাকে বাঁচাবার জন্য।'

এরপর ক্যাপ্টেন কোহেলোর নির্দেশে কিছুক্ষণের মধ্যেই এস্তাদিওকে উঠিয়ে আনা হল ডেকে। কোহেলো তাকে বললেন, 'ভাবলেন কিছু? বলুন সেই সিন্দুক কোথায়?'

এস্তাদিও জবাব দিল না তার কথায়।

কোহেলো হেসে বললেন, 'তাহলে আপাতত আপনাকে মাস্তুল থেকে ঝুলিয়ে দিচ্ছি আমরা। ঝুলতে ঝুলতে সিন্দুকটার কথা ভাবুন আপনি। মনে পড়লে বলবেন, আমরা আপনাকে আবার নীচে নামিয়ে আনব। খোলের গরাদঘরটা বড় স্যাঁতস্যাঁতে আর অন্ধকার। আপনার আলো-বাতাসের মধ্যে থাকা প্রয়োজন।'

এস্তাদিওর হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। তার ফাঁক দিয়ে কাঁধের কাছে একটা শক্ত লম্বা লাঠি চালান করে দেওয়া হল। তারপর সেই শক্ত লাঠিটার দু-প্রান্তে রশি বেঁধে তাকে টেনে তোলা হল রয়াল মাস্টে। মাস্তুলের মাথা থেকে ঝুলতে লাগল এস্তাদিও।

BanglaBook.org

২০

ক্যাপ্টেন কোহেলোর অনুমানই ঠিক। খাঁড়ি থেকে সমুদ্রে প্রবেশ করার সময় নাখোদা আব্বাস হঠাৎ নৌকা থামিয়ে সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখাতেই মৎস্যগন্ধা দেখতে পেল সেই দৃশ্য। জলের মধ্যে একটা অংশ মশালের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। এস্তাদিওর জাহাজটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একটা জাহাজ। মশাল হাতে পাশের জাহাজ থেকে লোক ঝাঁপিয়ে পড়ছে এস্তাদিওর জাহাজের ডেকে। আর এরপরই চিৎকার-চেঁচামেচি আর বন্দুকের শব্দ ভেসে আসতে লাগল সেখান থেকে।

দৃশ্যটা দেখেই মৎস্যগন্ধা অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল, 'কী হচ্ছে ওখানে?'

আব্বাস তাড়াতাড়ি খাঁড়ির একপাশে ছোট নৌকাটা সরিয়ে নিয়ে বলল,

'সম্ভবত জলদস্যু জাহাজ আক্রমণ করেছে।'

কথাটা শুনেই কেঁপে উঠল মৎস্যগন্ধা। সে বলে উঠল, 'এস্তাদিও যে ওখানে আছে!'

নাখোদা বলল, 'এখন ওখানে গেলে আপনারও বিপদ অবশ্যম্ভাবী। দেখা যাক কী হয়?'

মৎস্যগন্ধার মনে পড়ল তার বুকের মধ্যে রাখা বুদ্ধমূর্তিটার কথা। বুকের ভিতর থেকে চন্দনকাঠের টুকরোটা বের করে সেটা বুকে চেপে ধরে মৎস্যগন্ধা মনে মনে বলতে লাগল, 'হে ভগবান, তুমি নাবকিকে রক্ষা করো, রক্ষা করো।' এর কিছুক্ষণের মধ্যেই চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ থেমে গেল। তারপর ধীরে ধীরে মশালের আলোগুলোও নিভে গেল। ক্ষয়াটে চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে রইল নিস্তব্ধ জাহাজ-দুটো।

আব্বাস বলল, 'রাত শেষ হতে আর বেশি বাকি নেই। ভোরের আলো ফুটলে হয়তো ব্যাপারটা বোঝা যাবে।'

চন্দনকাঠের টুকরোটা বুকে চেপে ধরে আগের মতোই ভগবানকে ডাকতে থাকল মৎস্যগন্ধা।

ভোর হল এক সময়। চারপাশে আলো ছড়িয়ে পড়লেও এ যেন কেমন বিবর্ণ বিষণ্ণ ভোর। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মমতো পতাকা ওড়ানো হল এস্তাদিওর পাশের জাহাজটাতে। ক্রুশ আঁকা রক্তবর্ণের পতাকা। তাই দেখে মৎস্যগন্ধা বলে উঠল, 'আরে! ও পতাকাটা আমি চিনি। পর্তুগালের পতাকা। ওটা জলদস্যুদের জাহাজ নয়, সান্টা মারিয়া! যে জাহাজ নিয়ে বণিক এসেছিল তমালিকা বন্দরে। তিনদিন আগে জাহাজটা বন্দর ছেড়েছিল।'

আব্বাস তার কোমর থেকে একটা আতসকাচের নল বের করে জাহাজদুটোকে দেখল। কিন্তু তেমন কিছু দেখতে পেল না। আব্বাস বলল, 'তাহলে সম্ভবত ওরা তাকে ধরার জন্যই এখানে অপেক্ষা করছিল। আবার এমনও হতে পারে যে হঠাৎই সাক্ষাৎ হয়ে গেছে দুটো জাহাজের।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'আমার ধারণা ওকে ওরা মারবে না। অ্যাডমিরাল ভাস্কোর কাছে ধরে নিয়ে যাবে।'

বেলা বেড়ে চলল। কিন্তু জাহাজদুটো একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। আব্বাস একসময় বলল, 'কিন্তু বুঝতে পারছি না ওরা এখানে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন?'

BanglaBook.org

মৎস্যগন্ধা বলল, 'এমন তো নয় যে, এস্তাদিও জানিয়েছে যে আমরা আসছি। আমাদের জন্যই ওরা অপেক্ষা করছে? চলো তবে জাহাজে যাই। তারপর যা হবার হবে।'

নাখোদা বলল, 'চট করে ওখানে যাওয়া বিপদ হতে পারে। আর একটু সময় অপেক্ষা করি।'

সময় যত এগোতে লাগল এস্তাদিওর কথা ভেবে তত অস্থির হয়ে উঠতে লাগল মৎস্যগন্ধা।

সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর উঠল তখন হঠাৎই জাহাজদুটো নড়ে উঠে চলতে শুরু করল। তাই দেখে মৎস্যগন্ধা বলে উঠল, 'চলো চলো। ওরা যে চলে যাচ্ছে!'

খাঁড়ি থেকে নৌকা বের করল আব্বাস। সামনেই নদী প্রবল জলস্রোতে মিলে মিশে ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে। চারপাশে পাক খাচ্ছে পাটকিলে রঙের জলস্রোত। ছোট নৌকাকে সেখানে সামলে রাখা মুশকিল। আব্বাশ দক্ষ হাতে সে জায়গাটাকে যখন সামলাল ততক্ষণে অনেক দূরে সরে গেছে জাহাজদুটো। জাহাজের গতিবেগের সঙ্গে নৌকা পাল্লা দিতে পারে না। ধীরে ধীরে ছোট হতে হতে একসময় বিন্দুর মতো মিলিয়ে গেল জাহাজদুটো। মৎস্যগন্ধা বলে উঠল, 'ওদিকে চলো। আমাকে যেভাবেই হোক পৌঁছোতে হবে এস্তাদিওর কাছে। নিশ্চই সন্ধ্যা নামলে জাহাজ কোথাও নোঙর করবে। যেভাবেই হোক আমাকে তার কাছে পৌঁছোতে হবে। পৌঁছোতেই হবে। যে-কোনও কিছুর বিনিময়ে রক্ষা করতে হবে নাবিককে।'

নাখোদা আব্বাস বলে উঠল, 'মুকাল্লাফ ফিল বাহর।'

সমুদ্রের রক্ষাকর্তার নাম নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়ল নাখোদা আব্বাস। জাহাজদুটো যেদিকে গেছে সেদিকে এগোতে লাগল সে। সমুদ্রর তরঙ্গরাশিতে মোচার খোলের মতো দুলতে লাগল তাদের ছোট্ট ডিঙি নৌকাটা। এ-নৌকা নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়ার সাহস বা ক্ষমতা হয়তো বা শুধু আব্বাসেরই ছিল। নদীতে যারা নৌকা চালায় এ সাহস তাদের হোত না। মৎস্যগন্ধার চোখদুটো ব্যাকুলভাবে খুঁজতে লাগল যদি কোনও কালো বিন্দু দেখা যায় দিক্‌চিহ্নহীন মহার্ণবের বুকে! যদি দেখা মেলে জাহাজ-দুটোর!

শেষপর্যন্ত অবশ্য দেখা মিলল তাদের। তখন প্রায় বিকেল হতে চলেছে। সমুদ্রের বুকে দেখা দিল সেই কালো বিন্দু। জাহাজ! জায়গাটা সমুদ্রের ভিতরে

BanglaBook.org

হলেও মোহনা থেকে খুব বেশি দূর নয়। কিন্তু ছোট নৌকা নিয়ে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ ভেঙে সে জায়গাতে পৌঁছোতে অনেক সময় লেগেছে মৎস্যগন্ধাদের। জাহাজদুটো নিশ্চই অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে গেছিল বলে অনুমান হল আব্বাসের। সে এগোল সেই কালো বিন্দুর দিকে। একসময় তারা বুঝতে পারল, দুটো নয়, তিনটে জাহাজ আছে সেখানে। একটা বেশ বড় জাহাজ। আর তার দুপাশে দুটো ছোট জাহাজ। ক্রমশই তাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হতে লাগল সবকিছু। বড় জাহাজটার মাস্তুলেও পর্তুগালের পতাকা উড়ছে। ডেকে বসানো সার সার কালো কালো জিনিসগুলো যে কামান তা বুঝতে অসুবিধা হল না অভিজ্ঞ নাখোদা আব্বাসের। আরও একটু এগিয়ে জাহাজগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎই যেন একটা জিনিস ধরা দিল তার চোখে। নৌকার হাল ছেড়ে দিয়ে কোমর থেকে নলটা বের করে চোখে লাগাল সে। তারপর বলে উঠল, 'হায় খোদা!'

মৎস্যগন্ধা বলে উঠল, 'কী হল?'

নলটা মৎস্যগন্ধার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আব্বাস বলল, 'আমাদের জাহাজের মাস্তুলগুলো দেখুন। মৎস্যগন্ধা চোখ লাগান আতসকাচ পরানো নলে। কাছে এগিয়ে এল জাহাজের মাস্তুলগুলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে থরথর করে কেঁপে উঠল মৎস্যগন্ধা। মকরবাহিনীর মাস্তুল থেকে ঝুলছে একটা লোক। আর তাকে চিনতে পেরেছে মৎস্যগন্ধা। এস্তাদিও!!!

নাখোদা বলল, 'এবার আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'না, ফিরব না। এস্তাদিও জীবিত হোক বা মৃত, ওর কাছে যেতেই হবে আমাকে। আর দেরি কোরো না। তাড়াতাড়ি চলো।'

নাখোদা বলে উঠল, 'যা মনে হচ্ছে, একবার ওখানে গেলে আর ফেরা যাবে না। মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে ওখানে।

মৎস্যগন্ধা বিহ্বলভাবে তিরস্কার করে বলল, 'আমি যদি নারী হয়ে মৃত্যুভয় না পাই তবে তুমি পুরুষ হয়ে মরতে ভয় পাচ্ছ? শুনেছি নাবিকরা সাহসী হয়, তারা মরতে ভয় পায় না। আজ বুঝলাম সে-কথা ভুল। এস্তাদিও তোমার ওপর ভরসা করেছিল। নিমকহারাম তুমি। নৌকা না এগোলে আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে জাহাজের কাছে যাব।'

মৎসগন্ধার বলা 'নিমকহারাম' শব্দটা যেন চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল নাখোদার ওপর। মুহূর্তের মধ্যে তার চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল। সে বলল,

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, আমি এ-ক'দিন মালিকের নুন খেয়েছি। তবে আমি নিমকহারামও নই, মরতেও ভয় পাই না। আমি আপনার বিপদের কথাই ভাবছিলাম। চলুন তবে। কিন্তু আপনি কী দিয়ে ওদের মোকাবিলা করবেন আমি জানি না। "মুকাল্লাফ ফিল বাহর" আমাদের রক্ষা করুন।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'লোকে বলে বন্দর সুন্দরীদের কোনও মন থাকে না, শুধু দেহ থাকে। দেখি এই দেহটাকেই আজ ওদের মোকাবিলা করার জন্য কাজে লাগানো যায় কিনা?'

আর এরপরই মৎস্যগন্ধা নলটা চোখে লাগিয়ে বলল, 'ও নড়ছে! নড়ছে! এখনও বেঁচে আছে নাবিক! হ্যাঁ ও বেঁচে আছে! ওকে বাঁচাতে হবে। তাড়াতাড়ি চলো, তাড়াতাড়ি।'

নাখোদা আব্বাস আর কথা না বাড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউ পেরিয়ে এগোল জাহাজগুলোর দিকে।

বেশ অনেকক্ষণ ধরে মাস্তুল থেকে ঝুলছে এস্তাদিও। পিঠ আর কাঁধের মাংসপেশি যেন ছিঁড়ে যেতে চাইছে। শরীর অসাড় হয়ে আসছে। ওপর থেকে যতদূর চোখ যায় চারদিকে শুধু কালো জলরাশি। জীবনের কোনও স্পন্দন দেখা যাচ্ছে না কোথাও। পায়ের নীচে আছে মৃত পার্বিকদের লাশগুলো। এ যেন এক মৃত্যুসমুদ্র। মৃত্যু যেন হাতছানি দিচ্ছে এস্তাদিওকে। তারই মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় এস্তাদিও ভাবছিল মৎস্যগন্ধার কথা। সে কি তবে আবার তমালিকা বন্দরে ফিরে গেল? ভালোই করেছে সে। জীবনটা অন্তত তার বেঁচে গেল। আর হয়তো তার কোনওদিন মৎস্যগন্ধার সঙ্গে দেখা হবে না। তবে যেখানেই থাকুক যেন ভালো থাকে মৎস্যগন্ধা।

ঝুলতে ঝুলতে এসবই ভাবছিল এস্তাদিও। কিন্তু হঠাৎই তার চোখ পড়ল নীচের দিকে। একটা ছোট নৌকা এগিয়ে আসছে তার জাহাজটার দিকে। নৌকার আরোহীদের দেখে চিনতে পারল এস্তাদিও। আব্বাস নৌকা বাইছে আর মৎস্যগন্ধা নৌকা থেকে তার দিকে হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। তাকে দেখামাত্র এস্তাদিও চিৎকার করে বলতে থাকল, 'ফিরে যাও তোমরা। পালাও পালাও। এখানে এলে বাঁচবে না। পালাও পালাও।'

কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত করল না মৎস্যগন্ধা। নৌকাটা ক্রমশ জাহাজের গায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। ক্যাপ্টেন কোহেলো তার রণপোতের কেবিনে বসে মদ্যপান করছিলেন ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিসকে নিয়ে। মাস্তুলের

ওপর থেকে এস্তাদিওর চিৎকার শুনে তারা বাইরে বেরিয়ে পাটাতন বেয়ে উপস্থিত হলেন মকরবাহিনীর ডেকে। ততক্ষণে মৎস্যগন্ধার নৌকা এসে ভিড়েছে জাহাজের গায়ে। ওপর থেকে এস্তাদিও শেষ একবার চিৎকার করে উঠল, 'পালাও মৎস্যগন্ধা, পালাও। জাহাজে উঠো না।'

সে চিৎকার শুনে হাসি ফুটে উঠল ধূর্ত কোহেলোর ঠোঁটে। তার পরিকল্পনা সফল হয়েছে। কোহেলোর নির্দেশে দড়ির মই নামিয়ে দেওয়া হল জাহাজের গায়ে। আর সেই মই বেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই মকরবাহিনীর ডেকে উঠে এল মৎস্যগন্ধা আর নাখোদা আব্বাস।

ক্যাপ্টেন কোহেলো বেশ অবাক হয়ে গেলেন তাকে দেখে। তিনি শুনেছিলেন, এ গণিকা নাকি খুব সুন্দরী। কিন্তু মৎস্যগন্ধা যে এত সুন্দরী তা তার ধারণা ছিল না। তার দেহের প্রতিটা অংশে যেন জেগে আছে যৌনতার হাতছানি। যেন সমুদ্রের বুক থেকে জাহাজের ডেকে উঠে এল কোনও জলপরি!

ক্যাপ্টেন কোহেলো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মৎস্যগন্ধার সামনে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'আমি ক্যাপ্টেন কোহেলো। তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই তিনটে জাহাজই এখন আমার নিয়ন্ত্রানাধীন। আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। কিছু কাজের কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'সব কথা হবে। কিন্তু তার আগে এস্তাদিওকে মাস্তুল থেকে নামাও।'

ধূর্ত কোহেলো বরাবরই কৌশলে কাজ হাসিলের পক্ষপাতী। তিনি তার অনুচরদের বললেন, 'ওকে ওপর থেকে নীচে নামিয়ে খোলে নিয়ে যাও। খাবার আর জল দাও।'

ক্যাপ্টেন কোহেলোর নির্দেশ পালিত হল সঙ্গে সঙ্গে। এস্তাদিওকে নামিয়ে আনা হল। তারপর তাকে টানতে-টানতে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল খোলের দিকে। এস্তাদিও আর্তনাদ করে উঠল, 'তুমি এখানে কেন এলে মৎস্যগন্ধা? শয়তানগুলো তোমাকেও ছাড়বে না।'

মৎস্যগন্ধা বলে উঠল, 'ওকে নিয়ে যেও না। এখানেই রাখো।'

ক্যাপ্টেন কোহেলো বলে উঠলেন, 'তোমার চিন্তা নেই বন্দরসুন্দরী। ওর কোনও ক্ষতি হবে না। আগে তোমার সঙ্গে আমার কথাবার্তা মিটে যাক। তারপর নিশ্চই কথা বলার সুযোগ পাবে ওর সঙ্গে।'

BanglaBook.org

এস্তাদিওকে নিয়ে খোলের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল ক্যাপ্টেন কোহেলোর লোকগুলো।

মৎস্যগন্ধা ক্যাপ্টেন কোহেলোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাপ্টেন পেরো বা ফ্রান্সিসের পরিচয় জানে না। সে তাদের কোনও দিন দেখেনি। শুধু এস্তাদিওর মুখে নামই শুনেছে এদের। তবে পেড্রোকে সে দেখে চিনতে পারল। কারণ পেড্রো এক সময় বেশ কয়েকবার গণিকালয়ে গেছিল। মৎস্যগন্ধা কিছুটা তফাতে ভিড়ের মধ্যে চিনতে পারল তাকে। আর তার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে এ-ও বুঝতে পারল যে, পেড্রো যোগ দিয়েছে এ-লোকগুলোর সঙ্গে। আরও একটা জিনিস সে বুঝতে পারল যে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা চোখে কালো টুপি পরা লোকটাই এখানকার সর্বময় কর্তা। কারণ সে-ই সব নির্দেশ দিচ্ছে। আর বাকিরা তা পালন করছে।

মৎস্যগন্ধা এরপর ক্যাপ্টেন কোহেলোকে জিগ্যেস করল, 'তোমার কী জানার আছে বলো?'

এতজন লোকের সামনে সিন্দুকের কথাটা পাড়া উচিত মনে করলেন না বিচক্ষণ কোহেলো। হাজার হোক তার সঙ্গীরা সব তারই মতো একসময় জলদস্যু ছিল। তাদের তিনি বিলক্ষণ চেনেন। নেহাত ফাঁসি এড়াতে তারা তারই মতো অ্যাডমিরাল ভাস্কোর অনুগামী হয়েছে। কাজেই ক্যাপ্টেন কোহেলো মৎস্যগন্ধাকে বলল, 'চলো, আমরা আমার রণপোতের কেবিনে যাই। সেখানে বসেই কথা হবে।'

এমনই একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল মৎস্যগন্ধা। সে বলল, 'আমিও একান্তেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। দ্বিতীয় কেউ যেন সেখানে না থাকে।'

যে-কোনও মূল্যে সেই সিন্দুকের খবর করাই তার আসল কাজ। আর সেটা যদি মসৃণভাবে হয়ে যায় তবে আপত্তি কী? ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস একটু হয়তো অসন্তুষ্ট হবে জেনেও কোহেলো বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে।'

ক্যাপ্টেন কোহেলোর পিছন পিছন পাটাতন বেয়ে রণপোতে উঠে এল মৎস্যগন্ধা। তারপর প্রবেশ করল গালিচা মোড়া ক্যাপ্টেন কোহেলোর খাস কামরায়। ঘরে ঢুকে কোহেলো কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘরটা বেশি বড় নয়। গদি- আঁটা একটা ছোট পালঙ্ক আর একটা চারপায়া ঘিরে ক'টা কেঠো আসন রাখা আছে সেখানে। টেবিলের ওপর রাখা আছে পানীয় বোতল

BanglaBook.org

আর ক'টা স্বচ্ছ পাত্র। কিছু সময় আগে ক্যাপ্টেন কোহেলো সেগুলো নিয়ে বসেছিলেন ক্যাপ্টেন পেরোদের সঙ্গে। বাইরে বিকেল হয়ে গেছে। সূর্য এবার ঢলতে শুরু করবে সমুদ্রে। চারপায়ার সামনে মুখোমুখি দুটো আসনে বসল ক্যাপ্টেন কোহেলো আর মৎস্যগন্ধা।

কোহেলো কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মৎস্যগন্ধার রূপের দিকে। তারপর সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আর এস্তাদিও মিলে গভীর রাতে বুদ্ধমন্দির থেকে যে সিন্দুকটা উদ্ধার করেছিলে সেটা কোথায়? অ্যাডমিরাল ভাস্কো সেটা নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।'

কথাটা শুনে মৎস্যগন্ধা প্রচণ্ড বিস্মিত হলেও মুখে তা প্রকাশ করল না। মুক্তোর মতো হাসি ছড়িয়ে সে জানতে চাইল, 'এ খবর তোমরা পেলে কোথায়?'

কোহেলো জবাব দিলেন, 'পেড্রো তোমাদের অনুসরণ করেছিল সে-রাতে। সে বলেছে।'

মৎস্যগন্ধা বুঝতে পারল যে ব্যাপারটা অস্বীকার করে লাভ নেই। অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে মাথা ঠান্ডা রেখে। সে বলল, 'বলব, বলব, সব বলব তোমাকে। আমি কি জানি না যে, এখানে এলে তোমার প্রশ্নের জবাব না দিলে পার পাওয়া যাবে না। তাছাড়া তুমি কিন্তু বেশ সুপুরুষ। এমন পুরুষ আমার ভালো লাগে। আমি অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি। আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও। আর তুমিও এই ফাঁকে একটু পান করে মনটাকে সতেজ করো।' এই বলে একটা পাত্র নিয়ে তাতে মদ ঢেলে মৎস্যগন্ধা সেটা বাড়িয়ে দিল কোহেলোর দিকে।

কোহেলো বেশ বিস্মিত হলেন ব্যাপারটাতে। সাক্ষাৎ জীবন-মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়েও এমন শান্ত থাকতে পারে কোনও নারী, তা কোহেলোর জানা ছিল না। মদপূর্ণ পাত্রটা নিয়ে কোহেলো ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিলেন।

এরপর তিনি চেয়ে রইলেন মৎস্যগন্ধার দিকে। মৎস্যগন্ধা এরপর কোহেলোর হাত থেকে পাত্রটা নিয়ে তাতে মদ ঢেলে পরিপূর্ণ করল। কড়া জাহাজি মদের গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে ঘরটা।

বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। তারপর মৎস্যগন্ধা মদের পাত্রটা কোহেলোর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বেশ গরম লাগছে এখানে। হাওয়া-বাতাস নেই।' কথাগুলো বলে মৎস্যগন্ধা হঠাৎই গরম লাগার ভান করে ওড়নাটা

BanglaBook.org

সরিয়ে নিল। উন্মুক্ত হয়ে গেল তার শরীরে সামনের বহিঃ আবরণ। কোহেলোর চোখে ধরা দিল মৎস্যগন্ধার আঁটসাঁট বক্ষ-আবরণীর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা দুই শুভ্র স্ফীত স্তনের মাঝে গিরিখাদের মতো ঘন সন্নিবিষ্ট, তরমুজের ফালির মতো বক্ষ বিভাজিকা, মেদহীন সরু কোমরের ঠিক মাঝখানে রুপোর কাঁচা টাকার মতো সুগভীর নাভি। সেদিকে চেয়ে ঘোর লেগে গেল কোহেলোর। দ্বিতীয় পাত্রটাও দ্রুত গলধঃকরণ করে নিলেন ক্যাপ্টেন কোহেলো। আগে ক্যাপ্টেন পেরোর সঙ্গে বসে বেশ কয়েক পাত্র মদ্যপান করেছেন। আরও দু-পাত্র মদ্যপানের পর মৎস্যগন্ধার অর্ধ উন্মুক্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ধাঁধা লাগতে লাগল ক্যাপ্টেন কোহেলোর।

তবুও নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে কোহেলো বললেন, 'এবার সিন্দুকটার কথা বলো।'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'বলছি। এখনই তার সন্ধান দেব তোমাকে।' কথাগুলো বলে মৎস্যগন্ধা চারপেয়ের ওপর থেকে বোতলটা তুলে এনে দাঁড়াল কোহেলোর সামনে। তারপর কোহেলোর গলা জড়িয়ে বলল, 'সেটা কাছাকাছি আছে। আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি যেখানে। কিন্তু আমি-তুমি ছাড়া কেউ থাকবে না সেখানে। সেই পেটিকা, আমার শরীর সবই আজ তোমাকে দেব আমি। চলো, এবার আমরা বণিক এস্তাদিওর জাহাজে যাই। তার আগে আর একটু পান করে নাও।'

কোহেলো চমকে উঠে বলল, 'সেটা তবে ওই জাহাজেই আছে?'

মৎস্যগন্ধা বোতলটা কোহেলোর ঠোঁটের সামনে ধরে বলল, 'হ্যাঁ, সেখানেই।'

ঠোঁট ফাঁক করলেন কোহেলো। মৎস্যগন্ধা বোতলের বাকি অংশটাই প্রায় সবই তাঁর মুখে ঢেলে দেবার পর কোহেলো উঠে দাঁড়ালেন। মৎস্যগন্ধা বলল, 'মকরবাহিনীর খোল ফাঁকা করে দিতে হবে। আমরা যতক্ষণ সেখানে থাকব কেউ যেন সেখানে না ঢোকে। সে-ঐশ্বর্য আমি অন্য কাউকে দেখাতে চাই না।'

রণপোত ছেড়ে কাঠের পাটাতন বেয়ে মৎস্যগন্ধাকে নিয়ে কোহেলো আবার ফিরে এলেন মকরবাহিনীর ডেকে। ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস দাঁড়িয়েছিলেন ডেকে। তিনি তাদের বললেন, 'তোমাদের কোনও লোক খোলের মধ্যে থাকলে বেরিয়ে আসতে বলো।'

BanglaBook.org

যে দু-চারজন লোক খোলের মধ্যে ছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বাইরে বেরিয়ে এল। কোহেলোর নির্দেশে একটা লোক একটা মশাল জ্বালিয়ে এনে তার হাতে দিল। কোহেলো, মৎস্যগন্ধাকে নিয়ে পা বাড়াল খোলে নামার জন্য। আর তা দেখে ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিসও তাদের পিছনে পা বাড়াতে গেলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ক্যাপ্টেন কোহেলো পিছনে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন পেরোকে বললেন, 'পেরো, আপাতত আপনারা এখানেই থাকুন। আমি খোল থেকে ঘুরে আসছি।'

মৎস্যগন্ধা এবার বুঝতে পারল এই লোকটাই তবে ক্যাপ্টেন পেরো আর তার সঙ্গী নিশ্চই সেই ফ্রান্সিস হবে। পেরোর নির্দেশে থমকে গেল তারা দুজন। সমুদ্রের বুকে তখন সূর্য ডুবতে শুরু করেছে, ক্যাপ্টেন কোহেলো আর মৎস্যগন্ধা প্রবেশ করল অন্ধকার খোলের ভিতর।

মকরবাহিনীর খোলের বহির্দেশে যেখানে ফেরানো চোখের ছবি আঁকা আছে, খোলের ভিতর ঠিক সে জায়গাতে গিয়ে থামল মৎস্যগন্ধা। এ-জায়গাতে যে পেটিকাটা লুকানো থাকবে তা এস্তাদিওই জানিয়েছিল তাকে। মশালের আলোতে সে জায়গা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতেই পাটাতনের গায়ে একটা প্রায়-অদৃশ্য জোড় চোখে পড়ল তার। আর সে জায়গাতে একটু টানাটানি ধাক্কাধাক্কি করতেই সরে গেল কাঠের পাটাতনটা। উন্মোচিত হল গোপন গহ্বর। হ্যাঁ, তার মধ্যেই রাখা আছে হাত-চারেক চওড়া, একহাত মতো লম্বাটে ধরনের কাঠের পেটিকা বা সিন্দুকটা! ধীরে ধীরে তার ডালাটা খুলল মৎস্যগন্ধা। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের অন্ধকার মুছে গেল। সেদিকে তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না ক্যাপ্টেন কোহেলো। বাক্সর মধ্যে থরে থরে সাজানো আছে মূল্যবান পাথর আর স্বর্ণখণ্ড! এত সম্পদ এর আগে কোনওদিন দেখেনি জলদস্যু সর্দার কোহেলো।

মৎস্যগন্ধা বলে উঠল, 'এ সম্পদ তোমার অ্যাডমিরাল ভাস্কো কোনও দিন চোখে দেখেননি। তার কাছে থাকা তো দূরের কথা। এ-সম্পদ তোমার হতে পারে। শুধু এই পেটিকাই নয়, আরও এমন এক সিন্দুক লুকোনো আছে দূরের এক জায়গাতে। আমি তোমাকে সে-জায়গাতে নিয়ে যেতে পারি।'

কোহেলো জানতে চাইলেন, 'সে জায়গা কোথায়?'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'চলো আবার তোমার কেবিনে ফিরে যাই! সেখানে ফিরে বলব।' সিন্দুকটা এখানেই আপাতত থাক।' এই বলে পাটাতন ঠেলে ফোকরটা

BanglaBook.org

বন্ধ করে দিল মৎস্যগন্ধা।

কিছুটা টলতে টলতেই বাইরে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন কোহেলো। একে তো মদের নেশা, তার ওপর তিনি যা দেখলেন তাতে তার মাথা ঝিমঝিম করছে। বাইরে তখন সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার নামতে শুরু করেছে সমুদ্রের বুকে। ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস দাঁড়িয়েছিলেন ডেকে। তাদের সঙ্গে কোনও কথা না বলে মকরবাহিনীর ডেক ছেড়ে সোজা এগোলেন তার জাহাজে ফেরার জন্য।

ফ্রান্সিস, পেরোকে বলল, 'ব্যাপারটা কী হচ্ছে বলুন তো?'

ক্যাপ্টেন পেরো বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এস্তাদিও আর মৎস্যগন্ধা যখন দুজনেই ধরা পড়ে গেছে তখন আমরা অনেকটাই দায়মুক্ত। দেখা যাক কোহেলো কী করেন? আমরা এখন সান্টা মারিয়াতে ফিরে যাই।'

ক্যাপ্টেন পেরো আর ফ্রান্সিস তার দলবল নিয়ে মকরবাহিনীর ডেক ছেড়ে রণপোত টপকে এগোল সান্টা মারিয়াতে। তারা কেউ খেয়ালই করল না, একজন রয়ে গেল মকরবাহিনীর ডেকে। সে সবার অলক্ষে গিয়ে সেঁধিয়েছে ডেকের এক কোণে রাখা মোটা কাছিগুলোর গহ্বরের ভিতর।

নাখোদা আব্বাস।

অন্ধকার নামল মহাসমুদ্রের বুকে।

ক্যাপ্টেন কোহেলোর কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল মৎস্যগন্ধা। কেঠো পালঙ্কের ওপর গিয়ে বসলেন কোহেলো। ঘোর কাটছে না তার। মৎস্যগন্ধা তার সামনে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তার গলা। কোহেলোর চোখের সামনে জেগে উঠল মৎস্যগন্ধার শঙ্খের মতো স্তন, গভীর স্তনবিভাজিকা। কোমরের ঠিক মাঝখানে জেগে থাকা নাভিকূপ। কদলীবৃক্ষের মতো উরুদুটো স্পর্শ করে আছে কোহেলোর হাঁটু।

অনেক দিন পরে নারীদেহের স্পর্শ তার শরীরে। বেশ কয়েক বছর আগে জলদস্যু জীবনে একটা জাহাজ লুঠ করার সময় এক অষ্টাদশী তরুণীকে ধর্ষণ করেছিলেন কোহেলো। সেই শেষ তার নারীদেহ পাওয়া। তারপর তিনি বন্দি হলেন অ্যাডমিরালের হাতে। তাঁর শর্ত মেনে তিনি যোগ দিলেন অ্যাডমিরালের সঙ্গে।

এবার ভারত অভিযানের সময় ভাস্কোর কঠোর নির্দেশ ছিল, কোনও নারী তোলা যাবে না পর্তুগিজ রণপোতে। কাজেই কোহেলোর শরীর অভুক্তই রয়ে

BanglaBook.org

গেছে। কোহেলো তাকিয়ে রইলেন মৎস্যগন্ধার দেহের দিকে। আর মৎস্যগন্ধা তার গলা জড়িয়ে বলতে শুরু করল, 'শোনো কোহেলো। এস্তাদিও আমার প্রেমিক নয়। আমি তার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করে এসেছি। এস্তাদিও তমালিকা বন্দরে এসেছিল এই গুপ্তধনের খোঁজেই। কোনও এক প্রাচীন নাবিক তাকে খোঁজ দিয়েছিল এই গুপ্তধনের। কোনও এক রাজা নাকি এই গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছিল তমালিকা বন্দর আর ভূমধ্যসাগরের এক দ্বীপে। এস্তাদিও সে দ্বীপেরও সন্ধান জানে। তমালিকা বন্দর থেকে এই গুপ্তধন উদ্ধারের পর আমি এস্তাদিওর সঙ্গে যাচ্ছিলাম সেই দ্বীপে। সেটা পাওয়ার পর আমি তার যা ব্যবস্থা করার করতাম। শোনো কোহেলো, তুমি সুপুরুষ, সাহসী। তোমার মতো পুরুষই আমার কাম্য। এস্তাদিওর মতো নরম স্বভাবের বণিক আমাকে ভবিষ্যতে রক্ষা করতে পারবে না তা আমি জানি। ইচ্ছা করলে এ সম্পদ তোমার হতে পারে।'

কোহেলো এবার কুমিরের চামড়ার মতো খসখসে হাত দিয়ে মৎস্যগন্ধার নিতম্ব স্পর্শ করলেন। মৎস্যগন্ধা মনে মনে শিউরে উঠলেও আরও ঘনিষ্ঠভাবে কোহেলোকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'চলো, এই সিন্দুকটা নিয়ে আমরা পালিয়ে যাই। এস্তাদিওকে আমরা এখন মারব না। দ্বিতীয় সিন্দুকটা উদ্ধার করার পর আমরা তাকে শেষ করব।'

কোহেলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই অতুলনীয় নারীদেহ, মকরবাহিনীর খোলে দেখে আসা রাজার ঐশ্বর্য্য, ভূমধ্যসাগরের কোনও দ্বীপে লুকিয়ে রাখা এমনই এক সিন্দুকের গল্প—এসব মিলিয়ে মিশিয়ে মাথার ভিতরটা কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল কোহেলোর। তবু তারই মধ্যে তিনি বললেন, 'কীভাবে বুঝব তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না?'

মৎস্যগন্ধা এবার তার কোমরের আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ ছুরিটা বের করে আনল। সেটা দেখেই চমকে উঠলেন কোহেলো। মুহূর্তের জন্য আতঙ্ক ফুটে উঠল কোহেলোর মুখে। মৎস্যগন্ধা হেসে বলল, তোমার ভয় নেই। তুমি যখন খোলের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে সিন্দুকটা দেখছিলে তখনই আমি ছুরিটা তোমার পিঠে বসিয়ে দিতে পারতাম। অথবা এখনই বসিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তোমার মতো পুরুষকেই আমার দরকার। যে আমার দেহকে তৃপ্ত করতে পারবে, ভবিষ্যতে আমাকে রক্ষা করতে পারবে।'—এই বলে মৎস্যগন্ধা ধারালো ছুরির একটানে তার বক্ষবন্ধনীর ফাঁসটা কেটে দিয়ে ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলল ঘরের এক

BanglaBook.org

কোণে। আর অবিশ্বাসের কোনও কারণ নেই এখন। কোহেলোর চোখের সামনে জেগে আছে মৎস্যগন্ধার শঙ্খের মতো স্তনযুগল। চেরিফলের মতো স্তনবৃন্ত থেকে যেন চুঁইয়ে পড়ছে মোমের আলো। কোহেলোর পক্ষে এবার আর নিজেকে ধরে রাখা সম্ভব হল না। মৎস্যগন্ধাকে জাপ্টে ধরে সে পালঙ্কে পেড়ে ফেলল।

কোহেলো বন্যজন্তুর মতো ছিঁড়েখুঁড়ে খেতে শুরু করল মৎস্যগন্ধার নরম শরীরটাকে। মৎস্যগন্ধার দেহের প্রতিটা গহ্বর স্পর্শ করছে কোহেলোর খসখসে হাত, শ্বাপদের জিভের মতো খসখসে ধারালো জিভ। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে সারা শরীরে, কিন্তু তার মধ্যেই মৎস্যগন্ধা বলে যেতে লাগল, 'এ সবই তোমার হতে পারে। ভাস্কোর সঙ্গে থেকে তুমি জীবনে কী পাবে সামান্য পদমর্যাদা আর পরাধীনতা ছাড়া? শুধু মাত্র ওই একটা পেটিকাতেই যা আছে তা দিয়ে তুমি একটা নৌবহর কিনতে পারো। অথবা কোনও দেশে গিয়ে ভাস্কোর থেকে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন কাটাতে পারো। এই পেটিকা তুমি ভাস্কোর হাতে তুলে দিয়ে কী পাবে? হয়তো সামান্য কিছু অনুকম্পা। তুমি কি এই দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবনে ফিরে যেতে চাও না?

মৎস্যগন্ধার কথাগুলো যেন ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে লাগল সম্ভোগরত কোহেলোর মনের গভীরে। সত্যিই তো! এই নারীদেহ, এই রাজ ঐশ্বর্যর থেকে বেশি কিছু ভাস্কো দিতে পারবে না তাকে।

দীর্ঘক্ষণ পর সম্ভোগপর্ব শেষ হল কোহেলোর। উঠে বসলেন কোহেলো। উঠে বসল মৎস্যগন্ধাও। তার সারাদেহ তখন ক্ষতবিক্ষত। রক্তধারা বইছে যোনিপথ বেয়ে। কিন্তু প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও মুখে হাসি ফুটিয়ে মৎস্যগন্ধা কোহেলোর গলা জড়িয়ে বলল, 'তবে আমরা যাচ্ছি তো?'

একটু চুপ করে রইলেন কোহেলো। হ্যাঁ, এই অতুল সম্পদ যখন তার হাতের মুঠোয় তখন ভাস্কোর কাছে ফিরে যাওয়া এখন অর্থহীন। তাছাড়া ভাস্কো গোয়ার দায়িত্ব নিতে চলেছেন। তিনি সে কাজ ফেলে আর কোহেলোর পিছু ধাওয়া করতে পারবেন না। আর এতবড় সমুদ্রে কোন দিকেই বা তিনি তার সন্ধান চালাবেন? সব দিক থেকেই এখন কোহেলোর সুবিধা। তবে কোহেলো একথাই মনে মনে ভেবে নিলেন যে, সে দ্বীপে গিয়ে গুপ্তধন উদ্ধারের পর এস্তাদিও তো বটেই, এই নারীকেও আর বাঁচিয়ে রাখবেন না তিনি। যতই সুন্দর হোক এই নারীদেহ কিন্তু ততদিনে নিশ্চই এ-দেহের প্রতি

BanglaBook.org

তার আকর্ষণ চলে যাবে। পেটিকা দুটো সংগ্রহ করার পর কোনও গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রেখে তিনি আবার সমুদ্রের বুকে বেছে নেবেন তার বেপরোয়া মুক্ত জীবন। কোহেলোর মনের ভিতর ঘুমিয়ে থাকা জলদস্যু সত্তা যেন এতদিন পর আবার জেগে উঠতে শুরু করল।

মৎস্যগন্ধা বলল, 'তুমি আবার সান্টা মারিয়ার লোকগুলোকেও সঙ্গে নেবে নাকি? ওদের তো কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ওদের মাধ্যমে ভাস্কোর কানে ব্যাপারটা পৌঁছে যেতে পারে।'

কোহেলো বললেন, 'না, ওদের আর কোনও প্রয়োজন নেই আমার। শুধু আমার নিজস্ব লোকেরাই থাকবে। তবে ওদের ছেড়ে দিলে ওরা ভাস্কোকে গিয়ে সব জানাবে। ওদের শেষ করে যাবার আগে জাহাজটা ডুবিয়ে দেব।' কোহেলোর মধ্যে যে হিংস্র জলদস্যু লুকিয়ে ছিল সে এবার আত্মপ্রকাশ করল।

মৎস্যগন্ধা বলল, 'তবে আজ রাতেই কাজটা শেষ করতে হবে। দেরি করলে চলবে না। কারণ, এ জায়গা মোহনা থেকে বেশি দূরে নয়। জমিদারের লোকজন এতক্ষণে নিশ্চই জেনে গেছে যে আমি পালিয়েছি। তারাও নিশ্চই জাহাজ নিয়ে আমাকে ধরার জন্য বেরিয়েছে। তারা এসে পড়লে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে আরও বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হবে।'

কথাটা শুনে কোহেলো বললেন, 'হ্যাঁ, আজ রাতেই কাজটা শেষ করে সূর্যের আলো ফোটার আগেই গভীর সমুদ্রে রওনা হয়ে যাব। আর কাজটা যতক্ষণ শেষ না হয় ততক্ষণ তুমি আমার কেবিনেই থাকো।'

কথাগুলো বলে কেবিনের কাঠের দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো লম্বা নলঅলা পারকাসন পিস্তল আর তলোয়ারটা নামিয়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন কোহেলো কেবিনের বাইরে বেরিয়ে এলেন। তবে ক্যাপ্টেন কোহেলো ধূর্ত লোক। মৎস্যগন্ধাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করার মতো কারণ নেই তার। কেবিনের বাইরে বেরিয়ে তিনি দরজায় শিকল তুলে দিলেন।

মৎস্যগন্ধার পরিকল্পনা সঠিকভাবেই এগোচ্ছিল, কিন্তু এবার তা ধাক্কা খেল। মৎস্যগন্ধা ভেবেছিল যে, কোহেলো তাকে অরক্ষিতভাবে রেখে যাবে। আর দু-পক্ষের গোলযোগের সুযোগ নিয়ে সে এস্তাদিওকে মুক্ত করে রাতের অন্ধকারে ছোট নৌকাটা নিয়ে সমুদ্রে ভেসে যাবে। কোহেলো বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়ায় মৎস্যগন্ধা হতাশ হয়ে ভাবতে লাগল এবার সে কী করবে? আর কোহেলো তার জলদস্যু সঙ্গীদের একটা ঘরে ডেকে নিয়ে

BanglaBook.org

গোপনে শলাপরামর্শ করতে বসল, কীভাবে সান্টা মারিয়ার লোকগুলোকে খুন করা যায়, সেজন্য।

বেশ রাত হয়েছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলে চাঁদের আলো ক্ষীণ। দীর্ঘক্ষণ পাকানো রশির আড়ালে আত্মগোপন করে বসেছিল নাখোদা আব্বাস। তার ভিতরে বসেই বাইরের সব কথোপকথন শুনেছে সে। শেষপর্যন্ত সে যখন নিশ্চিত হল যে মকরবাহিনীর ডেকে কেউ নেই, তখন কাছির আড়াল থেকে মাথা তুলল সে। না, চারপাশে কেউ নেই, এমনকী পাশের পর্তুগিজ রণপোতটার ডেকেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বুকে হেঁটে সে এগোল জাহাজের খোলে নামার জন্য। সে যখন খোলে প্রবেশ করতে যাচ্ছে ঠিক তখনই যেন একটা চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হল রণপোতের যে-পাশে সান্টা মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে সেদিক থেকে। আব্বাস আর দেরি করল না। দ্রুত সে নেমে এল খোলের ভিতর। খোলেও কেউ নেই। শুধু গরাদঘরের সামনে আলো জ্বলছে। আব্বাস তাড়াতাড়ি গরাদঘরের দরজা খুলে এস্তাদিওর বাঁধন খুলতে শুরু করল। তাকে দেখে বিস্মিত এস্তাদিও প্রথমেই জানতে চাইল, 'মৎস্যগন্ধা কোথায়?' বাঁধন খুলতে খুলতে আব্বাস জবাব দিল, 'তিনি সম্ভবত রণপোতে ক্যাপ্টেন কোহেলোর কেবিনে আছেন।'

এরপর আব্বাস বলল, 'যেদিকে সান্টা মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে কোন একটা গন্ডগোল শুরু হয়েছে। এমনও হতে পারে যে সান্টা মারিয়া আর রণতরীর নাবিকদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। এখন ওরা ওই নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে কেউ নেই। এই সুযোগ। চলুন আমরা ফোকর বেয়ে সিন্দুকটা নিয়ে নৌকাতে উঠে পড়ি। কেউ আমাদের আর ধরতে পারবে না।

বন্ধনমুক্ত হয়ে গরাদঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল এস্তাদিও। নাখোদা পালাবার জন্য কয়েক পা এগিয়ে খেয়াল করল এস্তাদিও একই জায়গায় আছে, দাঁড়িয়ে। নাখোদা তাকে তাড়া দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি আসুন! বলা যায় না, যে-কোনও মুহূর্তে কেউ চলে আসতে পারে!'

এস্তাদিও জবাব দিল। 'আমি মৎস্যগন্ধাকে ছেড়ে যাব না। তাতে যা হয় হবে।'

এস্তাদিওর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা আব্বাসকে জানিয়ে দিল, এস্তাদিও তার

BanglaBook.org

সিদ্ধান্তে অবিচল। আব্বাস তার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারবে না।

আব্বাসও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রবীন নাখোদা। জাহাজ নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবার সুবাদে সে নানা জাতের, নানা দেশের মানুষ দেখেছে। দেখেছে তাদের ঘৃণা, লোভ এমনকী তাদের ভালোবাসাও দেখেছে। কিন্তু এমন ভালোবাসা কোনও দিন সে দেখেনি। যে-ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান করতে পারে সাত রাজার ঐশ্বর্যকে, সব থেকে বড় কথা, নিজের জীবনকেও উপেক্ষা করতে পারে। মৎস্যগন্ধার কথাও এবার মনে পড়ে গেল আব্বাসের। নিজের মৃত্যুকে উপেক্ষা করে এস্তাদিওকে বাঁচাবার জন্য পর্তুগিজ রণতরীতে তার উঠে আসার কথা।

দিক্‌চিহ্নহীন সমুদ্রের মতোই নাখোদা আব্বাসের জীবন। কোনও দিশা নেই তার জীবনে। শুধু লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে চলেছে সে। তার জন্য যদি দুটো জীবন বেঁচে যায় তবে সেটাই পরম প্রাপ্তি হবে তার জীবনে। মরতে তো একদিন হবেই। দেখা যাক যদি কিছু করা যায়! একথা ভেবে নিয়ে আব্বাস বলল, 'আপনার ওপরে যাওয়া ঠিক হবে না। আপনি এখানেই থাকুন। আমি ওপরে গিয়ে দেখি যদি কোনওভাবে তাকে মুক্ত করে আনা যায়।'

কথাগুলো বলে আব্বাস আর দাঁড়াল না। সে ছুটল ওপরে ওঠার জন্য।

মকরবাহিনী থেকে পাটাতন বেয়ে নাখোদা যখন পর্তুগিজ রণপোতের ডেকে উঠল ততক্ষণে জোর লড়াই শুরু হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন কোহেলো আর ক্যাপ্টেন পেরোর নাবিকদের মধ্যে। পেরো হয়তো কোনওভাবে আঁচ করেছিলেন যে এমন কিছু ঘটতে পারে তাই তিনিও প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তার জাহাজের নাবিকরা সঙ্খাতে কম হলেও আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছে তারা। কারণ তারা জানে যে তাদের আর কিছুক্ষণের মধ্যে মরতে হবে। কাজেই মরার আগে প্রতিপক্ষের কয়েকজনকেও সঙ্গী করে নিয়ে যেতে চায় তারা। পেরোর জাহাজটা কোহেলোর জাহাজের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বলে রণপোতে থেকে কামানও দাগা যাচ্ছে না। কারণ, সান্টা মারিয়াতে গোলা দেগে আগুন লাগালে সে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে রণপোতের ডেকেও। আর এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়ে লড়াই চালাচ্ছেন ক্যাপ্টেন পেরো আর তার সঙ্গীরা। লড়াই চলছে তলোয়ার আর বন্দুক দিয়ে। তলোয়ারের সংঘর্ষের শব্দ, বন্দুকের গুলির শব্দ, নাবিকদের হুংকার আর আর্তনাদের বীভৎস শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। তার মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হল নাখোদা আব্বাস। অভিজ্ঞ নাবিক

BanglaBook.org

আব্বাস জানে ক্যাপ্টেনের কেবিন কোথায় হয়। সেই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই কোনওরকমে নিজেকে বাঁচিয়ে আব্বাস উপস্থিত হল কোহেলোর কেবিনের দরজাতে। দরজা খুলে ফেলল সে। বাইরে লড়াইয়ের শব্দ শুনে যে-কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য মৎস্যগন্ধা ছুরি-হাতে দাঁড়িয়েছিল। তবে আব্বাস যে দরজা খুলবে সে ভাবেনি! ছুরিটা চালাতে গিয়েও সে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। আব্বাস তাকে বলল, 'বাইরে লড়াই হচ্ছে। তার ফাঁক গলে পালিয়ে আমাদের পৌঁছোতে হবে মকরবাহিনীর খোলে। এস্তাদিও সেখানে অপেক্ষা করছেন। ফোকর গলে সিন্দুক নিয়ে আমরা ভেসে পড়ব।'

মৎস্যগন্ধা বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। মশালের আলোতে চারপাশে লড়াই চলছে। তার মধ্যে দিয়ে মৎস্যগন্ধা ছুটতে শুরু করল রণপোতের ডেক টপকে মকরবাহিনীতে যাবার জন্য। কিছুটা এগিয়েই কিছু একটাতে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল মৎস্যগন্ধা। আব্বাস সঙ্গে সঙ্গে টেনে তুলল তাকে। যে জিনিসটাতে মৎস্যগন্ধা হোঁচট খেল সে জিনিসটার দিকে একবার তাকাল মৎস্যগন্ধা। একটা সদ্য-কাটা নরমুণ্ড। মশালের আলোতে তার চোখদুটো যেন তখনও বিস্মিতভাবে তাকিয়ে আছে মৎস্যগন্ধার দিকে। সে মুন্ডুটাকেও চিনতে পারল মৎস্যগন্ধা। পেড্রোর কাটা- মাথা! সেটা চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই মৎস্যগন্ধা ঘৃণাভরে এক লাথিতে মুন্ডুটাকে সরিয়ে আবার ছুটতে শুরু করল।

কিন্তু কিছুটা এগোতেই এবার তাদের পালাতে দেখে ফেলল একদল জলদস্যু। একপাশ থেকে তারা ছুটে আসতে লাগল তাদের দিকে। আব্বাস মৎস্যগন্ধাকে বলল, 'আপনি পালান। আমি ওদের আটকাচ্ছি। নইলে কেউ পালাতে পারব না।' মৎস্যগন্ধা ছুটল আর আব্বাস একটা তলোয়ার নিয়ে রুখে দাঁড়াল জলদস্যুদের দিকে। জনা চারেক দস্যু। আব্বাস তলোয়ারবাজি কিছুটা জানে। সে লড়ে যেতে লাগল তাদের সঙ্গে। একজনের মাথা উড়িয়ে দিল আব্বাস। জলদস্যুরা বুঝল, লোকটার সঙ্গে লড়াই করতে গেলে হয়তো আরও কয়েকজনের প্রাণ যাবে। তাই হঠাৎ একজন জলদস্যু একটা জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে মারল আব্বাসকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেল আব্বাসের শরীরে। আরও লোকজন চারপাশ থেকে ছুটে আসছে তাকে মারার জন্য। আব্বাস বুঝতে পারল তার সময় শেষ হয়ে আসছে। হঠাৎ কিছুটা তফাতে রণপোতের ডেকে সাজিয়ে রাখা একটা জিনিসের ওপর নজর পড়ল আব্বাসের। মৃত্যুপথযাত্রী নাখোদা আব্বাসের ঠোঁটে শেষহাসি ফুটে উঠল।

BanglaBook.org

আব্বাসের সারাদেহ তখন জ্বলছে। আব্বাস জলদস্যুদের ব্যূহ ভেদ করে ছুটল সেদিকে। তারপর ডেকে রাখা সার সার কামান দাগার জন্য রাখা বারুদের পিপেগুলোর একটাকে জাপ্টে ধরল তার জ্বলন্ত শরীর দিয়ে। আব্বাস খুলে ফেলল পিপের মুখ। পরক্ষণেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল বারুদের পিপেতে। আব্বাসের দেহটা ছিন্নভিন্ন হয়ে ডেক থেকে উড়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ল ঠিকই, কিন্তু রণপোতের ডেকে আগুন ধরে গেল। বিস্ফোরণ শুরু হল একটার পর একটা বারুদের পিপেতে। প্রাণভয়ে ছোটাছুটি করতে শুরু করল পর্তুগিজ রণপোতের নাবিকরা। সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল রণপোতের গায়ে লাগানো সান্টা মারিয়ার ডেকেও। ততক্ষণে অবশ্য সে জাহাজের একজন নাবিকও জীবিত নেই। আগুন এগোতে থাকল রণপোতের অন্যপাশে দাঁড়ানো মকরবাহিনীর দিকেও।

জাহাজের খোলের ভিতর দাঁড়িয়ে বিস্ফোরণের শব্দগুলো শুনছিল এস্তাদিও। সে বুঝে উঠতে পারছিল না তার কী করা উচিত? ঠিক এমন সময় খোলে নেমে এল মৎস্যগন্ধা। তাকে দেখে উদ্বেলিত হয়ে উঠল এস্তাদিও। সে গিয়ে মৎস্যগন্ধাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি ঠিক আছ? কিন্তু আব্বাস কই?'

মৎস্যগন্ধা বলল, 'সম্ভবত সে মৃত। রণপোত আর সান্টা মারিয়াতে আগুন ধরে গেছে। আগুন এদিকেও আসছে। দেরি করলে চলবে না। এখনই পালাতে হবে।'

এরপর তারা আর সময় নষ্ট করল না। তারা গিয়ে হাজির হল খোলের যেখানে সিন্দুকটা আছে সে-জায়গাতে। কাঠের পাটাতনটা সরিয়ে ফেলল মৎস্যগন্ধা। ভিতরের রাখা আছে সিন্দুকটা। তার এপাশের পাটাতনটা সরালেই সমুদ্র। ছোট নৌকাটাও সেখানেই রাখা আছে। তবে ওপাশের পাটাতন খোলার জন্য সিন্দুকটা নামাতে হবে আগে। এস্তাদিও আর মৎস্যগন্ধা খোপ থেকে ধরাধরি করে সিন্দুকটা মেঝেতে নামাল। ঠিক সেই মুহূর্তে কাছেই একটা অস্পষ্ট পদশব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল এস্তাদিও। তার কিছুটা তফাতে উদ্যত পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন কোহেলো! হয়তো মৎস্যগন্ধাকে অনুসরণ করে অথবা তার জাহাজ ডুবতে চলেছে বুঝতে পেরে সিন্দুকটা নিয়ে পালাবার জন্য ওই খোলে এসে উপস্থিত হয়েছেন কোহেলো। তারপর তিনি দেখতে পেয়েছেন পলায়মান এস্তাদিও আর মৎস্যগন্ধাকে। তার পিস্তলের প্রথম লক্ষ্য

BanglaBook.org

মৎস্যগন্ধা। কারণ তার এক হাতে এখনও ছুরিটা ধরা আছে।

মৎস্যগন্ধাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাবার মুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এস্তাদিও আড়াল করে দাঁড়াল মৎস্যগন্ধাকে। এরপরই ক্যাপ্টেন কোহেলোর দো-নলা পিস্তলের গুলি-দুটো ছিটকে এসে লাগল এস্তাদিওর বুকে। সিন্দুকটা ওপর টলে পড়ল এস্তাদিও। ক্যাপ্টেন কোহেলো আবার তার পিস্তলে গুলি ভরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাকে সে সুযোগ আর দিল না মৎস্যগন্ধা। কোহেলো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে ছুটে গিয়ে তার তীক্ষ্ণ ছুরিটা বিঁধিয়ে দিল তার বুকে। মাটিতে পড়ে গেলেন কোহেলো। মৎস্যগন্ধা তাতে ক্ষান্ত হল না। সে প্রচণ্ড আক্রোশে ছুরিটা চালিয়ে যেতে লাগল কোহেলোর মুখে, তার দেহের সর্বত্র। মৎস্যগন্ধা যখন নিজেকে সংযত করল তখন আর কোহেলোকে দেখলে কেউ চিনতে পারবে না। তার একটা চোখও উপড়ে পড়ে আছে মাটিতে। তার দেহের এমন কোনও অংশ নেই যেখানে মৎস্যগন্ধার ছুরির আঘাত নেই।

মৎস্যগন্ধা এরপর এগিয়ে এল মাটিতে পড়ে থাকা এস্তাদিওর দিকে। তার মাথাটা নিজের মুখের কাছে তুলে ধরে সে বলল, 'চোখ মেলো এস্তাদিও। কথা বলো, কথা বলো। আমরা কি সেই দেশে যাব না?'

শেষবারের জন্য চোখ মেলে এস্তাদিও জড়ানো স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, যাব মৎস্যগন্ধা। তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে চলো...।'

কথাগুলো বলার পরই মুদে এল এস্তাদিওর চোখের পাতা। নিথর হয়ে গেল তার দেহ। মৎস্যগন্ধা তার ঠোঁটটা নামিয়ে আনল তার ঠোঁটের ওপর।

আগুন গ্রাস করেছে মকরবাহিনীর ডেকও। সে আগুন নামতে শুরু করেছে মরকবাহিনীর খোলেও। আলোকিত হয়ে উঠেছে অন্ধকার খোল। মৎস্যগন্ধাকে এবার এস্তাদিওকে নিয়ে বেরোতে হবে এ জাহাজ ছেড়ে।

ফোকর গলে বাইরে বেরিয়ে মৎস্যগন্ধা প্রথমে নৌকাটাকে টেনে আনল খোলের বাইরে আঁকা ফেরানো-চোখের কাছে। প্রথমে এস্তাদিওকে বের করে এনে সে নৌকাতে রাখল। তার পর একটু চেষ্টা করে সিন্দুকটাকেও সে নৌকাতে তুলে ফেলল। তারপর ভেসে পড়ল সমুদ্রে। সে কিছুটা এগোবার পরই পিছনে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের শব্দ হল। অগ্নিদগ্ধ পর্তুগিজ রণপোত তার দুপাশের দুটো জাহাজ সান্টা মারিয়া আর মকরবাহিনীকে সঙ্গী করে ডুব দিল সমুদ্রের গভীরে।

BanglaBook.org

মেঘ কেটে গেছে। চাঁদ যেন মাথার ওপর থেকে হাসছে মৎস্যগন্ধা আর এস্তাদিওর দিকে চেয়ে। শান্ত সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় অগণিত চাঁদের প্রতিচ্ছবি। হীরকখণ্ডের মতো অগণিত তারার আকাশ। ছোট্ট নৌকাতে এস্তাদিওর গলা জড়িয়ে বসে মৎস্যগন্ধা। কী অপূর্ব এই সমুদ্র! মৎস্যগন্ধা খুলে ফেলল সিন্দুকের ডালাটা। তারপর মনের আনন্দে মুঠো মুঠো রত্নরাজি, সোনা নিয়ে ছড়াতে লাগল তাদের যাত্রাপথে সমুদ্রের বুকে। মৎস্যগন্ধা সেগুলো ছড়াতে ছড়াতে এস্তাদিওকে নিয়ে এগিয়ে চলল তার স্বপ্নে দেখা দ্বীপের দিকে।

ভূমধ্যসাগরের কোনও দ্বীপ নয়। ভারত মহাসাগরেরই কোনও দ্বীপ হবে সেটা। তবে সে-দ্বীপ মৎস্যগন্ধা আর এস্তাদিওর স্বপ্নের সেই দ্বীপের মতোই দেখতে। সবুজ গাছে ছাওয়া দ্বীপ। ছোট ছোট শান্ত বাড়িঘর। সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত সোনালি বালুতটকে ছুঁয়ে আছে ঊর্মিমালা। দ্বীপবাসীরা একদিন ভোরে দেখতে পেল সেই সমুদ্রতটে এসে ভিড়েছে একটা নৌকা। সেই নৌকার মধ্যে শুয়ে আছে দুটো কঙ্কাল। তাদের পোশাক দেখে তারা বুঝতে পারল সে দুটোর একটা নারী, আর একটা পুরুষের কঙ্কাল। নারী যেন পরম মমতায় জড়িয়ে আছে পুরুষের গলাটা। আর একটা শূন্য সিন্দুকও আছে নৌকাতে। তার গায়ে ছুরি দিয়ে কী যেন লেখা আছে!

লেখাটা অবশ্য পড়তে পারল না দ্বীপবাসীরা। সেখানে লেখা ছিল দুটো নাম—মৎস্যগন্ধা আর এস্তাদিও। কঙ্কালদুটো নৌকা থেকে যত্ন করে তুলে এনে দ্বীপবাসীরা কবর দিল সমুদ্রতটে।

এস্তাদিও, মৎস্যগন্ধা, কোহেলো বা সেই সিন্দুক বহু প্রতীক্ষার পরও আর গোয়াতে ফিরল না। কিছুদিন তাদের অপেক্ষায় থাকার পর ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি মহাসমারোহে এ দেশের পর্তুগিজ উপনিবেশ গোয়ার ভাইসরয় হিসাবে শপথ নিলেন ভাস্কো ডা গামা।

BanglaBook.org